প্রফুল্ল রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ :
আশ্বিন—১৩৬৬

* * *

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা :
সুবোধ দাশগুপ্ত

* * *

আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

প্রেমেন্দ্র মিত্র
পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই লেখকের বই :

সিন্ধুপারের পাখি

পূর্বপার্বতী

নাগমতী

নতুন দিন

দূরের বন্দর

অন্তরঙ্গ

তাসের মিনার

রূপসীর মন

তটিনী তরঙ্গে (যন্ত্রস্থ)

প্রথমে এই উপন্যাসের নাম ছিল 'দক্ষিণ সমুদ্র'। পরে এর নাম বদলানো হয়।

'নোনা জল মিঠে মাটি'—এই নামকরণ করেছেন শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্র। আমার প্রতি তাঁর অফুরন্ত স্নেহের কথা স্মরণ রেখে নিছক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বাহুল্য মনে করি।

লেখক

কথামুখ

উত্তর আন্দামানের এই উপসাগরে উনিশ শ ছাপ্পান্ন সালে একটা জাহাজ এসেছিল।

উপসাগরের পারে একদল মানুষ নামিয়ে দিয়ে জাহাজটা পোর্ট ব্লেয়ার ফিরে গিয়েছিল।

এই মানুষগুলোকে আমি দেখেছি। বিষণ্ণ, ভীরু, মৃতমুখ একদল মানুষ। মুখে যাদের কোন রেখাই ফোটে না, চোখে পলক পড়ে না, পিঠ দুমড়ে বেঁকে গিয়েছে ; মাথা সিধা রেখে চলার সাহস যারা হারিয়েছে ; সেই সব মানুষ।

উত্তর আন্দামানের এই উপসাগরে সতর শ বিরানব্বুইতে আর একটা জাহাজ এসেছিল। সেই জাহাজেই ক্যাপটেন কিড দু শ দুর্দান্ত কয়েদী নিয়ে এখানে এসেছিলেন।

তাদের আমি দেখি নি। তাদের কথাই এখন শুনছি। বলছে ফরেস্ট গার্ড খিলাফৎ খান।

এটা উনিশ শ সাতান্ন সাল, সময়টা শীতের এক মধ্য বিকাল।

এখন সূর্যটা ঢলে পড়েছে। উপসাগরের নীল জলে রোদ দোল খাচ্ছে। ছোট ডানায় বিরাট আকাশ মাপতে মাপতে সিন্ধুসারস-গুলো স্যাডল পীক পাহাড়ের দিকে চলে যাচ্ছে। দূরের সমুদ্র আবছা, দুর্বোধ্য হয়ে গিয়েছে।

বিরাট একখণ্ড পাথর লোনা জলে ক্ষয়ে গিয়েছে। তার উপরে বসেছিলাম, আমার পাশে খিলাফৎ খান।

খিলাফৎ বলছিল।

উত্তর আন্দামানের এই উপসাগরে কত যে তুফান ওঠে, লেখাজোখা নেই।

এই উপসাগর, নাম এরিয়াল বে।

এই উপসাগর, যার আকার ঘোড়ার খুরের মত। যার নীল জলে উড়ুক্কু মাছেরা ফিনফিনে রূপালী ডানায় ঝিলিক হেনে ছুটে বেড়ায়। পারের কাছে হাঙরেরা ঝাঁক বেঁধে শিকারের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘোরে।

দূরে সমুদ্র, আন্দামান সী—নিঃসীম, গম্ভীর, অফুরন্ত। সমুদ্র থেকে পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ আসে; উপসাগরটাকে মাতিয়ে পারের ক্ষয়িত শিলায় আর ম্যানগ্রোভ বনে বিপুল আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এরিয়াল উপসাগরে সেদিনও তুফান উঠত, সেই সতর শ বিরানব্বুইর ডিসেম্বরে, যেদিন ব্লেয়ার সাহেবের 'পেনাল কলোনি' দক্ষিণ আন্দামান থেকে এখানে তুলে আনা হয়েছিল; যেদিন ক্যাপটেন কিড দু শ কয়েদী নিয়ে এখানে এসেছিলেন।

এরিয়াল উপসাগরের কিনার থেকে চুগলুম দিদু পেমা গাছের জটিল অরণ্য চড়াই উতরাই বেয়ে উঁচু এক পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গিয়েছে। (পরে এই পাহাড়ের নাম হয়েছিল স্যাডল পীক)।

উপসাগরের সামনে মাঝারি এক দ্বীপ। তার নাম দেওয়া হ'ল পোর্ট কর্নওআলিস।

ক্যাপটেন কিড দু শ জন দুর্দান্ত কয়েদীকে জঙ্গল সাফ করতে লাগিয়ে দিলেন। অরণ্য সাফ হ'ল, জমি সার্ভে হ'ল, জরীপ হ'ল। বেতপাতার চাল মাথায় নিয়ে ঝুপড়ি উঠল প্রথমে। শিশু উপনিবেশ গড়ে উঠল, সরকারী পরিভাষায় যার নাম 'পেনাল কলোনি'।

ধীরে ধীরে উপনিবেশ জমে উঠল। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে নানা মানুষ আসতে লাগল আশ্রয় এবং জীবিকার ধান্দায়। এখানে আগেও মানুষ বাস করত। তারা বর্বর, হিংস্র। তারাই এই দ্বীপের আদি বাসিন্দা। দ্বীপবাসী আদিম উলঙ্গ মানুষগুলির সঙ্গে ধীরে ধীরে সভ্য মানুষের সখ্য গড়ে উঠল।

সভ্য দুনিয়া থেকে সতর শ বিরানব্বইতে সেই প্রথম মানুষ

এসেছিল এই উত্তর আন্দামানে, স্থায়ী উপনিবেশ বানাতে অরণ্য সংহার করে জীবনের সীমানা বাড়াতে।

এ সব কথা আমি শুনছি ফরেস্ট গার্ড খিলাফৎ খানের মুখে। খিলাফৎ খান জাতে পাঠান। উনিশ শ পাঁচ না দশ সালে তিন তিনটে কোতল করে তামাম জিন্দগীর সাজা নিয়ে সে আন্দামান এসেছিল। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে প্রায় পঞ্চাশটা বছর কাটিয়ে দিয়েছে খিলাফৎ। পুরানো জমানার কথা, গাঁও মুল্লুক, বিবি-বেটি —কারো কথাই তার মনে পড়ে না। খিলাফতের জীবন থেকে অতীত মুছে গিয়েছে।

খিলাফৎ খান জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, জবাবদারি করে, কুলী আর হাতী নিয়ে পেমা দিডু চুগলুম গাছ কেটে কেটে জঙ্গল সাফ করে। এই তার কাজ, সরকারী কাজ, পাকা নোকরি।

আন্দামানের অন্ধিসন্ধি, কোথায় কোন উপসাগর, কোথায় খাড়ি, কোথায় আওয়াবিল পাখির আস্তানা, কোথায় হিংস্র জারোয়াদের এলাকা, কোন উপসাগরে অক্টোপাস আসে—সব, সব খিলাফৎ খানের নখদর্পণে। কিন্তু নিজের অতীত একেবারেই ভুলে গিয়েছে খিলাফৎ। নিজের অতীত খুইয়ে সে আন্দামানের অতীত জেনেছে।

বিচিত্র মানুষ খিলাফৎ পাঠান। আন্দামানের আত্মার সঙ্গে সে একাকার হয়ে মিশে গিয়েছে।

খাড়া খাড়া তামাটে চুল, অসংখ্য রেখায় জটিল মুখ, সাপের মত কুণ্ডলী পাকানো সমস্ত শরীরের শিরা উপশিরা—এই হ'ল খিলাফতের চেহারা নমুনা। মজবুত কব্জী, ঝকঝকে চোখ আর ঢিলা চামড়া থেকে বয়সের হদিস পাওয়া দায়। কেউ বলে, তার বয়স ষাট, কেউ বলে সত্তর। কেউ বলে, চার বিশ অর্থাৎ আশী। সে নিজে কিছুই বলে না; শোনে আর হাসে।

খিলাফৎ খানের সঙ্গে আমার দোস্তি মহব্বতি কেমন করে জমেছিল, সে কাহিনী অন্য।

এরিয়াল উপসাগরটার পারে সেই ক্ষয়িত পাথর খানায় বসে আমাকে অনেক কথাই শোনাচ্ছে খিলাফৎ।

সূর্যটা আরো ঢলে পড়েছে। উপসাগরের নীল জল কালো হয়ে আসছে। সমুদ্র আরো অস্পষ্ট হয়েছে।

খিলাফৎ বলছে।

কিড সাহেবের কলোনির পরমায়ু মাত্র চার বছর। সতর শ বিরানব্বুইর ডিসেম্বরে যার শুরু, ছিয়ানব্বুইতে শেষ। পোর্ট কর্নওআলিস অস্বাস্থ্যকর এবং মৃত্যুহার অস্বাভাবিক হওয়ায় এই কলোনি উঠে যায়। উঠে যাওয়ার আগে এখানকার জনসংখ্যা ছিল আট শ কুড়ি। তাদের মধ্যে কয়েদী হ'ল মাত্র দু শ সত্তর জন।

কলোনি উঠে যাবার পর কয়েদীদের পেনাঙের পেনাল সেটেলমেণ্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাদ বাকী সকলে বাঙলা দেশে ফিরে আসে।

সেটা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল। কলোনি উঠে গেলেও কোম্পানি আন্দামানের উপর কর্তৃত্ব ছাড়ে নি। প্রতি বছর পোর্ট কর্নওআলিসে জাহাজ পাঠিয়ে তদারক করত।

তারপর কতকাল চলে গিয়েছে।

সাধারণ একটা ফরেস্ট গার্ডের পক্ষে এত কথা জানা সম্ভব নয়। কিন্তু খিলাফৎ খানকে আমি জানতাম। জানতাম বলেই বিস্মিত হই নি।

এখন আর রোদ নেই। আকাশের কোথাও আর একটা সিন্ধু-

শকুনকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিকেল থাকতে থাকতে উড়ুক্কু মাছগুলি সেই যে উপসাগরের নীচে চলে গিয়েছে, আর তাদের দেখা নেই। জলের তলায় বুকে হেঁটে হেঁটে শঙ্খ কড়ি শামুকেরা কোথায় যে চলে গিয়েছে, কে হদিস দেবে!

খিলাফৎ বলতে লাগল, 'বাবুজী, কিড সাহেবের পর আর কেউ এখানে ডেরা বাঁধতে আসে নি। এক হিসেবে ভালই হয়েছে। জঙ্গলের জান বেঁচেছে।'

পোর্ট কর্নওআলিসের কলোনি উঠে গেল সতর শ ছিয়ানব্বুইতে। অরণ্য আবার তার দখল কায়েম করল। জঙ্গলের নীচে মানুষের উপনিবেশ হারিয়ে গেল। পোর্ট কর্নওআলিসের ক্ষয়িত পাথরে পাথরে বিচিত্র আক্ষেপের মত উপসাগর অবিরাম আছাড় খেতে লাগল।

শুধু কি সতর শ বিরানব্বুইতে; তার আগেও এখানে মানুষ এসেছে। উত্তর আন্দামানের এই উপসাগরে তুফানও উঠেছে। সে সব দিনে পালের জাহাজ ভাসিয়ে আরব বণিক, ভারতীয় শ্রমণ শ্রমণী পরিব্রাজকরা পূর্ব সমুদ্রে পাড়ি জমাতেন। মধ্য পথে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপমালায় তাঁদের বহর আরাম-বিরাম-খাদ্যের খোঁজে ভিড়ত। নজীর আছে, উত্তর আন্দামানের এই উপসাগরেও তাঁরা আসতেন।

নিকলো কণ্টি যে দিন আন্দামানকে 'সোনার দ্বীপ' আখ্যা দিয়েছিলেন, মার্কো পোলো কিংবা মাস্টার ফ্রেডরিক যেদিন বঙ্গোপ-সাগর ধরে যেতে যেতে আন্দামান দেখেছিলেন, কিংবা টলেমি ভুল করে যেদিন এই দ্বীপমালাকে 'agathou dimons nesos' (উত্তম

আত্মার দ্বীপ) বলেছিলেন, সে সব দিনেও উত্তর আন্দামানের এই উপসাগরে তুফান উঠত।

শুধু কি সে সব দিনেই, তার আগে যখন মালয়ী জলদস্যুরা শ্যাম কম্বোডিয়ার রাজদরবারে বেচবার জন্য এখানকার আদিম বাসিন্দাদের ধরতে আসত ; তারও দু'হাজার বছর আগে যখন জাপানী ও চীনারা এই দ্বীপমালার কথা সবেমাত্র শুনেছিল, তখনও উত্তর আন্দামানের এই উপসাগরে তুফান উঠত।

এই সব তারিখ সালের আগেও আরো তারিখ সাল আছে। সে সব ইতিহাসের নাগালের বাইরে। ইতিহাস সেখানে পৌঁছায় না ; মানুষের অনুমান সেখানে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ায়।

যেদিন বঙ্গোপসাগরের অথৈ অতল থেকে এই দ্বীপমালা মাথা তুলেছিল, সেদিন থেকেই উত্তর আন্দামানের এই উপসাগরে তুফান উঠছে।

কত কাল ধরে এই উপসাগরে কত তুফান যে উঠেছে, লেখা-জোখা নেই।

উপসাগরে এখন সন্ধ্যা নামছে। উন্মাদ, অন্ধ বাতাস সমুদ্র ফুঁড়ে ছুটে আসছে ; পারের ম্যানগ্রোভ বনটাকে ভেঙে চুরে তছনছ করে ফেলছে।

খিলাফৎ খান বলল, 'কিড সাহেবের কলোনি উঠে গিয়েছে, ভালই হয়েছে। নইলে উত্তর আন্দামানে একটা গাছও কি দেখতে পেতেন ? জঙ্গল সাফ হয়ে যেত ; কুঠিবাড়ি উঠত।'

'ভালই তো হ'ত।' আমি বললাম।

'না।'

অন্ধকারেও খিলাফৎ খানের চোখদুটো ঝিক করে জ্বলে উঠল। খিলাফৎ বলল, 'বাবুজী, জঙ্গলের মত খাঁটি দোস্ত আর নেই।

মানুষের মত তুশমন, হারামী কোথাও মিলবে না। মানুষ দেখলে দিল আমার বিগড়ে যায়।'

খিলাফতের স্বর থেকে ঘৃণা ঝরছে। মানুষের প্রতি অসীম ঘৃণা। আমি চমকে উঠলাম। বললাম, 'ক্ষেতিবাড়ি হবে, কুঠিবাড়ি উঠবে, মানুষ আসবে, এ কি তুমি চাও না?'

'না, না বাবুজী।'

খিলাফতের চোখজোড়া স্থির হয়ে জ্বলতে লাগল। সে বলতে লাগল, 'বাবুজী, মানুষের মত তাজ্জব চীজ আর নেই। তাদের মত বেইমানি শয়তানি করতে এই জঙ্গল জানে না।'

খিলাফতের কোথায় যে জ্বালা, এই মুহূর্তে বুঝতে পারি নি। বহুকাল পর বুঝেছিলাম। কিছুই জিজ্ঞাসা করলাম না। চুপচাপ বসে রইলাম।

খিলাফৎ আবার শুরু করল, 'কিড সাহেবের কলোনি উঠে যাবার এত বছর বাদে আবার মানুষ এসেছে। কলোনি বানাচ্ছে। জঙ্গল খতম হয়ে যাচ্ছে।'

উনিশ শ ছাপ্পান্ন সালে একটা জাহাজ এরিয়াল উপসাগরের পারে একদল মানুষ নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। তাদের কথাই বলছে খিলাফৎ, 'বাবুজী, এখানে আমি আর থাকব না। উত্তরে, আরো উত্তরে যেখানে মানুষ নেই, যেখানে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল, সেই ল্যাণ্ডফল দ্বীপে চলে যাব। মানুষ বড় তুশমন!'

পোর্ট কর্নওআলিসে ক্যাপটেন কিডের কলোনি আমি দেখি নি। কিন্তু এরিয়াল উপসাগরের পারে আর একটি উপনিবেশ আমি দেখেছি। উনিশ শ ছাপ্পান্নতে একদল নিঃস্ব, বিষণ্ণ, মৃতমুখ মানুষ এসেছিল। তারাই হাজার হাজার বছরের অরণ্য পরিষ্কার করে জনপদ গড়েছে।

আর দেখেছি, খিলাফৎ খানের মত মানববিদ্বেষীও সেই উপনিবেশে কুঠি বানিয়েছে। মানুষের মধ্যে সে বিশ্বাস, প্রেম খুঁজে পেয়েছে। ল্যাণ্ডফল দ্বীপে সে যায় নি ; কোন দিন যাবেও না।

উত্তর আন্দামানে আমি জীবনের উৎসব দেখেছি।

এরিয়াল উপসাগরে আজও তুফান ওঠে। সেই তুফানে মানুষের জীবনের তুফান মিশেছে। সেই তুফানে মানুষের হাসিকান্না, বেদনা যন্ত্রণার সুর অবিরাম বেজে যায়।

উপসাগরের মনে কি আছে, কে জানে ?

কাহিনী

এক

সেই দুপুরে উপসাগর জ্বলছিল।

শহর পোর্ট ব্লেয়ার থেকে শ খানেক মাইল দূরে উত্তর আন্দামানে এই উপসাগর; যার নাম এরিয়াল বে।

এরিয়াল বে'র নীল জল জ্বলছিল। পারের ম্যানগ্রোভ বন জ্বলছিল। আকাশে আটকে-থাকা সিন্ধু শকুনগুলো ঝলসে যাচ্ছিল।

উপসাগর আজ বড় শান্ত। তার নীল জলে ঢেউ ওঠে কি ওঠে না। জলের তলায় বাদামী বালির বিছানা। সেখানে অতি সন্তর্পণে বুকে হাঁটছে নানা আকারের সামুদ্রিক কড়ি শঙ্খ শামুক—যাদের নাম টার্বো, ট্রোকাস, নটিলাস, ফ্রগ শেল। বালির উপর তাদের চলার দাগ আঁকা হয়ে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে এক ঝাঁক রূপালী তীরের মত উড়ুক্কু মাছগুলি খানিকটা ছুটেই উপসাগরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তাদের ফিনফিনে ডানায় দুপুরের রোদ ঝিলিক মারে।

সমুদ্র ফুঁড়ে যে অন্ধ, উন্মাদ বাতাস পারের ম্যানগ্রোভ বনটাকে ইচ্ছামত নাস্তানাবুদ করে যায়, সেই বাতাসও আজ নেই।

এরিয়াল উপসাগরে আজ কোন শব্দ নেই। নীল জলে ঢেউ ওঠে কি ওঠে না; আকাশের সিন্ধুশকুনগুলো ডানা নাড়ে কি নাড়ে না; ম্যানগ্রোভ বনের মাথা নড়ে কি নড়ে না।

ঘোড়ার খুরের আকারে উপসাগরটা যেখানে বেঁকে সমুদ্রে মিশেছে সেখানে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সী-গাল পাখি। পাঁশুটে রঙের সী-গালটা অনড়, স্থির হয়ে উপসাগরের নীচে তাকিয়ে আছে। ম্যাকরেল মাছ চোখে পড়লেই সী-গালের চোখা, ধারাল ঠোঁট ছুটো বিদ্যুৎগতিতে জলের মধ্যে ঢুকে যাবে।

উপসাগরটা নিথর, নিঃশব্দ।

হঠাৎ শব্দ উঠল। বিকট, গম্ভীর, ভীষণ শব্দ। দূরের সমুদ্রে প্রলয় তুলে শাসাতে শাসাতে শব্দটা উপসাগরের দিকে এসে পড়ল।

মুহূর্তে শান্ত, নিঃশব্দ উপসাগরেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল।

পাঁশুটে রঙের সী-গাল পাখিটা ডানায় ঝটপট শব্দ তুলে কোন দিকে উড়ে গেল। জলের নীচে সামুদ্রিক কড়িগুলো বুকে হাঁটতে হাঁটতে থেমে গেল।

সমুদ্র থেকে এই নিস্তরঙ্গ উপসাগরে ঢেউ এল। একটার পর একটা বিরাট, বিপুল তরঙ্গ ছুটে আসতে লাগল।

শব্দটা তীব্র হচ্ছে, প্রবল হচ্ছে।

একসময়, উপসাগরটা যেখানে ঘোড়ার খুরের আকারে বেঁকে সমুদ্রে মিশেছে, সেখানে একটা মাস্তুল দেখা দিল। মাস্তুলটা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একটা জাহাজ হয়ে গেল।

এরিয়াল উপসাগরে জাহাজ এল।

সতরশ বিরানব্বুইতে উপনিবেশ পত্তনের আশায় কিড সাহেবের জাহাজ এসেছিল এই উপসাগরে। দীর্ঘ একশ চৌষট্টি বছর পর স্থায়ী বসতি গড়তে আবার জাহাজ এল।

এটা উনিশ শ ছাপ্পান্ন সালের এক মধ্য দুপুর।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা ভোজবাজি ঘটে গেল।

উপসাগরের পারটা বালির। এখানে সেখানে ম্যানগ্রোভ গাছগুলি ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে।

এতক্ষণ বালির উপর লাল রঙের ছোট ছোট কাঁকড়াগুলি বুকে হাঁটছিল। সামুদ্রিক শামুকগুলি অতি নিঃশব্দে গুটি গুটি চলছিল। কাঁকড়াগুলি গর্তে লুকাল। শামুকগুলি শক্ত খোলের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে পড়ে রইল।

জাহাজ আসার শব্দে জঙ্গল ফুঁড়ে কোথা থেকে একদল মানুষ বেরিয়ে পড়ল। উপসাগরের পারে এসে দাঁড়াল।

উপসাগরটা বাঁ দিকে বেঁকে সমুদ্রে মিশেছে। ডান দিকে একটা খাড়ি। খাড়ির পর জটিল অরণ্য। উপসাগরটা খাড়ির কাছে সঙ্কীর্ণ হয়ে সেই জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যে হারিয়ে গিয়েছে, কে জানে ?

খাড়ির মুখে এবার গুটিকতক কাঠের ডিঙি দেখা দিল। উপসাগরের মৃদু ঢেউয়ে দোল খেতে খেতে ডিঙিগুলি জাহাজটার দিকে এগুতে লাগল।

পারের কাছটা অগভীর। বড় জাহাজ কিনারে ভিড়তে পারে না। উপসাগরের মাঝখানে জাহাজটা স্থির হয়ে রইল; কড় কড় শব্দে মোটা মোটা শিকল আর নোঙর নামল জলে।

দুপুরটা জ্বলছে।

পারের ম্যানগ্রোভ বন জ্বলছে; চুগলুম দিচু আর প্যাডক গাছগুলি জ্বলছে; দূরে স্যাডল পীকের মাথাটা জ্বলছে। আকাশের গায়ে যে সিন্ধুশকুনগুলো ঝলসে যাচ্ছিল, তারা এসে জাহাজের চারপাশে চক্র দিতে শুরু করেছে।

জাহাজ আসাতে সব চেয়ে খুশী হয়েছে উড়ুক্কু মাছেরা। ফিন ফিনে ডানায় রোদ মেখে, সেই রোদে ঝিলিক হেনে হাজার হাজার উড়ুক্কু মাছ জাহাজের চারপাশে ছুটছে। উপসাগরের উড়ুক্কু মাছেরা জাহাজটাকে বুঝি বা সমুদ্র থেকে আসা একটা বিরাট মাছ ভেবে নিয়েছে।

এতক্ষণে ডিঙিগুলো উপসাগর সাঁতরে জাহাজের গায়ে এসে লেগেছে।

ধীরে ধীরে সূর্যটা পশ্চিম আকাশে ঢলতে লাগল। রোদের তেজ মরে আসছে। উপসাগরটা জুড়োচ্ছে।

এক সময় কাঠের সিঁড়ি বেয়ে জাহাজ থেকে একে একে

অনেকগুলো মানুষ ডিঙিতে নেমে এল। ডিঙিগুলো উপসাগরের পারে মানুষগুলোকে নামিয়ে আবার জাহাজটার দিকে ছুটল।

কতবার যে মানুষ নিয়ে ডিঙিগুলো পারে এল, সে হিসাব কে রাখে ?

এই নিঃশব্দ, নিঃসঙ্গ দ্বীপে অনেক, অনেকদিন পর মানুষ এল। অসংখ্য, অজস্র মানুষ।

উপসাগরের পারে ম্যানগ্রোভ বনের নীচে দলা পাকিয়ে বসল মানুষগুলো। ভীরু ভীরু চোখে একবার বন, একবার সমুদ্র, আর একবার দ্বীপ দেখতে লাগল।

অনেক, অসংখ্য মানুষ। যাদের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই। যাদের সকলের চোখের ভাষাই এক, মুখের চেহারা অভিন্ন। একদল দলা পাকানো মানুষ।

অনেক, অনেকদিন পর উত্তর আন্দামানে মানুষ এল। নিঃস্ব, ভীরু, মৃতমুখ একদল মানুষ। এরাই উপনিবেশ গড়বে।

দুই

বিকালের দিকে উপসাগরে তুফান উঠল।

আর উপসাগরে যত তুফান উঠল, তার চেয়ে অনেক বেশি উঠল কাপাসীর সর্বাঙ্গে। হাসির তুফান। হাসির দমকে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল কাপাসী। চিকণ মাজা, নিটোল দুটি বুক, রাঙা ডুরে শাড়ির তলে দুটি সুপুষ্ট পাছা—সুঠাম শরীরে হাসির তুফান খেলতে লাগল।

দুপুরে এই উপসাগর জ্বলছিল। তার নিস্তরঙ্গ নীল জলে ঢেউ উঠছিল কি উঠছিল না। কিন্তু এখন সূর্যটা পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে ; নীল জল এখন আর জ্বলছে না। এখন তুফান উঠছে। পাহাড়-প্রমাণ তুফানগুলি বিপুল আক্রোশে ম্যানগ্রোভ বন আর ক্ষয়িত শিলায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

উপসাগরের তুফানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাপাসী হাসে। হাসে আর ছোটে। পারের বালিতে পায়ের ছাপ গিঁথে গিঁথে সে ছোটে। ছোটে আর হাসে। সর্বাঙ্গ দিয়ে হাসে কাপাসী।

ভুরু দুটো জোড়া, মাজা শ্যামলা রঙ, টানা ঘনপক্ষ্ম চোখে কালো মণি দুটি টলটল করে। শ্যামল দেহ এখন ভাদ্রের ভরা নদী। নদী কেন, অথৈ অকূল সমুদ্রের উপমা দেওয়াই বুঝি ঠিক। এক কথায় কাপাসী রূপসী। তার সুঠাম শরীরে যত রূপ তত যৌবন। সেই রূপ সেই যৌবন যেন দেহের পাত্র ছাপিয়ে উপচে পড়ে।

কাপাসী হাসে। ধারাল, তীব্র, বিচিত্র হাসি। হাসির শব্দে সাগর পাখিগুলো ম্যানগ্রোভ বনের মাথা থেকে উড়ে উড়ে যায়। বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ দ্বীপ চমকে ওঠে।

বালির উপর মানুষগুলো দলা পাকিয়ে বসে ছিল। ভীত, জর্জরিত, নিঃস্ব একদল মানুষ। মানুষগুলোর স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্বই যেন নেই। এক সঙ্গে গায়ে গা ঠেকিয়ে পিণ্ডাকারে বসে রয়েছে তারা। মাঝে মাঝে ভীরু চোখে এদিক সেদিক দেখছে। ভেবেই পাচ্ছে না, দিনের পর দিন কূলকিনারাহীন অথৈ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এ তারা কোথায় এল! যে জীবন তারা পিছনে অনেক দূরে ফেলে এসেছে, সেই বড় সাধের জীবনটাকে বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন অরণ্যময় দ্বীপে কেমন করে, কোথা থেকে নতুন ভাবে শুরু করবে? তারা ভেবেই পাচ্ছে না।

এমন সময় উপসাগরের পারে কাপাসীর হাসি মেতে উঠল।

মানুষের পিণ্ডটা হঠাৎ চমকে উঠল।

কথায় বলে, মন বুঝে ক্ষণ। কাপাসীর হাসি মনও বোঝে না, ক্ষণও বোঝে না। অবুঝ, বিচিত্র হাসি তার মাততেই থাকে।

মানুষের পিণ্ডটার একধারে বসেছিল বুড়োবুড়ীরা, একধারে বয়স্কা বৌ-ঝিরা, একধারে যুবতী মেয়েরা। জলের কিনার ঘেঁষে বসেছিল জোয়ান ছেলেরা। বাচ্চাগুলো মা-বাপের সঙ্গে লেপটে ছিল।

বুড়ো রসিক শীল বলল, 'হাসে কে?'

বুড়ী বাসিনী বলে, 'কার পরানে এমন ফুর্তি জাগল? হাসির আর সময় গময় নাই?'

একটি বয়স্কা বউ ঘোমটার তলে মুখ বাঁকাল। বলল, 'পোড়ার মুখে হাসিও আসে! এতটুক সরম নাই। পোড়ার মুখে পোড়ার হাসি!'

যুবতীরা কিছুই বলে না। দুই ঠোঁটের ফাঁকে একটি নিঃশব্দ হাসিকে টিপে টিপে মারে।

জোয়ান ছেলেরাও কিছু বলে না। অবাক হয়ে দেখে, উপসাগরের পারে পায়ের দাগ এঁকে এঁকে কেমন করে সুঠাম শরীর বাঁকিয়ে চুরিয়ে কাপাসী ছুটছে। অবাক হয়ে কাপাসীর হাসির তীব্র, অবুঝ, বিচিত্র শব্দ শোনে।

বাচ্চাগুলোও কিছু বলে না। মা-বাপকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরে।

বুড়ো রসিক শীল আবার বলে, 'হাসে কে ?'

বুড়ী বাসিনী আবার বলে, 'পোড়ার মুখে ঈশ্বর হাসিও দেয়! আমরা চিন্তায় মরি। এত বড় সমুদ্দুর পাড়ি দিয়া কোথায় আসলাম ? আর মাগী হাসে; অঙ্গ ঢুলাইয়া ঢুলাইয়া হাসে। মাগীটা কে ?'

বয়স্কা বউটি ঘোমটার তল থেকে বলে, 'ও কাপাসী। নিত্য ঢালীর মেয়ে কাপাসী।'

রসিক শীল এবার ডাকে, 'অ নিত্য—'

পিণ্ডটার মধ্য থেকে একটি মানুষ উঠে দাঁড়ায়। সমস্ত মুখে চোখা চোখা কাঁচাপাকা দাড়ি, মজবুত বুক, শক্ত কব্জী, কিন্তু চোখ দুটি ঘোলাটে, বিবর্ণ। ধরা ধরা ভাঙা স্বরে মানুষটা বলল, 'আমারে ডাকলে রসিক খুড়া ?'

'হ।'

'ক্যান ?'

'মেয়ে এমন হাসে ক্যান ?'

'মেয়ের মনে কি আছে, আমি কি জানি ?'

রসিক শীল এবার ক্ষেপে উঠল, 'এতটুক সরমভরম নাই; নিলাজ ডাকাবুকা মাগী।' একটু থেমে আবার বলে, 'মেয়ের হাসি সামাল দে নিত্য।'

'মেয়ের হাসি কি আমার বশে ? তুমি তো সগলই (সকলই) জান খুড়া।' মুখখানা কাচুমাচু করে চেয়ে থাকে নিত্য ঢালী।

একটু সময় কি যে ভাবে রসিক শীল, সে-ই জানে। হঠাৎ স্বরটাকে নরম করে বলে, 'সগলই বুঝি নিত্য; কিন্তুক এ হ'ল আন্ধারমান (আন্দামান) দ্বীপ; বিদেশ অচিন জায়গা। ডরে সগলের বুক শুকাইয়া যায়। মেয়ের পরানেই খালি ডর নাই।'

কাতর গলায় নিত্য ঢালী বলে, 'ওর জনমটাই বৃথা হইয়া গেছে খুড়া। ডর, সরমভরম কিছুই কি ওর আছে? কখন হাসবে, কখন কাঁদবে, কে বলতে পারে?'

রসিক শীল আর কিছু বলে না। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে। তার ঘোলা ঘোলা চোখ দুটিতে কেমন যেন যন্ত্রণার ছাপ পড়ে।

একটু পর রসিক শীল আবার বলে, 'সগলই তো বুঝি নিত্য, কিন্তুক মানুষের মন তো বুঝ মানবে না। এত বড় মেয়ে, যেখানে সেখানে তার হাসন কি মানায়! দেখায় কেমন?'

নিত্য ঢালী উত্তর দেয় না।

কেমন মানায়, কেমন দেখায়, সেই বুঝে কি আর কাপাসী হাসে! উপসাগরের পারে বালিতে পা গিঁথে গিঁথে সে শুধু ছোটে। ছোটে আর হাসে। কোনদিকে তার লক্ষ্য নেই। তার অবুঝ হাসি ম্যানগ্রোভ বনের মধ্য দিয়ে সরসরিয়ে ছোটে।

কত বছর পর উপনিবেশ গড়ার আশায় মানুষ এসেছে এই দ্বীপে। মানুষের হাসি এসেছে। নির্জন, নিঃসঙ্গ বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপ কত বছর পর মানুষের হাসি শুনছে!

ঘোমটার তলায় বউরা বলে, ঘোমটা খসিয়ে বয়স্কা মেয়েমানুষগুলো বলে, 'হাসন! হাসন না তো মরণ! মাগীর অঙ্গে এত হাসিও আছে!'

কেন জানি বুড়ো রসিক শীল বলে, 'আহা হাসুক হাসুক; সগলই তো ওর গেছে, জনমটাই বৃথা হইয়া গেছে। হাসলে এট্টু যদি শান্তি পায় তো হাসুক।'

জাহাজ আসার শব্দ পেয়ে জনকতক মানুষ জঙ্গল ফুঁড়ে এরিয়াল উপসাগরের পারে এসেছিল। তারা একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা জন চারেক আদিবাসী রাঁচী কুলী; ধানোয়ার, কচ্ছপ,

ডুগুডুগু আর টিরকি। একজন পাটোয়ারী; আতমন সিং। একজন চেইন ম্যান; নিবারণ সাপুই। আর একজন কলোনাইজেশন এ্যাসিস্টাণ্ট—সংক্ষেপে সি. এ.। সি. এ. নামের নীচে তার আদত নাম হারিয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ অবশ্য তাকে পাল সাহাব বলেও ডাকে।

দলটা এক কিনারে দাঁড়িয়ে ছিল।

সি. এ. পাল সাহাব সামনে এগিয়ে এল। পরণে খাকি হাফ প্যাণ্ট, বোতামহীন হাফ সার্টের ফাঁকে রোমাকীর্ণ মাংসল বুক, ভাঙা ভাঙা ক্ষয়িত নখ, মাথায় ফেল্টের হ্যাট। হ্যাটটার আদি বর্ণ কি ছিল, পাল সাহেবও বলতে পারে না। রোমশ বুক, মুখময় অযত্নে লালিত দাড়িগোঁফ, নোংরা দাঁত আর জংলী অমার্জিত চেহারা থেকে তার সঠিক বয়স বার করা তুরূহ ব্যাপার।

উপসাগরটাকে চমকে দিয়ে পাল সাহাব চিৎকার করে উঠল, 'শালে লোগ, আমি সি, এ. পাল সাহাব। মনে রাখবি। এখন আমার সাথ সাথ চল।'

মানুষের পিণ্ডটা নড়ে উঠল। কাপাসীর হাসি থামল।

অনেক, অনেক দূরে আর একটা সাধের জীবনকে ফেলে এসেছে মানুষগুলো। স্মৃতি ছাড়া সেই জীবন থেকে তারা কিছুই আনতে পারে নি।

ছোট ছোট পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে মানুষগুলো উঠে দাঁড়াল।

এরিয়াল উপসাগরের মাঝখানে ঘড় ঘড় শব্দ উঠল। বিকট আওয়াজে জাহাজীরা নোঙর তুলছে।

খানিকটা পর উপসাগরের পারে একদল মানুষ নামিয়ে দিয়ে জাহাজটা দূরে সমুদ্রের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তিন

এরিয়াল উপসাগরটা ঘোড়ার খুরের আকারে বেঁকে একদিকে সমুদ্রে মিশেছে। আর একদিকে সঙ্কীর্ণ হয়ে একটা খাড়ির সৃষ্টি করে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কোথায় যে উধাও হয়েছে!

অগভীর খাড়ির তুপাশে বিরাট বিরাট পাথরের খণ্ড। লবণ জলে পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে গিয়েছে। তুপাশ থেকে ম্যানগ্রোভ গাছগুলি খাড়ির উপর ঝুঁকে পড়েছে।

এতক্ষণ খাড়ির মুখে লবণ জল ফুলে ফুলে উঠছিল, গেঁজে গেঁজে ম্যানগ্রোভ বনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল।

খাড়ির মুখে এবার একটা ছোট মোটর বোট দেখা দিল। ভট্ ভট্ শব্দ উঠল। মোটর বোটটার নাম 'নটিলাস'।

দেখেই বোঝা যায়, এটা শেল কালেক্টরদের বোট।

'শেল' অর্থাৎ সামুদ্রিক শঙ্খ, কড়ি, শামুক; যাদের রূপের বাহার যত, নামের বাহার তত। কোনটার নাম টার্বো, কোনটার ট্রোকাস, কোনটার বা শামভায়াল। আরো আছে; নটিলাস, ক্রগশেল, ক্লাম। হরেক চেহারা, হরেক নাম।

শঙ্খ, কড়ি, শামুক—'শেল' কালেক্টাররা এদের বলে 'সিপি'। অগভীর উপসাগরে ডুব মেরে মেরে ডুবুরীরা 'সিপি' তোলে। আন্দামানের 'সিপি' জাহাজ ভরে ভরে বিদেশের বন্দরে চালান যায়। আন্দামানের শঙ্খকড়ি সৌখিন বিদেশীর চোখ ধাঁধায়। বিলাসিনী বিদেশিনীর শখ মেটায়।

'নটিলাস' বোট ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে খাড়ির মুখ থেকে উপসাগরের কিনার ঘেঁষে এগুতে থাকে। শব্দ ওঠে কি ওঠে না।

আপনা থেকে উপসাগরে যে তুফান উঠছে, তার উপর বাড়তি তুফান জাগে কি জাগে না।

জলের নীচে বাদামী বালির বিছানা; মাঝে মাঝে মাথা তুলে রয়েছে ছোট ছোট ক্ষয়িত পাথর। পাথরের গায়ে কত কালের শ্যাওলা জমে পিছল হয়ে আছে। সবুজ রঙের জলজ লতার গুচ্ছ পাথরগুলোকে জড়িয়ে রয়েছে।

কাচের মত স্বচ্ছ, নীলচে জলের নীচে সবই পরিষ্কার দেখা যায়। শেষ বেলার রোদে বালির কণাগুলি চিকমিক করে। শ্যাওলার ফাঁকে ফাঁকে রূপালী আঁশে ঝলস দিয়ে ছোট ছোট মায়া মাছগুলি উলসে ওঠে।

'নটিলাস' বোট ধীরে ধীরে এগোয়।

বোটটার মাঝখানে ছোট একটা শেড। একদিকে দুটো মানুষ চুপচাপ বসে রয়েছে। তাদের একজন বর্মী; নাম লা তে। লা তে 'নটিলাস' বোটের ডাইভার। আন্দামানের উপকূল আর উপসাগর থেকে ডুব মেরে মেরে সে 'সিপি' তোলে। উপসাগরের নীচে দৃষ্টিটাকে নামিয়ে দিয়ে স্থির হয়ে বসে রয়েছে লা তে।

লা তে'র পাশে খিলাফৎ খান। খিলাফৎ খান পাঠান। সে ডুবুরি নয়; ফরেস্ট গার্ড। কি সখ হয়েছে খিলাফতের, সে-ই জানে। আজ লা তে'দের সঙ্গে 'নটিলাস' বোটে বেরিয়ে পড়েছে।

শেডের ওপাশে বসে রয়েছে পানিকর। 'নটিলাস' বোটের মালিক। উত্তর আন্দামানের এই এলাকাটা 'শেল' তোলার জন্য সরকারের কাছ থেকে ইজারা নিয়েছে পানিকর।

'নটিলাস' বোট সন্তর্পণে এগুতে থাকে।

জলের উপর ঝুঁকে রয়েছে লা তে।

পাশ থেকে খিলাফৎ খান ডাকে, 'এই লা তে—'

লা তে জবাব দেয় না।

খিলাফৎ আবার ডাকে, 'লা তে, এই শালে লা তে।'

এক দৃষ্টে উপসাগরের তলায় কি যেন দেখছিল লা তে। খিলাফতের ভোতা কর্কশ স্বরে চমকে উঠল, 'হাঁ হাঁ খান সাহাব, কি বলছ?'

আস্তে একটা খিস্তি দিল খিলাফৎ, 'নালায়েক কাঁহিকা; কখন থেকে ডাকছি, শুনতে পাচ্ছে না—'

এক মুহূর্ত খিলাফৎ খানের দিকে চেয়ে রইল লা তে। তারপরেই তার দৃষ্টিটা উপসাগর ফুঁড়ে নীচে নেমে গেল।

ইতিমধ্যে উপসাগরের তুফান মরে আসতে শুরু করেছে। নীল জল এখন স্থির, শান্ত।

'নটিলাস' বোট ধীরে ধীরে উপসাগরে এতটুকু আলোড়ন না তুলে এগুতে থাকে। বালির বিছানায় বুকে হাঁটছে টার্বো, ট্রোকাস, নটিলাস। কোনরকম শব্দ হলেই অগভীর উপসাগর থেকে তারা অথৈ দরিয়ায় পালিয়ে যাবে।

বালির উপর আঁকাবাঁকা আড়াআড়ি অসংখ্য দাগ। ওগুলি 'সিপি' চলার দাগ।

একটা টার্বো গুটি গুটি এগুচ্ছিল। তীক্ষ্ণ নজরে চেয়ে ছিল লা তে। হঠাৎ পাশ থেকে পিঠের উপর কনুইর গুঁতো পড়ল। লা তে লাফিয়ে উঠল, 'হাঁ হাঁ, খানসাহেব, কুছু বলছ?'

'শালে উল্লু, দরিয়ায় এলে পাগলা বনে যায়। আমাকে বসিয়ে রেখে 'সিপি' তুলবি, আর আমি মুখ বুঁজে বসে থাকব। অ্যায়সা হবে না।' খিলাফৎ খান খেঁকিয়ে উঠল।

প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে, কুতকুতে চোখ দুটো পিট পিট করে লা তে বলল, 'হাঁ হাঁ, জরুর—'

একটুক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ খিলাফৎ খান সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বলল, 'লা তে, সরকার এই ডিগলিপুরের জঙ্গল সাফ করে ফেলছে।'

'হাঁ—'

'বড় বড় পেমা বরগাত দিহু গাছগুলো পুড়িয়ে পুড়িয়ে লোপাট করে দিচ্ছে। ডিগলিপুরে জঙ্গল আর থাকবে না।'

'হাঁ—'

'এখানে ক্ষেতিবাড়ি হবে, গাঁও বসবে, কলোনি হবে।'

অন্যমনস্ক, উদাস স্বরে লা তে সায় দেয়, 'হাঁ—'

লা তে'র কোনদিকে খেয়াল নেই। খিলাফতের কথাগুলি তার কানে ঢোকে কি ঢোকে না! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উপসাগরের নীচে তাকিয়েছিল লা তে।

অনেক নীচে বিরাট একটা ক্লাম দুটো সফেদ ডালা খুলে রয়েছে। দুই ডালার মধ্যে সবুজ রঙের আলোকপিণ্ড ঝিকমিক করে। ক্লামটার চারপাশে দুটো বাচ্চা হাঙর বিচিত্র উল্লাসে ডিগবাজি খায়। মাঝে মাঝে সারি সারি ধারাল দাঁতে ক্লামটাকে ঠুকরে ঠুকরে সোহাগ জানায়।

চাপা কুতকুতে চোখে দৃষ্টিটা তীব্র হয়ে উঠেছে। থ্যাবড়া নাকের ডগাটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। কোমরে একটা ছোরার বাঁট দেখা যায়। নিজের অজান্তেই লা তে'র থাবাটা ছোরার বাঁটের উপর এসে পড়ল। আস্তে আস্তে বোটের শেষ মাথায় এসে দুটো পা জোড়া করে ওত পেতে বসল লা তে।

পাশ থেকে খিলাফৎ খান আবার বলতে লাগল, 'কিড সাহাবের কলোনি উঠে গিয়েছিল, ভালই হয়েছিল।'

লা তে জবাব দিল না।

খিলাফৎ নিজের খেয়ালেই বলে যায়, 'লেকিন এত বছর বাদে আবার মানুষ এল। দুশমনেরা এখানেও আমাকে টিকতে দেবে না।'

লা তে এবারও জবাব দিল না। একদৃষ্টে ক্লাম আর বাচ্চা হাঙর দুটোকে দেখতে লাগল।

'বুঝলি লা তে—'

একটু থামল খিলাফৎ। লা তে'র দিক থেকে সায় না পেয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'এ শালে উল্লু, এই লা তে—'

আধাআধি কথা খিলাফতের মুখেই রয়ে গেল। পুরাপুরি হবার আগেই উপসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ল লা তে।

হাঙরের বাচ্চা দুটো পাথরের খাঁজে পালিয়ে গেল। ক্লামের ডালা দুটো বন্ধ হয়ে সবুজ আলোর পিণ্ডটাকে লুকিয়ে ফেলল।

ডুব দিয়ে ক্লামটাকে বোটের উপর তুলে আনল লা তে। লা তে পাকা ডুবুরি; ওস্তাদ ডাইভার। ডুব দিলে সমুদ্র থেকে কিছু কর আদায় না করে সে ফেরে না। আন্দামানের দরিয়ার সঙ্গে তার তামাম জীবনের জানপয়চান। কোন উপসাগরে ঝাঁকে ঝাঁকে টার্বো আসে, কোথায় সান ডায়ালের আস্তানা, কোথায় মুক্তা ঝিনুক মেলে; সব—সব লা তে'র মুখস্থ। অক্টোপাসের সঙ্গে যুঝে যুঝে, হাঙরের মুখ থেকে, হিংস্র রেমোরা মাছের সঙ্গে লড়াই করে 'সিপি' তোলে লা তে। অন্য ডাইভাররা যখন দশটা 'সিপি' তোলে, সে তোলে বিশটা।

'সিপি' তোলার মরশুমের অনেক আগেই শেল কালেক্টাররা তাকে বায়না করে। দিন কতক হ'ল এবার 'সিপি'র মরশুম শুরু হয়েছে। এই মরশুমে তাকে কাজে নিয়েছে পানিকর। পানিকর 'নটিলাস' বোটের মালিক।

শেডের ওপাশে একটা খুশী খুশী স্বর শোনা গেল। পানিকর বলছে, 'কি 'সিপি' তুললি রে লা তে?'

'ক্লাম।'

'বহুত আচ্ছা—'

ক্লামটাকে বোটের খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে জুত করে বসল লা তে। পানিকরই বোট চালাচ্ছে। আস্তে আস্তে জলে এতটুকু ঢেউ না জাগিয়ে উপসাগরের কিনার থেকে বোটটাকে একটু দূরে নিয়ে এল।

রোদের তেজ মরে এসেছে। বিষণ্ণ, ম্লান আলো উপসাগরে মৃদু মৃদু দোল খায়।

খিলাফৎ খান বলল, 'আজকালের মধ্যে এখানে মানুষ আসবে, বহুত বহুত মানুষ। তাদের জন্যে জঙ্গল সাফ করা হচ্ছে। তারা এখানে কলোনি বানাবে।'

'হাঁ—'

অভ্যাস বশে একটি মাত্র শব্দ করে সায় দিল লা তে। তার কোন দিকে নজর নেই। উপসাগরে ঝুঁকে ঝুঁকে সে 'সিপি' খুঁজছে।

'মানুষ হল বেইমান, দুশমন—'

'হাঁ—'

'শালে লোগ এলে এখান থেকে চলে যাব।'

'হাঁ—'

হঠাৎ শেডের ওপাশ থেকে পানিকর চেঁচিয়ে উঠল, 'এই লা তে, এ খিলাফৎ—'

'হাঁ—হাঁ—'

লা তে, খিলাফৎ চমকে উঠল।

পানিকর বলল, 'ঐ ত্যাখ জাহাজ এসেছে—'

'জাহাজ এসেছে!'

খিলাফৎ খান আঁতকে উঠল। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল, উপসাগরের ঠিক মাঝখানে সবুজ রঙের একটা বিরাট জাহাজ স্থির হয়ে রয়েছে। দৃষ্টিটা ঘুরে দূরে উপসাগরের পারে গিয়ে পড়ল; সেখানে একদল মানুষ দলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বুকে একটা চাপড় মারল খিলাফৎ। গলায় আক্ষেপের স্বর ফুটল, 'আঃ, আদমীগুলো এসে পড়ল! জঙ্গলের জান এবার লবেজান হয়ে যাবে!'

খিলাফৎ খান দেখল, কিড সাহেবের কলোনি উঠে যাবার কত কাল পর আবার মানুষ এসেছে উত্তর আন্দামানে।

চার

আগে আগে চলেছে সি, এ, পালসাহাব, মাঝখানে মানুষের দলটা, একেবারে পিছনে পিছনে আসছে ফরেস্টের কুলী, সরকারী চেইনম্যান, পাটোয়ারী আর জবাবদাররা।

উপসাগরের পর খানিকটা সমতল। সেখানে ম্যানগ্রোভ বন। সমতলটা ধীরে ধীরে চড়াই বেয়ে ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে গিয়েছে। পাহাড়ের গায়ে প্যাডক, পাপিতা, মুত্রার বন। বেতের লতা গাছগুলিকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে অরণ্যকে জটিল করে তুলেছে।

আন্দামানের অরণ্য!

কতকাল ধরে এই অরণ্য ধীরে সুস্থে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপের দখল নিয়েছে। এই নির্জন, নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন দ্বীপের দখল নেবার জন্য কোন দিন দ্বিতীয় কোন দাবীদার জোটে নি। হাজার হাজার বছর ধরে এই দ্বীপে কত বনস্পতি, কত ক্ষুদ্র, নগণ্য উদ্ভিদই না জন্মেছে! গাছে ফুল ধরেছে, ফুল থেকে ফল, ফল থেকে বীজ; বীজের মধ্যে অরণ্য আবার নতুন করে জন্ম নিয়েছে। শিকড়ে বাকড়ে সন্তান সন্ততিতে এই অরণ্য কত কাল ধরে এই দ্বীপের মৃত্তিকাকে ঘিরে রেখেছে।

সবার আগে চলেছে পাল সাহাব। হাতে একটা ধারাল বর্মী দা। দা দিয়ে লতাপাতা ডালপালা কেটে ছেঁটে পথ করে এগুচ্ছে সে।

অরণ্য কি পথ দিতে চায়! ডালপালার হাজার বাহু বাড়িয়ে এই দ্বীপের নতুন শরিকদের ক্রমাগত বাধা দিচ্ছে।

কতকাল এই অরণ্যে সূর্যালোক ঢোকে নি। নিঝুম, নিস্তব্ধ, ছায়াশীতল এই বনভূমি।

শ্যাওলা ধরা পিচ্ছিল মাটির উপর দিয়ে ঢুলতে ঢুলতে, কখনও গুঁড়ি মেরে, কখনও উবু হয়ে এগুচ্ছে পাল সাহাব। সমানে উৎসাহ দিচ্ছে, 'আ যাও, কেমন আচ্ছা সড়ক বানিয়ে দিচ্ছি! মাথা সামাল রেখে আমার পিছু পিছু আ যাও; কোন ডর নেই।'

ডালপালা ছাঁটতে ছাঁটতে মাঝে মাঝে পিছন ফেরে পাল সাহাব। হলদে হলদে নোংরা দাঁতগুলো মেলে খ্যা খ্যা করে হাসে। বলে, 'শালে লোগ, ঘাবড়াও মাত্; তোমাদের সাথ আমি আছি।' বলেই বুকে চাপড় বসায়।

পায়ে পায়ে ঠোক্কর, মাথায় গুঁতো আর চারপাশ থেকে কাঁটার খোঁচা খেতে খেতে মানুষের পিণ্ডটা এগুচ্ছে।

বনের মাথা থেকে থোকায় থোকায় জোঁক পড়ছে। কতকালের বুভুক্ষু সব জোঁক। এই প্রথম তারা মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে।

বুড়া রসিক শীল ভীষণ ভয় পেয়েছে। কাঁপা-কাঁপা ফিস-ফিস স্বরে সে বলে, 'এই আমরা আসলাম কোথায়?'

মানুষের পিণ্ডটার মধ্য থেকে কে যেন বলে, 'নির্ঘাত মরে যামু। একটা দিনও বাঁচুম না।'

হঠাৎ কান্নার রোল উঠল।

সেই মৃতমুখ, নিঃস্ব, মানুষগুলো সমস্বরে কাঁদছে। অসহায়, ভীত মানুষের কান্না উত্তর আন্দামানের এই স্তব্ধ অরণ্যে গুমরে গুমরে মরতে লাগল।

কতকাল পর এখানে মানুষ কাঁদছে! কান্নার শব্দ নিবিড় বনভূমি ভেদ করে বাইরে যায় না; পত্রপুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে জড়িয়ে থাকে।

গুঁড়ি মেরে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকছিল পাল সাহাব। হঠাৎ উঠে ঘুরে দাঁড়াল। ফেল্ট হ্যাটের নীচে যে মুখটা দেখা যায়, সেটা বিরক্ত, ভীষণ হয়ে উঠেছে। কপালটা কুঁচকে অনেকগুলো রেখা পড়েছে। নাকটা ফুলে ফুলে মোটা হচ্ছে।

পাল সাহাব গর্জে উঠল, 'কৌন কৌন—কে কাঁদছে? কাঁদো মাত। এ জঙ্গল আমার এলাকা, এখানে চিল্লানি চলবে না। উল্লু লোগ—'

ঘুরে ঝোপটার মধ্যে গুঁড়ি মেরে ঢুকল পাল সাহাব।

মুহূর্তে কান্নার রোলটা ঝিমিয়ে এল।

অন্ধকার, হিমাক্ত, এই নিঝুম বনভূমির মাথায় আকাশের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়, কিন্তু চোখে দেখা যায় না। বোঝা যায়, অরণ্যের বাইরে এখনও রোদ রয়েছে। কিন্তু সে রোদের রঙ কি, তেজ কেমন, বুঝবার উপায় নেই।

ঢুলতে ঢুলতে, ঠোক্কর, গুঁতো আর খোঁচা খেতে খেতে মানুষগুলো পাল সাহাবের পিছু পিছু চলেছে। কোথায়, কেন তারা চলেছে, নিজেরাই জানে না। জানবার আগ্রহ পর্যন্ত নেই। কি এক দুর্বোধ্য, নির্মম তাগিদ মানুষের পিণ্ডটাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে।

মাথার উপর থেকে থোকায় থোকায় জোঁক ঝরছে। মানুষের রক্ত শুষে শুষে ফুলে মাতাল হয়ে আপনা থেকেই জোঁকগুলো খসে পড়ছে।

কান্নার রোলটা ঝিমিয়ে এসেছে; কিন্তু একেবারে থামে নি। অনুচ্চ, করুণ স্বরে মানুষগুলো বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে।

বুড়া রসিক শীল বলে, 'হা ঈশ্বর কপালে এত লিখছিলে! এই কোথায় মারতে আনলে? হা ঈশ্বর—'

তার বিষণ্ণ স্বরটা আর ফোটে না।

মানুষের অনুচ্চ কান্না আর এই নিথর বনভূমিকে হঠাৎ চমকে দিয়ে তীব্র, তীক্ষ্ণ, প্রখর হাসির শব্দ উঠল।

কাপাসী হাসছে। ককিয়ে ককিয়ে, মেতে মেতে উঠতে লাগল হাসিটা।

একটা কাঁটাবেত কেটে পথ বানাচ্ছিল পাল সাহাব। হাসির সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুরে দাঁড়াল। দাড়িময় জংলী মুখটা খিঁচিয়ে, দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'কৌন, কৌন হাসতা? কে হাসছে?'

কাঁপা কাঁপা ভীরু স্বরে কে যেন জবাব দিল, 'নিত্য ঢালীর মেয়ে কাপাসী। কাপাসী হাসে সাহাব বাবা।'

পাল সাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'এ হল ডিগলিপুর; নর্থ আন্দামান। এখানে হাসি চলবে না।'

হাসি চলবে না। কিন্তু চলল।

এক ধমকে এক দল মানুষের কান্না থামিয়ে দিয়েছিল পাল-সাহেব। কিন্তু কাপাসীর হাসি থামাতে পারল না।

উত্তর আন্দামানের স্তব্ধ অরণ্যে চমক দিয়ে দিয়ে কাপাসীর হাসি মাততেই থাকল।

পাল সাহেবের ভুরু দুটো কুঁকড়েই রইল কিছুক্ষণ। বিড় বিড় করে সে বলল, 'বহুত তাজ্জবের আওরত।'

বলেই আবার সামনের দিকে চলতে শুরু করল।

পাল সাহেবের পিছু পিছু মানুষের পিণ্ডটা কতক্ষণ যে চলল, হিসাব নেই। টিলা পাহাড়, চড়াই উতরাই পেরিয়ে জঙ্গল ফুঁড়ে ফুঁড়ে কোথায় যে চলেছে, তারা নিজেরাই জানে না। চমড়া ছিঁড়ে রক্ত ঝরছে, কাঁটার গুঁতোতে সমস্ত শরীর রক্তাক্ত। জোঁকের পেটে তাজা রক্তের কর দিয়ে রক্তমুখ মানুষগুলো উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে।

এক সময় বোঝা গেল, অরণ্যের মাথায় আকাশটা আবছা হয়ে গিয়েছে। রোদ আর নেই। বনভূমিতে অন্ধকার নেমেছে।

ডানা ঝাপটিয়ে সিন্ধুসারসগুলো বনের আশ্রয়ে ফিরে এল। ক্ক ক্ক শব্দে কোয়াক পাখিরা ডেকে উঠল। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে সন্ধ্যা নামল।

পাল সাহেব নামে এক অনিবার্য নিয়তির পিছু পিছু চলতে চলতে মানুষগুলো একটা টিলার মাথায় এসে পড়ল।

টিলার মাথাটা পরিষ্কার, অন্ধকার এখানে ফিকে।

পাল সাহেব থমকে দাঁড়াল। পিছন দিকে ঘুরে চিৎকার করে উঠল, 'আ গিয়া ; ট্রানজিট ক্যাম্প আ গিয়া—'

পাঁচ

ট্রানজিট ক্যাম্প !

বিরাট একটা টিলার মাথায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতকগুলি বাঁশের টুকরা পোঁতা। বাঁশের ডগায় কয়েকটা লণ্ঠন বাঁধা রয়েছে।

বঙ্গোপসাগরের এই বর্বর দ্বীপের রাত্রিগুলি কেমন যেন সৃষ্টিছাড়া।

এখন যত না অন্ধকার, তত কুয়াশা।

সেই বিকাল থেকে কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। প্রথমে ফিনফিনে একটা পর্দার মত অরণ্যকে জড়িয়ে ধরেছে। তারপর ধীরে ধীরে সেই কুয়াশা জমাট বেঁধে, গাঢ় এবং স্তূপাকার হয়ে দিগন্ত রোধ করে দাঁড়িয়েছে। চারপাশ থেকে নিরেট কুয়াশার খাড়া খাড়া দেওয়াল আকাশের দিকে উঠে গিয়েছে।

অরণ্য, আকাশ—কিছুই এখন দেখা যায় না। কোন কিছুর নির্দিষ্ট আকার ঠিকমত বোঝা যায় না। ঘন, সাদা কুয়াশার আড়ালে এখন সমস্ত কিছু অবলুপ্ত। গাঢ় কুয়াশা উত্তর আন্দামানের এই টিলাটাকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

বাঁশের ডগায় মিট মিট করে লণ্ঠনগুলো জ্বলছে। লণ্ঠনের মৃদু আলোতে কুয়াশা এবং অন্ধকার খানে খানে ছিঁড়ে গিয়েছে।

টিলার মাথাটা অনেকখানি জুড়ে সমতল। জঙ্গল সাফ করে টিলাটাকে ন্যাড়া করে ফেলা হয়েছে।

ন্যাড়া টিলার মাথা ফুঁড়ে সারি সারি কতকগুলি ঝুপড়ি উঠেছে।

অরণ্যকে ডলে পিষে মুচড়ে বাতাস ছুটে আসছে। দমকা বাতাসের বাড়ি খেয়ে খেয়ে লণ্ঠনগুলো নিবে যাবার উপক্রম হয়, নির্জীব হয়ে পড়ে।

নিজেদের ক্ষীণ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য লণ্ঠনগুলো পাল্লা দিয়ে বাতাস, কুয়াশা এবং অন্ধকারের সঙ্গে যুঝছে।

আবছা আলোতেই বোঝা যায়, ঝুপড়িগুলির মাথায় বেত-পাতার চাল, বাঁশের দেওয়াল, বাঁশের পাটাতন।

সি. এ. পাল সাহাব টেনে টেনে চিল্লাল, 'দেখে নে শালে লোক—এই হল ট্রানজিট ক্যাম্প, তোদের আস্তানা।'

পাল সাহাবের পিছনে মানুষগুলো দলা পাকিয়ে রয়েছে। তারা কেউ জবাব দেয় না। শূন্য দৃষ্টিতে ঝুপড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝবার চেষ্টা করে।

পাল সাহাব বলল, 'যতদিন না নিজের নিজের কুঠি বানিয়ে নিতে পারবি, ততদিন এখানেই থাকতে হবে।'

এর মধ্যে পাটোয়ারী, চেনম্যান এবং রাঁচী কুলীরা অনেকগুলো মশাল ধরিয়েছে। অন্ধকার এবং কুয়াশা অনেকটা পিছু হটেছে।

পাল সাহাব দলা পাকানো মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'যা, সবাই ঝুপড়ির ভিতর যা। এবার খানা মিলবে।'

মানুষগুলো নড়ল না। আগের মতই ভাবলেশহীন শূন্য দৃষ্টিতে ঝুপড়ি ক'টার দিকে চেয়ে চেয়ে তারা কি যেন বুঝতে চাইছে।

অনেকগুলো মানুষ। কিন্তু তাদের ভিন্ন ভিন্ন কোন অস্তিত্ব নেই। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে তারা পিণ্ড পাকিয়ে রয়েছে। জীবন্ত মানুষের একটা নিষ্প্রাণ পিণ্ড।

পাল সাহাব আবার বলল, 'ঝুপড়ির অন্দর যা, খানা মিলবে।'

পুরা পাঁচটা দিন বঙ্গোপসাগরের কালা পানি পাড়ি দিয়ে এই দ্বীপে এসে পৌঁছেছে। এই পাঁচ দিনে তাদের ঠিকমত খাদ্য জোটে নি। জাহাজ থেকে চারপাশে সীমাহীন, অফুরন্ত সমুদ্র দেখতে দেখতে অদ্ভুত এক ভয়ে তারা আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। তারা বুঝে উঠতে পারছিল না, এই বিপুল দরিয়া পেরিয়ে তারা কোথায় চলেছে।

যতদূর তাকানো যায়, কালো কুটিল দুর্জ্ঞেয় বঙ্গোপসাগর। তাদের মনে হয়েছিল, এই সমুদ্রের শেষ নেই। সমুদ্র কোনদিন ফুরাবে না।

কিন্তু সমুদ্র একদিন ফুরাল। কূলও মিলল ; শক্ত নির্ভরযোগ্য মাটির দেখা পাওয়া গেল। এরিয়াল উপসাগরে এসে জাহাজটা নোঙর ফেলল।

ভয়েও বুঝি এক ধরনের নেশা আছে।

ভয়ঙ্কর সমুদ্র দেখে যে ভয়ের নেশা ধরেছিল, সেই নেশায় মানুষগুলো এখনও বুঁদ হয়ে রয়েছে।

পাল সাহাব এবার খেঁকিয়ে উঠল, 'কি রে শালেরা, ঝুপড়ির অন্দর যাবি না! খানা গিলবি না!'

পাঁচটা দিন জাহাজে ঠিকমত খাওয়া জোটে নি। তবু খাদ্যের কথায় মানুষগুলোকে এতটুকু উদগ্রীব দেখাল না। বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না কেউ। একজোড়া চোখও লোভে চকচক করে উঠল না।

এবার পাল সাহাব আর চিল্লাল না, খেঁকাল না। মানুষগুলোকে বেতের পোক্ত একটি ডাণ্ডা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাড়িয়ে তাড়িয়ে ঝুপড়ির ভিতর ঢুকিয়ে দিল।

অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ত এই মানুষগুলোর চরিত্র অনেক-

খানিই বুঝে ফেলেছে পাল সাহাব। এদের নিজস্ব কোন ইচ্ছা নেই। আর থাকলেও সে ইচ্ছা তাদের নিজেদের উপর কোন ক্রিয়াই করে না। অন্যের ইচ্ছায় কি তাড়নায় তারা নড়ে চড়ে, চলে ফেরে।

ঝুপড়ির ভিতর ঢুকিয়ে সবাইকে সারি সারি বসিয়ে দিল পাল সাহাব। পাটোয়ারী এবং চেনম্যানরা বড় বড় প্যাডক পাতায় ভাত, ডাল এবং মাছের সুরুয়া দিতে লাগল।

মানুষগুলো গুটিসুটি মেরে বসে রয়েছে। বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে টিলার মাথায় এই নতুন আশ্রয় আর চেনম্যান, পাটোয়ারীদের কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে কি ভাবছে, তারাই জানে।

পাল সাহাব চিৎকার করে উঠল, 'খা শালেরা, হাতের সামনে খানা রয়েছে। গপাগপ মুখে ঢোকাবি, তা নয়। খাওয়ার কথাও বুদ্ধুগুলোকে বলে দিতে হয়। বহুত তাজ্জবের আদমী সব।'

চিল্লিয়ে, ধমকে, একরকম জবরদস্তি করেই পাল সাহাব মানুষ-গুলোকে খাওয়াল।

খাওয়ার পর্ব চুকে গেলে পাটোয়ারী আর চেনম্যানরা ঝুপড়িগুলো সাফ করে ফেলল। পাল সাহেব বলল, 'মরদানারা আমার সাথ আয়।'

পাল সাহাবের মুখ থেকে কথা খসবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ মানুষ-গুলো উঠে পড়ল। তার পিছু পিছু বাইরে এল।

টিলার মাথায় মোট সাতটা ঝুপড়ি।

পাল সাহাব বলল, 'চার ঝুপড়িতে মরদানারা থাকবে, বাকী তিন ঝুপড়িতে জেনানারা থাকবে।'

পাল সাহাবই সব বন্দোবস্ত করে দিল।

সামনের দিকের চারটে ঝুপড়িতে রাত্রিবেলা পুরুষরা শোবে।

পিছনের তিনটে ঝুপড়িতে মেয়েমানুষগুলো বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে থাকবে।

বাইরে রাত্রি আরো গাঢ় হয়েছে। কুয়াশা এবং অন্ধকারের নীচে উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপটা একেবারেই হারিয়ে গিয়েছে।

পাল সাহাব বলল, 'এবার আমি যাব। জোঁক, কানখাজুরা (এক ধরনের বিষাক্ত সরীসৃপ) আর সাপ মেহেরবানি করে যদি তোদের বাঁচিয়ে রাখে, তা হলে কাল সকালে আবার দেখা হবে।'

পাল সাহাব হাসল। হাসলে দু-পাটির সবগুলো দাঁত বেরিয়ে পড়ে। ভাঙা, বাঁকা, হলদে ছোপধরা দাঁতগুলো খিঁচিয়ে থাকে।

বিকট শব্দ করে হাসতে থাকে পাল সাহাব। হাসির দাপটে ভুরু আর হনু জোড়া লেগে চোখ দুটো ঢেকে যায়। বিরাট, মাংসল শরীরটা দুলতে থাকে।

খানিকটা পর হাসির প্রকোপ কমল।

আশ্চর্য মানুষ পাল সাহাব। মুহূর্তে সমস্ত শরীর থেকে বিকট হাসিটা মুছে ফেলল।

এবার পাল সাহাব বলল, 'আমি যাচ্ছি। লেকিন একটা কথা মনে রাখিস শালে লোক। কোন হারামী জেনানাদের ঝুপড়ির দিকে যাবি না। গেলে হাড্ডি চুরচুর করে ফেলব, জান তুড়ে দেব। এই জঙ্গল আমার দুনিয়া, এখানে দুশমনি বেয়াদপি চলবে না। খুব হোঁশিয়ার।'

মানুষগুলোকে হুঁশিয়ার করে পাল সাহাব ঝুপড়ির বাইরে এল।

চেনম্যান এবং পাটোয়ারীরা অনেক আগেই চলে গিয়েছে।

পাল সাহাব একটা মশাল ধরাল। তারপর খাড়াই টিলাটা

বেয়ে নীচের উপত্যকায় নেমে গেল। সেখান থেকে গভীর জঙ্গলের ভিতর ঢুকল।

মুহূর্তে উত্তর আন্দামানের কুয়াশা, অন্ধকার এবং অরণ্য পাল সাহাব আর তার মশালটাকে গ্রাস করে ফেলল।

পাল সাহাব নামে দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময় মানুষটাকে আর দেখা গেল না।

ছয়

নিবিড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তুলতে তুলতে চলেছে পাল সাহাব।

মশালটা গাঢ় কুয়াশাকে ঠেলে এতটুকু পিছু হটাতে পারছে না। চারপাশের কুয়াশা আর অন্ধকার তার টুটি টিপে ধরছে।

ছেঁড়া ছেঁড়া কুয়াশা আর মশালের আলো একাকার হয়ে এই দ্বীপের জটিল অরণ্যে কেমন যেন বিভ্রম সৃষ্টি করেছে।

মশাল থেকে যেটুকু আলো পাওয়া যাচ্ছে, আন্দামানের অরণ্যে পথ চলার পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয়। কুয়াশার দাপটে মশালটা এমনিতেই নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। একটা বেতঝোপের মধ্যে গুঁজে সেটা নিবিয়ে ফেলল পাল সাহাব।

এবার একটানা নিশ্ছেদ অন্ধকার, নিবিড় অরণ্য আর নিরেট কুয়াশা।

রাত্রির অন্ধকারে পাল সাহাবের চোখজোড়া যেন জ্বলতে থাকে।

কুয়াশা, অন্ধকার এবং অরণ্য ভেদ করে এগিয়ে চলেছে পাল সাহাব। হাতে একটা বর্মী দা বাগিয়ে ধরা। কাঁটা, বেত এবং ডালপালার খোঁচা লাগলেই কেটে কেটে পথ বানিয়ে নিচ্ছে।

বিচিত্র মানুষ পাল সাহাব। রাত্রির এই অন্ধকার, এই কুয়াশা, এই অরণ্যের মতই সে দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময়।

জঙ্গল ফুঁড়ে চলতে চলতে হঠাৎ বড় ভাল লেগে গেল পাল সাহাবের।

প্যাডক গাছের পাতা থেকে মাথার উপর থোকায় থোকায় জোঁক পড়ছে। বাড়িয়া পোকা সমানে কামড়াচ্ছে। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। এই নিস্তব্ধ রাত্রির অরণ্য পাল সাহাবকে যেন জাদু করেছে। মোহগ্রস্তের মত অন্ধ গতিতে সে এগিয়ে চলেছে।

উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপে আজ নতুন মানুষ এসেছে। পাল সাহাব ভাবছিল। একদিন সে-ও এসেছিল এই দ্বীপে। ঠিক এই দ্বীপে নয়, সে এসেছিল দক্ষিণ আন্দামানে।

কতকাল আগে এই দ্বীপে এসেছিল, আজ আর মনে করতে পারে না পাল সাহাব। বিশ বছর হতে পারে, পঁচিশ বছরও হতে পারে। কত বছর যে আন্দামানের জঙ্গলে কাটাচ্ছে, তার হিসাবই বা কে রাখে?

জমির ব্যাপারে দাঙ্গা এবং খুনের অপরাধে পনের বছরের দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে আন্দামান এসেছিল পাল সাহাব। সেলুলার জেলে দু মাস বিশ দিন মেয়াদ খেটে আন্দামান রিলিজ নিয়ে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজে আসে।

বিশ, পঁচিশ কি তিরিশ বছর আগের অতীতের প্রায় পুরাটাই স্মৃতি থেকে হারিয়ে গিয়েছে পাল সাহাবের। অতীত জীবনটাকে আদপেই সে স্মরণ করতে পারে না। সে জন্য তার বিশেষ মাথা-ব্যথাও নেই।

মুলুক তার কোথায়, বাঙলা না মালাবার, আসাম না বেলুচ—সঠিক মনে নেই। শুধু ধূ-ধূ একটু মনে পড়ে, কোথায় যেন জাম গাছের ছায়ায় ছায়ায় শান্ত একটি গাঁও ছিল। মাটির দেওয়াল আর খড়ের চালের একটি ছোট্ট ঘর ছিল। তক তকে করে নিকানো আঙিনায় বাতাবী গাছের দীঘল ছায়া পড়ত। কোথা থেকে লেবু

ফুলের মদির গন্ধ ভেসে আসত। মাটির দেওয়ালে সিঁদুর দিয়ে কি যেন আঁকা ছিল। সেই আঁকা চিত্রটির নাম যে কি—এক এক সময় অনেক ভেবেও মনে করতে পারে না পাল সাহাব। আঙিনায় মল বাজিয়ে বাজিয়ে কে এক কোমলমুখী বউ ঘুরে বেড়াত। বাতাবী গাছের ছায়ায় নাদুস নুদুস একটি অবোধ অবুঝ শিশু খিলখিলিয়ে হেসে উঠত।

দুপুরের রোদে খড়ের চালটা কাঁচা সোনার মত জ্বলত। কোথায় যেন ঘুঘু ডাকত। ঠিক সেই সময় কে এক কৃষাণ সর্বাঙ্গে মাটি মেখে কাঁধে লাঙল ফেলে ফিরে আসত। সেই ঝকঝকে আঙিনা, ঘুঘুর ডাক, বাতাবী গাছের ছায়া মোহ ধরাত। কোমলমুখী বউ তখন নাদুস-নুদুস ছেলে কোলে নিয়ে বসেছে। শিশুটি তার অমৃত-ভরাট বুকে সান্ত্বনার উৎসে মুখ ডুবিয়েছে। দেখে দেখে আশ আর মিটত না। মুগ্ধ চোখে পলক পড়ত না সেই কৃষাণের।

পঁচিশ তিরিশ বছর আগের সেই জীবনটার খেই একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে পাল সাহাব। টুকরা টুকরা অস্পষ্ট কতকগুলি ছবি স্বপ্নের মত মনে পড়ে।

আচ্ছন্ন চেতনার গভীর থেকে মাঝে মাঝে এখনও সেই মল-বাজানো বউ, বাতাবী গাছের ছায়ায় সেই ছেলে, দুপুরের সেই খা খা রোদ, ঘুঘুর ডাক, সেই মুগ্ধ কৃষাণের ছবি ভেসে ওঠে। কোথায়, কতদূরে তাদের ফেলে এসেছে, ঠিক করে উঠতে পারে না পাল সাহাব। কোনদিন আদৌ তারা সত্য ছিল কি না, কে তাকে সে হদিস দেবে ?

আন্দামান আসার পর সেই বউ আর সেই ছেলের কাছে ফিরে যাবার জন্য প্রথম প্রথম উন্মাদ হয়ে উঠত পাল সাহাব। খেত না, ঘুমাত না, কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলত না। উপসাগরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দিনরাত কি যে ভাবত, সে-ই জানে। সাঁতরে দেশে ফেরার জন্য দু দু-বার সে বঙ্গোপসাগরে ঝাঁপ দিয়েছে।

দু-বারই সেলুলার জেলের পেটি অফিসার আর টিণ্ডালরা তাকে সমুদ্র থেকে তুলে এনেছে।

একদিন ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের কাজে পাল সাহাবকে জঙ্গলে চালান দেওয়া হল। তারপর আন্দামানের জঙ্গলে জঙ্গলে কত বছর যে কেটে গেল, আজ আর পাল সাহাব হিসাব করে বলতে পারবে না।

ইয়ার-দোস্তরা আগে আগে জিজ্ঞাসা করত, 'পাল সাহাব, তোমার সাজার মেয়াদ তো ফুরিয়েছে। এবার মুলুকে ফিরবে না ?'

পাল সাহাব মুখে কিছু বলত না। মাথা ঝাঁকিয়ে জানাত, সে যাবে না।

ইয়ার-দোস্তরা বলত, 'গাঁও-মুলুকে জরু-বেটা কেউ নেই ?'

পাল সাহাব এবারও জবাব দিত না। ঝকঝকে আঙিনায় একটি কোমলমুখী বউ আর একটি অবুঝ অবোধ শিশুর ছবি চোখের উপর ভেসে উঠত।

মনটা উদাস হয়ে যেত পাল সাহাবের।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপপুঞ্জ যেন জাদু করেছে পাল সাহাবকে। এর অরণ্যের মধ্যে, এর উপসাগর-উপকূল-পাহাড় এবং সমুদ্রের মধ্যে মিশে গিয়েছে সে। আন্দামানের সত্তার সঙ্গে তার সত্তা একাকার হয়ে গিয়েছে। এখান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে পাল সাহাব।

না, কোনদিনই এই দ্বীপ ছেড়ে কোথাও সে যেতে পারবে না। সেই বউ আর শিশুর টানেও না।

পাল সাহাব যাবেই বা কোথায় ? পঁচিশ তিরিশটা বছর আন্দামানের এই দ্বীপে দ্বীপেই তার কাটল। পঁচিশ তিরিশ বছরে সেই মল-বাজানো বউ, সেই শিশু, সেই ঝকঝকে আঙিনার ঠিকানা পৃথিবী থেকে একেবারেই মুছে গিয়েছে কি না, সে খবর পাল সাহাব জানে না।

এই দ্বীপের বাইরে কোথাও যেতে চায় না পাল সাহাব। যাবার মত কোন ঠিকানাই তার নেই। এখানে আসার আগে তার একটা অতীত ছিল, পৃথিবীর বুকে তার একটা ঠিকানাও ছিল। এতদিন সেই ঠিকানা এবং অতীত—তুই-ই খুইয়ে বসেছে পাল সাহাব।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপগুলির বাইরে যে বিপুল, তুজ্ঞের্য় পৃথিবীটা পড়ে রয়েছে, তার সম্বন্ধে পাল সাহাবের মনে অদ্ভুত এক সংশয় আছে, সন্দেহ এবং আতঙ্কে মেশা বিচিত্র এক অনুভূতি আছে। মনে মনে সেই পৃথিবীটা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণাও খাড়া করতে পারে না পাল সাহাব। সেই পৃথিবীটা কেমন, তার স্বরূপ কি, যখনই সে সম্বন্ধে কিছু ভাবতে বসে, থই আর মেলে না। ভাবতে ভাবতে মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। এক সময় ভাবনাটা ছেড়েই দেয় সে।

না, কোনদিন এই দ্বীপ ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না পাল সাহাব।

আজকাল সেই কোমলমুখী বউ আর সেই গোলগাল অবোধ শিশুটির কথা ঠিকমত মনেও পড়ে না। যদিই বা পড়ে, মনটা একটু উদাস হয় মাত্র। তাদের কোথায়, কত পিছনে যে ফেলে এসেছে পাল সাহাব!

এখানে আসার আগে কি এক ভাষায় যেন কথা বলত পাল সাহাব। সে ভাষাটা ভুলেছে। তার বদলে আজকাল হিন্দী এবং উর্দু মেশানো বিচিত্র আন্দামানী বুলি শিখেছে।

এই দ্বীপপুঞ্জ একটু একটু করে এই পঁচিশ তিরিশ বছরে পাল সাহাবকে গ্রাস করে ফেলেছে।

সেলুলার জেল থেকে 'আন্দামান রিলিজ' পাওয়ার পর ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ পেয়েছিল পাল সাহাব। প্রথমে ছিল কুলী,

তারপর হয়েছে জবাবদার। শেষ পর্যন্ত 'পারমোশ' (প্রমোশন) পেয়ে হয়েছিল ফরেস্ট গার্ড।

ইদানীং কয়েক বছর ধরে পূর্ব বাঙলার উদ্বাস্তু এবং মালাবার থেকে মোপালা কৃষাণীরা সেটেলমেন্টের জন্য বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপগুলোতে আসতে শুরু করেছে। অরণ্য সংহার করে দক্ষিণ, মধ্য ও উত্তর আন্দামানে, হ্যাভলক দ্বীপে উপনিবেশ বানাবার কাজ চলেছে। উদ্বাস্তু উপনিবেশ, সরকারী পরিভাষায় যার নাম 'রিফুজী সেটেলমেন্ট'।

আন্দামানের অরণ্যময়, বর্বর দ্বীপগুলিতে জীবনের উৎসব শুরু হয়েছে।

হঠাৎ কি খেয়াল হল পাল সাহাবের, ফরেস্টের কাজ ছেড়ে সেটেলমেন্টের কাজ ধরল। এখন সে কলোনাইজেসন এ্যাসিস্টাণ্ট। সংক্ষেপে সি. এ.। পাল সাহাব।

অন্ধকার আর কুয়াশা ঠেলে, বর্মী দায়ের ফলায় পথ কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে পাল সাহাব। উত্তর আন্দামানের এই অরণ্যের অন্ধিসন্ধি, কোথায় কোন ঝোপ, কোথায় প্যাডক গাছের জটলা, কোথায় দিদু আর পেমা গাছগুলি খাড়া খাড়া মাথা আকাশের দিকে তুলেছে—সমস্ত কিছু পাল সাহাবের মুখস্থ। চোখ বুঁজে সে এই অরণ্যের মধ্য দিয়ে চলতে পারে।

চলতে চলতে একসময় পথ ফুরাল। হাওয়াই বুটির জঙ্গলে-ভরা ছোট্ট একটা টিলায় এসে পড়ল পাল সাহাব।

পাল সাহাব চেঁচিয়ে ডাকল, 'মা-তিন, এ মা-তিন—'

কোন জবাব মিলল না।

পাল সাহাব বিড় বিড় করে বলল, 'শালীর সন্ধ্যে হলেই নিদ! নিদ আর নিদ! নিদ আজ ঘোচাচ্ছি!'

এবার আগের চেয়ে আর এক পর্দা গলা চড়াল পাল সাহাব, 'এ শালী মা-তিন, জলদি ওঠ।'

'হাঁ—কোন রে?'

ঘুম-জড়ানো ভাঙা ভাঙা স্বরে মা-তিন চিল্লায়।

পাল সাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'আমি রে শালী, তোর বাপ! হারামীর বাচ্চার খালি নিদ আর নিদ। জলদি বাতি জ্বাল।'

ও পক্ষও নিশ্চুপ হয়ে রইল না।

হিংস্র গলায় মা তিন বলল, 'গালি দিবি না শালে। জান তুড়ে দেব। তুই কতবড় বাপ হয়েছিস, একবার দেখব। কুত্তার বাচ্চা কাঁহাকা।'

গভীর রাত্রিতে যখন বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপ কুয়াশা এবং অন্ধকারের নীচে একেবারেই হারিয়ে গিয়েছে, তখন পাল সাহাব আর মা-তিনের মধ্যে খানিকটা অশ্লীল, অকথ্য গালি গালাজের আদান প্রদান হয়ে গেল।

একটু পর কুয়াশা ফুঁড়ে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা দিল। আলোটা পাল সাহাবের দিকে এগিয়ে আসছে।

আবছা ছেঁড়া ছেঁড়া আলোতে বোঝা যায়, ছোট্ট টিলার মাথায় হাওয়াই বুটির জঙ্গল উদ্দাম হয়ে রয়েছে। ওপাশের উতরাইর দিকটা প্রকৃতির অদ্ভুত খামখেয়ালিতে ন্যাড়া হয়ে আছে। সেখানে একটা ঘাসও জন্মায় নি।

ন্যাড়া উতরাইতে পাল সাহাবের ঝুপড়ি। কুয়াশায় আর অন্ধকারে একটা স্তূপের মত দেখায়।

আলোটা সামনে এসে পড়লো। দেখা গেল, লণ্ঠন জ্বালিয়ে মা-তিন এসেছে।

হাওয়াই বুটির জঙ্গলের এপাশে বিরাট এক খাদ। রোজই এই খাদটা পর্যন্ত এসে মা-তিনকে ডাকে পাল সাহাব। অন্ধকারে খাদে নামতে ভয় হয়।

সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে ওপারে চলে গেল পাল সাহাব।

পাল সাহাব তখনও বিড় বিড় করে বকছে, 'খিলাফৎ ঠিকই বলেছিল, 'বর্মী মাগীগুলো বহুত খারাবী।'

মা-তিন পাল সাহাবের কথাগুলো ঠিক ঠিক শুনে ফেলেছে। এবার সে গর্জে উঠল, 'বর্মী মাগীগুলো বহুত খারাবী! তুশমন কাঁহাকা, এত বরষ ঘর করে এখন বেইমানির কথা বলছিস!'

মা-তিনের চাপা চাপা কুতকুতে চোখ থেকে আগুন ঠিকরাচ্ছে। চোয়াল তুটো কঠিন হয়ে উঠেছে। ক্রুদ্ধ বুকটা দ্রুততালে ওঠানামা করছে। ফোঁস ফোঁস শব্দে গরম নিশ্বাস পড়ছে। সেই ভয়ঙ্কর মূর্তির দিকে তাকিয়ে পাল সাহাবের মুখে আর কথা জোগাল না।

হাওয়াই বুটির জঙ্গল পিছনে ফেলে ঝুপড়ির সামনে এসে পড়ল তু জনে। বাঁশের ঝাঁপ খুলে প্রথমে মা-তিনই ভিতরে ঢুকল। পিছে পিছে পাল সাহাবও ঢুকল।

বাঁশের পাটাতনের নীচে এক পাল শুয়োর দলা পাকিয়ে রয়েছে। মানুষের সাড়া পেয়ে ঘোঁত্ ঘোঁত্ করে উঠল। মাচানের তলা থেকে একপাল কুকুর আহ্লাদে কেঁউ কেঁউ করে ডাকল। কুকুর এবং শুয়োরের গা থেকে তুর্গন্ধ ছুটছে। জান্তব গন্ধে ঝুপড়ির বাতাস ভারী হয়ে রয়েছে।

শুধু কি কুকুর আর শুয়োরের গন্ধ, নাপ্পির গন্ধ, শুটকি মাছের গন্ধ, আধসিদ্ধ গো-সাপের চামড়ার গন্ধ, নোংরা চটচটে বিছানা থেকে ভ্যাপসা, পচা তুর্গন্ধ—সব মিলিয়ে একটা মিশ্রিত উগ্র গন্ধ এই টিলার অন্ধকার, কুয়াশা এবং বাতাসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলোতে দেখা যায়, ঝুপড়ির ভিতর তিনটে বাঁশের মাচান। তুপাশে শোবার জন্য তুটো নীচু মাচান। মধ্যখানে খাবার জন্য যে মাচানটা তোলা হয়েছে, সেটা অনেক উঁচু। আস্ত আস্ত বাঁশের দেওয়ালে বর্মী দা এবং কালি ঝুলি ঝুলছে। বোচকা-

বুচকি-গাঁটরি, ভাঙা ভাঙা জঙ-পড়া দুচারটে টিনের পেঁটরা ঝুপড়ির কোণায় কোণায় স্তূপাকার হয়ে রয়েছে।

কাঠের বর্তনে ভাত, নাপ্পি আর শুটকি মাছের সুরুয়া দিয়ে পাল সাহাবের দিকে ঠেলে দিল মা-তিন। নিজেও একটা বর্তন টেনে নিল।

পাল সাহাব বলল, 'আজ তারা এসে পড়ল।'

মা-তিন কিছুই বলল না। শুটকি মাছের সুরুয়া দিয়ে ভাত মেখে বড় বড় গরাস তুলতে লাগল মুখে।

ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে পাল সাহাব বলল, 'এখানে কলোনি হবে, কুঠিবাড়ি উঠবে, জঙ্গল সাফ হয়ে ক্ষেতিবাড়ি হবে।'

মা-তিন পাল সাহাবের দিকে তাকায় না। তার মুখেচোখে এতটুকু কৌতূহল পর্যন্ত ফোটে না। নিজের মনে গরাসের পর গরাস মুখে পোরে মা-তিন।

পাল সাহাব আপন খেয়ালেই বলে যায়, 'খুব ভাল হবে। এই দ্বীপে যত মানুষ আসে ততই ভাল।'

বলতে বলতে মুখ তোলে পাল সাহাব। দেখে তার দিকে কোন লক্ষ্যই নেই মা-তিনের। কিছুক্ষণ মা-তিনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে কি যেন বুঝতে চেষ্টা করে পাল সাহাব। তারপর নরম স্বরে ডাকে, 'এ মা-তিন, এ শালী—'

'হাঁ—'

'শালী, গোসা হয়েছিস ?'

ঘাড় গুঁজে বর্তনটার উপর ঝুঁকে পড়ে মা-তিন। সমানে ফুঁসতেই থাকে সে।

এবার এক কাণ্ডই করে বসে পাল সাহাব। কাঠের বর্তনটা এক পাশে ঠেলে সরিয়ে উঠে আসে। এঁটো হাতেই মা-তিনকে জাপটে ধরে। তার সুরুয়া লেপটানো মুখে এক দমে গোটা বিশেক চুমু খায়।

সমানে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে মা-তিন। আঁচড়ে কামড়ে পাল সাহাবকে ফালা ফালা করে ফেলে। নাক মুখের চামড়া ছিঁড়ে তাজা রক্তের ফিনকি ছোটে।

মা-তিন বলে, 'ছোড় শালে, আমাকে ছেড়ে দে কুত্তা—'

রক্তাক্ত বীভৎস মুখে খ্যা খ্যা করে হাসে পাল সাহাব। বলে, 'আগে বল, তোর গোসা টুটেছে। তবে ছাড়ব।'

'না না—'

'তবে তোকে ছাড়বও না।'

পাল সাহাব দু হাতে মা-তিনের মাংসল, নরম শরীরটা বুকের উপর জাপটে ধরে ডলতে থাকে, ছানতে থাকে। তার ডলায়, পেষণে এবং জাপটানিতে মনে হয়, হাড্ডিগুলো ভেঙে, গুঁড়িয়ে মা-তিন একটা পিণ্ড পাকিয়ে যাবে।

পাটাতনের তলা থেকে শুয়োরের পাল এবং মাচানের তলা থেকে কুকুরের পাল মা-তিন আর পাল সাহাবের কাণ্ড দেখে। দেখে দেখে শব্দ করতে পর্যন্ত ভুলে যায় তারা।

ডলায় আর পেষণে হাড্ডিগুলো কিন্তু গুঁড়োয় না মা-তিনের; অটুট অক্ষতই থাকে। এমন ডলা খাবার অভ্যাস আছে মা-তিনের।

'ছাড়—ছাড়—ছাড়—'

মা-তিন সমানে চিল্লায়। দাপাদাপি করে। হঠাৎ পায়ের গুঁতো লেগে মাচানের উপর থেকে লণ্ঠনটা নীচে পড়ে নিবে যায়। মুহূর্তে বাইরের কুয়াশা আর অন্ধকার ছুটে এসে ঘরটাকে ভরে ফেলে।

পাঁজাকোলে করে মা-তিনকে বুকের উপর তুলে উন্মাদভাবে সোহাগ জানায় পাল সাহাব।

বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের সমস্ত কিছুই সৃষ্টিছাড়া। তুমি আমি কি আর দশটা ভদ্রসন্তানের জগতে যে নিয়মে প্রণয়ের

প্রকাশ ঘটে, এখানে সে নিয়ম খাটে না। প্রণয় এখানে হৃদয়ের সূক্ষ্ম পথ ধরে চলে না। কামান্ধ দেহের স্থূল উপভোগের পথেই তার একমাত্র প্রকাশ।

মাচানের বিছানা থেকে ভ্যাপসা দুর্গন্ধ উঠছে। বাঁশের দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে সাদা, গাঢ় ধোঁয়ার মত হিমাক্ত কুয়াশা ঢুকছে।

মাচানে শুয়ে শুয়ে মা-তিন আর পাল সাহাবের মধ্যে সন্ধি হয়ে যায়।

সাত

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে প্রথম রাত্রিটা পার হয়ে গেল।

কাল রাত্রে পাল সাহাব ভয় ধরিয়ে গিয়েছিল, সাপ, জোঁক আর কানখাজুরারা যদি মেহেরবানি করে মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখে, তবে আজ দেখা হবে।

মানুষগুলো সত্যিই বেঁচে আছে। কিং কোব্রা আর কানখাজুরার পাল তাদের কাছে ঘেঁষে নি। তাদের বাঁচিয়ে রেখে এই দ্বীপ কোন গূঢ় মতলব হাসিল করতে চায়, কে বলবে ?

দ্বীপের মনে কি আছে কে জানে ?

এখন সকাল।

সারা রাত এই দ্বীপের উপর স্তরে স্তরে কুয়াশা পড়েছে। সেই গাঢ়, স্থাবর কুয়াশার নীচে পাহাড়, অরণ্য—সমস্ত কিছু এখনও অবলুপ্ত।

কুয়াশা ভেদ করে সোনার তারের মত হু চারটে রোদের রেখা এসে পড়েছে টিলার মাথায়।

মানুষগুলো ঝুপড়ির বাইরে এসে বসেছে।

কাল মনে হয়েছিল, এক একটা মানুষ রক্ত মাংসের জড় স্তূপ ছাড়া কিছু নয়। তাদের ভিন্ন ভিন্ন কোন সত্তা নেই। অস্তিত্ব নেই। এমন কি নিজেদের কোন ইচ্ছা পর্যন্ত নেই। অন্যের ইচ্ছায় কি তাড়নায় তারা নড়ে চড়ে, চলে ফেরে।

কাল বিকালেও মানুষগুলো একসঙ্গে দলা পাকিয়ে ছিল।

কিন্তু বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে পুরা একটা রাত্রি কাটিয়ে কালকের সংশয়, জড়তা এবং ভয় তারা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে। বোঝা যাচ্ছে, তাদের ভিন্ন ভিন্ন সত্তা আছে, অস্তিত্ব আছে।

কালকের সেই মৃত মুখ, বিষণ্ণ মানুষগুলো এখন এই দ্বীপের স্বরূপটা বুঝবার চেষ্টা করছে।

বুড়ী বাসিনী বলল, 'এতবড় সমুদ্দর (সমুদ্র) পাড়ি দিলাম, পাঁচ-পাঁচটা দিন পারকুল দেখি নাই। ডরে বুকের লৌ (রক্ত) জমে গেছিল।'

একটু থামে বাসিনী। কাপড়ের একটা গিঁট খুলে কাঁচা তামাক-পাতা বার করে মুখে পোরে। তারপর বলে, 'পারকূল যখন পাইছি, মাটি যখন মিলছে, তখন আমরা বাঁচুম।'

ঝুপড়ির সামনে এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ছিল মানুষগুলো। স্তরে স্তরে কুয়াশা ভেদ করে সকালের প্রথম রোদ এসে পড়েছে ন্যাড়া টিলাটার মাথায়। রোদের তাপে সকলে হাত-পা সেঁকছিল।

মানুষগুলো উঠে এসে বুড়ী বাসিনীকে ঘিরে বসল।

বাসিনী আবার বলল, 'আমরা বাঁচুম, নিচ্চয় বাঁচুম।'

বুড়ো রসিক শীল বলল, 'আমরা যে বাঁচুম, কি করে বুঝলা?'

'আমার মন বলে, আমরা আবার বাঁচুম।'

পাটের ফেঁসোর মত এক মাথা রুক্ষ চুল। শরীরের চামড়া ঢিলা হয়ে গিয়েছে। মুখের চামড়া কুঁচকে অসংখ্য আঁকিবুকি ফুটে উঠেছে। সমস্ত মুখটা জুড়ে কত যে দাগ, তার লেখাজোখা নেই। খাটো খাটো করে ছাঁটা চুল। গলায় এক লহর রুদ্রাক্ষের মালা। চোখে মাছের আঁশের মত পুরু ছানি পড়েছে। এই হল বুড়ী বাসিনী।

টিলাটার নীচ থেকে স্তরে স্তরে কুয়াশা খাড়া উঠে গিয়ে দিগন্ত রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

বাসিনী মুখ তুলল। ছানিভরা চোখের বিবর্ণ, ঘোলাটে দৃষ্টি কুয়াশার ওপারে পাঠিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'এততেও যখন মরি নাই, ভগমান তার সাধ মিটিয়ে মারত্তে পারে নাই, তখন বাঁচুম, নিচ্চয় বাঁচুম! তোরা দেখিস—'

বুড়ী বাসিনীর গলায় অটুট বিশ্বাসের সুর ফোটে। কুয়াশার স্তরের ওপারে কোন দুজ্ঞেয় জগৎ থেকে সে এই বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছে, কে বলবে ?

নিত্য ঢালী দুই হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে এক কিনারে বসে ছিল। এবার সে মাথা তোলে। নিরাশ, বিমর্ষ গলায় সে বলে, 'না, কোন আশাই নাই।'

বলতে বলতে প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকায় নিত্য ঢালী।

বুড়ী বাসিনী বলল, 'কিসের আশা নাই ?'

'পরানে বাঁচার।'

টেনে টেনে শ্বাস নেয় নিত্য ঢালী। শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার বলে, 'কোথায় সাত পুরুষের ভিটামাটি পড়ে রইল ; আর সগল খুইয়ে কোথায় মরতে আসলাম। না না খুড়ী (কাকী), মিছাই তুমি আশার কথা শুনাও, বাঁচার কথা শুনাও।'

নিত্য ঢালী একেবারেই ভেঙে পড়েছে। তার মধ্য থেকে বাঁচার প্রবল আকাঙ্ক্ষাটা পর্যন্ত লোপ পেয়েছে।

রসিক শীলও সায় দেয়, 'পাঁচদিন সমুদ্দর পাড়ি দিয়া আন্ধারমান (আন্দামানে) এসেছি। কপালের লিখন কি খণ্ডান যায়, খুড়ী! ভগমানের ইচ্ছা, এই দ্বীপিই (দ্বীপেই) আমরা মরি।'

বুড়ী বাসিনী সস্নেহে বলে, 'মরে তো আছিই রসিক, তাই বলে বাঁচার শ্যাষ চেষ্টাটা করুম না ? পরানটা বাঁচানের লেগে কি না করেছি আমরা! পিছের দিনগুলার কথা একবার ভেবে ত্যাখ দেখি!'

রসিক শীল কিছু বলে না। ডাইনে-বাঁয়ে খালি মাথা ঝাঁকায়। মাথার ঝাঁকানিতে কি যে সে বোঝাতে চায়, সঠিক বোঝা যায় না।

বাসিনী আবার বলে, 'তোরা পুরুষ মানুষ ; এমুন করে ভেঙে পড়িস না।'

রসিক শীল বলল, 'ভেঙে কি সাধে পড়ি খুড়ী। কাল বিকালে জাহাজ থিকে এই দ্বীপি নেমেছি। কোথায় নেমেছি, জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাল সাহাবের পিছে পিছে কোথায় এসে পড়েছি, ভেবে ভেবে কূল পাই না! মানুষ নাই, জন নাই, আত্মবান্ধব নাই। যেদিকে চোখ মেলবা, খালি জঙ্গল আর জঙ্গল। দেখে মনে লাগে, কোন কালে এই দ্বীপি মানুষ আসে নাই।'

দম নিয়ে আবার শুরু করে, 'জঙ্গলের দিকে একবার চাইয়া দেখেছ, খুড়ী, বুকখান থর থরাইয়া কাঁপে। জঙ্গল দেখলে বাঁচনের সাধখান আর থাকে না। হা ভগমান, সমুদ্দর পাড়ি দিয়া এই কোনখানে আনলা? কপালে কি যে লিখেছ, তুমিই জান!'

চারপাশের মানুষগুলো নির্জীব স্বরে বলে, 'ঠিক কথা।'

বুড়ী বাসিনীর ঘোলা ঘোলা বিবর্ণ চোখ দুটো দু টুকরা পোড়া অঙ্গারের মত জ্বলতে থাকে। সে ক্ষেপে ওঠে, 'মুখে খালি মরণের কথা! ক্যান—বাঁচনের কথা মুখে আসে না? তোরা মানুষ না আর কি?'

অতি দুঃখে হাসে মানুষগুলো।

রসিক শীল বলে, 'খুড়ী, মানুষ এককালে ঠিকই ছিলাম। কিন্তুক এই জীবনটার উপর দিয়া কয়টা বছর যা গেল, তাতে কেউ আর মানুষ নাই।'

অনেকক্ষণ কেউ আর কিছু বলে না। বাসিনীকে ঘিরে ঝিম মেরে বসে থাকে মানুষগুলো।

হঠাৎ কে যেন বলে ওঠে, 'পাল সাহাব কাইল রাতে বলে গেছিল আজ সকালে আসবে। কই অখনও তো এল না!'

মানুষগুলো চকিত হয়ে উঠল, 'ঠিকই তো।'

'তবে কি পাল সাহাব আর আসবে না!'

রসিক শীল বলল, 'এই নিঃঝাম জঙ্গলে আমাগোর (আমাদের)

দ্বীপান্তরি দিয়াই বুঝি গেল পাল সাহাব। এইখানেই আমরা মরুম।'

রসিক শীলের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলো দলা পাকিয়ে গেল। বউ-বাচ্চা, শিশু-বুড়া-যুবা—যারা ঝুপড়ির ভিতর ছিল, ছুটে এসে মানুষের পিণ্ডটার মধ্যে একাকার হয়ে মিশে গেল।

তারপরেই কান্নার রোল উঠল।

এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অন্তরাত্মাকে চমকে দিয়ে অনেকগুলো মৃত-মুখ, বিষণ্ণ মানুষ ভয়ে আতঙ্কে শোর তুলে কাঁদছে। বুঝি বা এই ভীষণ অরণ্যে মৃত্যুর স্বরূপটা কিছু বুঝে, বাকীটা না বুঝে জীবনের জন্য শেষবারের মত তারা কেঁদে নিচ্ছে।

পরস্পরের গলা জড়িয়ে মানুষগুলো ডুকরে ডুকরে ডাক ছেড়ে কাঁদছে। হাউ হাউ করে জীবনের অন্তিম কান্না কাঁদছে।

এমন যে বুড়ী বাসিনী, বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের এই গভীর অরণ্যে যে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়, হঠাৎ ভয় পেয়ে সে-ও কাঁদতে শুরু করেছে।

সবাই কাঁদে, কিন্তু একজন কাঁদে না। সে কাপাসী। অনেক দূরে বসে কান পেতে এতগুলি মানুষের কান্নার বিচিত্র ধ্বনি শুনতে থাকে। শুনতে শুনতে আপন মনেই হাসে। আশ্চর্য! সে হাসিতে শব্দ নেই।

কাঁদতে কাঁদতে এক সময় কান্নার উদ্যম ফুরিয়ে গেল। জড়াজড়ি করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল মানুষগুলো।

ন্যাড়া টিলাটার মাথায় সারি সারি মুখ দেখা যায়। মৃত, ভয়াতুর, পাণ্ডুর কতকগুলি মুখ।

কুয়াশার স্তরগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। রোদের তেজ বাড়ছে। প্রথমে কুয়াশা ফুঁড়ে সোনার তারের মত রোদ আসছিল। এখন ঢল নেমেছে। প্রখর রোদে টিলার মাথাটা ভরে গিয়েছে।

এবার পরিষ্কার দেখা যায়, ন্যাড়া টিলাটাকে ঘিরে উত্তর আন্দামানের অরণ্য জটিল, কুটিল এবং ভয়ঙ্কর হয়ে রয়েছে।

দিহু, টমকিণ্ড, পেমা আর গর্জন গাছগুলি আকাশের দিকে খাড়া খাড়া মাথা তুলেছে। বেতের মোটা মোটা লতা, মুটিয়া লতা, থুমিয়া লতা—হাজার জাতের কাঁটালতা বিরাট বিরাট গাছগুলিকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। গহীন, গভীর, নিরালোক অরণ্য। সে অরণ্যে দৃষ্টি চলে না, সে অরণ্য ফুঁড়ে পৃথিবীর আলো ঢোকে না। সেখানে সরীসৃপের চোখে জ্বলন্ত ফসফরাস ছাড়া আর কোন আলো নেই।

এই অরণ্য দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য, দুঃসহ।

এই স্থবির দ্বীপের বয়স যে কত, কে হদিস দেবে? আন্দামানের পাথুরে মাটি চৌচির করে কবে যে এই অরণ্য প্রথম মাথা তুলেছিল, ইতিহাসে কি পুথি পুরাণে তারও কোন নজীর নেই। তবে এটুকু বেশ স্পষ্ট, হাজার হাজার বছর ধরে এই অরণ্য তার সংসার বাড়িয়েছে।

অরণ্যের মাথায় মাথায় মরশুমে মরশুমে ফুল ফোটে। ফুল থেকে ফল। ফল থেকে বীজ। সেই বীজের মধ্যেই থাকে নতুন অরণ্যের সম্ভাবনা। সেই বীজ থেকেই ক্রমে ক্রমে অরণ্য এই দ্বীপের উপর তার দখল কায়েম করে বসেছে।

অরণ্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বাঁচার ক্ষীণ আশাটাও নিবে আসতে থাকে।

ন্যাড়া টিলাটার নীচে যে কি আছে, মানুষগুলো কিছুই জানে না। টিলা থেকে নেমে কেউ এক পা-ও কোনদিকে যায় নি।

হঠাৎ সামনের জঙ্গল ফুঁড়ে একটা মানুষ টিলাটার দিকে ছুটে আসে।

ভাবলেশহীন চোখে চেয়েই থাকে মানুষগুলো। জড়াজড়ি করে বসেই থাকে। এতটুকু নড়ে না পর্যন্ত।

উতরাই বেয়ে লোকটা যখন প্রায় টিলার মাথায় এসে উঠেছে, তখন ঘোলা ঘোলা চোখের উপর একটা হাত ে খ রোদ ঠেকায় বুড়ী বাসিনী। তারপর বিড় বিড় করে বলে, 'আমাগোর (আমাদের) হারাণ, না

বাসিনীর স্বরে বি ফোটে

মানুষগুলো এবার নড়ে চড়ে বসে। তাদের চোখেমুখে কৌতুহল ফুটেছে। সকলে প্রায় একই সঙ্গে বলে, 'হারাণ—তুই!'

ততক্ষণে হারাণ উপরে উঠে এসেছে। বুড়ী বাসিনীর পাশে বসে জোরে জোরে হাঁপাতে লাগল সে। এই হিম হিম সকালেও তার কপালে কণা কণা ঘাম ফুটে বেরিয়েছে।

বছর পঁচিশেক বয়স। কালো পাথরে খোদাই উজ্জ্বল, মসৃণ শরীর। ছোট ছোট, চাপা চোখের উপর ভুরু ছুটো টান টান হয়ে রয়েছে। খাড়া চোয়াল, ঈষৎ থ্যাবড়া একটি নাক। মাথার চুলগুলি ঘামে মাজা কপাল এবং গালের উপর ছড়িয়ে রয়েছে। দাড়ির রোঁয়াগুলো শক্ত এবং চোখা। এই হল হারাণ।

জঙ্গল ফুঁড়ে এইমাত্র টিলার মাথায় উঠে এসেছে হারাণ। কাঁটা আর গোঁজের খোঁচা খেয়ে চামড়া ছিঁড়েছে, কাঁধের উপর এক খাবলা মাংস উঠে গিয়েছে। সমস্ত দেহ বেয়ে তাজা গাঢ় রক্ত ঝরছে। কোন খেয়াল নেই; ভ্রূক্ষেপ নেই। ছু পাটি সাদা ঝকঝকে দাঁত মেলে হাসল হারাণ।

বুড়ী বাসিনী বলল, 'সকালে উঠে কোনখানে গেছিলি, হারাণ?'

হারাণ বলল, 'জায়গাটা এট্টু দেইখা এলাম, ঠাকুরমা।'

'একা একা জঙ্গলে গেলি, ডর ধরল না?'

সবগুলি দাঁত মেলে হি-হি করে হাসল হারাণ। কিছু বলল না।

বাসিনী বলল, 'হাসিস যে ?'

'হাসনের কথায় হাস্নুম না! তুমি তো জান ঠাকুরমা, কিছুতে আমার ডর ধরে না।' আঙুল দিয়ে নিজের নিরেট, কঠিন, বুকটা দেখিয়ে হারাণ বলে, 'ছ্যাখ, ছ্যাখ ঠাকুরমা—এই বুকখানের ভিতর কোথাও ডর নাই। ডরের ছিটাফোঁটা নাই।'

বলেই হেসে ওঠে হারাণ।

রসিক শীল একটু দূরে বসেছিল। সকলকে কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে সরিয়ে হারাণের পাশের জায়গাটা দখল করে বসল। বলল, 'জায়গাটা ঘুরে ঘুরে দেখে আসছিস, হারাণ ?'

'হু।'

'কেমুন দেখলি ?'

আগ্রহে রসিকের চোখজোড়া চক চক করে।

'বড় বাহারের জায়গা, তালুই। এই পাহাড়টার পিছে একখান খাল আছে ; খালে যা মাছ দেখলাম তালুই—'

কথাটা পুরা না করেই তালুতে জিভ ঠেকিয়ে লোভার্ত একটা শব্দ করে হারাণ। তারপর আবার শুরু করে, 'সারা জন্ম সেই মাছ খেয়ে ফুরাইতে পারবা না।'

'বলিস কি !'

'সত্য কথাই বলি।'

'আর কি দেখলি ?'

'আর কি দেখলাম, তুমিই কও দেখি তালুই ?'

'কি দেখলি, আমি কেমনে জানব ?'

হারাণ মিটি মিটি হাসে। বলে, 'চাষী কিষানের ছেলে, দেখুম আর কি ? দেখলাম মাটি। এক দলা মাটি হাতে নিয়া চাপ দিলাম! ঝুর ঝুর করে গুঁড়া হয়ে গেল। এই মাটিতে সোনা ফলবে।'

'বলিস কি ?'

'সত্যই বলি গো তালুই।'

হাতের তালুটা চিত করে সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয় হারাণ। বলে, 'দেখ—'

হারাণের হাতে এক ডেলা ভিজা মাটি।

মাটির ডেলাটা নিজের হাতে নিয়ে অল্প অল্প চাপ দেয় রসিক শীল। ডেলাটা ভেঙে গুঁড়া গুঁড়া হয়ে যায়।

এ মাটি মিহি, মসৃণ, মোলায়েম। এ মাটি আঠা আঠা, সরস।

রসিক শীল বলল, 'বড় বাহারের মাটি। ঠিকই বলেছিস হারাণ, এ মাটিতে সোনা ফলবে।'

বুড়ী বাসিনী বলল, 'পিরথিমীতে (পৃথিবীতে) মাটির মত খাঁটি বস্তু আর নাই রে। সেই মাটি একবার হারিয়েছি। মাটি হারাইয়া কয়টা বছর কত দুঃখই না পাইলাম।'

বাসিনীর বুক ভেদ করে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ধীরে ধীরে সে বলে, 'এই আন্ধারমান (আন্দামান) দ্বীপি এসে আবার মাটি মিলল। আমরা মরুম না রে, বাঁচুম। নিচ্চয় বাঁচুম।'

চারপাশে মানুষগুলো দলা পাকিয়ে বসে রয়েছে। বুড়ী বাসিনী নতুন করে তাদের বাঁচার স্বপ্ন দেখায়, 'এই মাটিই আমাগোর (আমাদের) বাঁচাবে।'

মৃতমুখ, বিষণ্ণ মানুষগুলোর চোখ চক চক করে। অনুচ্চ, ফিস ফিস স্বরে তারা বলে, 'বাঁচুম, আমরা বাঁচুম।'

বাঁচবার নেশায় মানুষগুলো বুঁদ হয়ে বসে থাকে।

একটু দূরে সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে রয়েছে কাপাসী। হাঁটুর উপর মাথাটা হেলিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি ভাবলেশহীন, নিথর। চোখের পাতা পড়ছে না। মেঘের মত রাশি রাশি কালো চুল ভেঙে মুখের উপর ছড়িয়ে রয়েছে।

হঠাৎ খিল খিল করে উত্তর আন্দামানের এই টিলাটাকে চমক দিয়ে হেসে উঠল কাপাসী। হাসির দমকে সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে।

কাপাসীর হাসি ধীরে ধীরে মেতে উঠছে।

কাপাসী হাসে আর বলে, 'বাঁচার সাধ কত শয়তানদের! কেউ বাঁচবে না; সগলে (সকলে) মরবে। মর, মর তোরা।'

আট

পুব দিকের জঙ্গল ফুঁড়ে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে পাল সাহাব এসে পড়ল।

বেলা অনেক চড়েছে। সূর্যটা আকাশ বেয়ে বেয়ে অনেকখানি উপরে উঠে এসেছে। দ্বীপের নোনা মাটি তেতে উঠতে শুরু করেছে।

এক ঝাঁক গোয়েলেথ পাখি সামনের জঙ্গল টপকে কোন দিকে যে উড়ে গেল, কে তার হদিস দেবে!

প্রথমে টিলার মাথায় উঠল পাল সাহাব। তার পিছে পিছে উঠে এল সরকারী চেইনম্যান নিবারণ সাপুই, পাটোয়ারী আতমন সিং আর জন চারেক আদিবাসী রাঁচী কুলী; ধানোয়ার, কচ্ছপ, ডুগুডুগু আর টিরকি।

টিলার মাথায় উঠেই পাল সাহাব কিছুক্ষণ খ্যা খ্যা করে হাসল। আচমকা হাসিটা থামিয়ে বলল, 'বহুত তাজ্জবের কথা!'

পাশ থেকে চেইনম্যান নিবারণ সাপুই বলল, 'কিসের তাজ্জব, পাল সাহাব?'

পাল সাহাব নিবারণের প্রশ্নের জবাব দিল না। দলা পাকানো মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে চিল্লাল, 'শালে লোগ এখনও বেঁচে আছিস!'

হারাণ বলল, 'হ পাল সাহাব, অখনও মরি নাই।'

পাল সাহাব বলল, 'সাপ, কানখাজুরা আর জোঁক যখন তোদের সাবাড় করতে পারে নি, তখন শালেরা বাঁচবি। জানের জোর আছে তোদের।'

হারাণ বলল, 'ঠিকই বলেছেন পাল সাহাব; আমাগোর (আমাদের) জানের জোর আছে। তা না হইলে এত কষ্ট সয়েও তো মরি নাই। বুকের মধ্যে বাঁচনের সাধটা অখনও তাজা আছে।'

পাল সাহাব বলল, 'বহুত আচ্ছা।'

অনেকক্ষণ কেউ আর কিছু বলল না।

তেজী রোদে অরণ্যের মাথা জ্বলছে। নীল আকাশটা জ্বলছে। কোথা থেকে যেন দু-চার টুকরা মৌসুমী মেঘ বাতাসের তাড়া খেয়ে ভাসতে ভাসতে উত্তর আন্দামানের এই আকাশে এসে পড়েছে। মেঘের টুকরাগুলি জ্বলছে।

আত্মবিস্মৃত হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল পাল সাহাব। কি ভাবছিল, সে-ই জানে। হঠাৎ মুখটা ঘুরিয়ে গাঢ়, অদ্ভুত স্বরে বলল, 'পারবি, তোরা পারবি ? এই শালে লোগ ?'

'কী পারুম পাল সাহাব ?'

অবাক হয়ে পাল সাহাবের মুখের দিকে তাকায় মানুষগুলো।

'আন্দামানের এই জঙ্গল সাফ করে গাঁও বসাতে ? ক্ষেতিবাড়ি বানাতে, কুঠিবাড়ি তুলতে ? পারবি ?'

বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল পাল সাহাব। অরণ্যের মাথায় উত্তর আন্দামানের নীল আকাশ। আকাশের ওপারে দৃষ্টিটাকে হারিয়ে ফেলল সে। এই মুহূর্তে কোথায় যেন সে একটা সুন্দর ছবি দেখছে। সেই ছবিটার কথাই বিড় বিড় করে বলতে লাগল, 'মাটির ঘর থাকবে, দেওয়ালে দেওয়ালে ঘি আর সিন্দুর দিয়ে আঁকবি। কী আঁকবি ? এই শালেরা ?'

পাল সাহাব খেঁকিয়ে উঠল।

কিছুতেই সে স্মরণ করতে পারছে না, মাটির দেওয়ালে ঘি আর সিঁদুর দিয়ে কি আঁকতে হবে ? ঘি আর সিঁদুরের সেই চিত্রটির যে কি নাম, কিছুতেই মনে আনতে পারছে না পাল সাহাব।

পাল সাহাব আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'বল না শালেরা কী আঁকবি ?'

বুড়ী বাসিনী বলল, 'বসুধারার কথা বলেন না কি সাহাব বাবা ?'

'হাঁ—হাঁ, ঠিক কথা। বসুধারা—বসুধারাই আঁকবি। কত বরষ বাদ বসুধারার নাম শুনলাম।' আবার তন্ময় হয়ে গেল পাল

সাহাব, 'একটা উঠান থাকবে, বাতাবী লেবুর গাছ থাকবে, ঘুঘু ডাকবে, একটা লেড়কা, একটা বউ—তার হাতে কাঙনা, পায়ে মল—'

গলাটা ভারী হয়ে গেল পাল সাহাবের। সুদূর আকাশের ওপারে একটি অপরূপ ছবির মধ্যে নিমেষে নিজেকে হারিয়ে ফেলল সে। কতকাল আগে বসুধারা-আঁকা একটি মাটির ঘর, ঝকঝকে তকতকে আঙিনা, বাতাবী লেবু ফুলের গন্ধ, ঘুঘুর ডাক, একটি নাহুস নুহুস ছেলে আর মল পরা কোমলমুখী একটি বউ—সব মিলিয়ে সুন্দর একটি ছবি ছিল। ছবিটা এক মুগ্ধ কৃষাণের চোখ জুড়িয়ে দিত।

সেই ছবিটা কোথায় যেন হারিয়ে এসেছে পাল সাহাব। আশ্চর্য, সেই ছবিটার কথাই সে এখন বলছে, 'বউটার পায়ে মল বাজবে, উঠানে ধান মলবি, খড়ের পালা সাজিয়ে রাখবি। বউকে রূপার বিছাহার বানিয়ে দিবি—'

আচমকা তীব্র, তীক্ষ্ণ, অবুঝ হাসির শব্দ উঠল। হাসিটা মেতে মেতে উঠছে। ঢলে ঢলে হাসছে কাপাসী। অন্ধ, উন্মাদ হাসির দাপটে তার সারা দেহ বেঁকে দুমড়ে যাচ্ছে।

কত কাল আগের একটা সুন্দর স্বপ্ন চোখের উপর ভাসছিল। মুহূর্তে স্বপ্নটা ছিঁড়ে গেল। সেই ছবিটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। বিরক্ত, ভীষণ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল পাল সাহাব। তারপর হঠাৎ ক্ষেপে উঠল সে, 'কৌন—কৌন হাসতা ? কে হাসছে ?'

পাশ থেকে হারাণ বলল, 'কাপাসী হাসে, সাহাব বাবা।'

'কাল যে জেনানা হেসেছিল, সে হাসছে ?'

'হ, সাহাব বাবা।'

'এমন হাসে কেন ?'

'হাসে কেন, কেমনে বলব ? কেন হাসে, কাপাসীই কি জানে ?'

কাল যে কথাটা বলেছিল, আজও তা-ই বলল পাল সাহাব, 'বহুত তাজ্জবের আওরত !'

বলতে বলতে কাপাসীর সামনে এসে দাঁড়াল পাল সাহাব। ডাকল, 'এ লেড়কী—'

কাপাসী জবাব দিল না। ফিরেও দেখল না। তার হাসি কল কল করে বাজতেই লাগল।

পাল সাহাব এবার চেঁচিয়ে উঠল, 'হাস মাত্। এখানে হাসি চলবে না। এ লেড়কী—'

অবুঝ, অস্বাভাবিক, বিচিত্র হাসি। কাপাসীর সে হাসি থামে না। পাল সাহাবের ধমক অগ্রাহ্য করে মাততেই থাকে।

পাল সাহাব বলল, 'লেড়কী পাগলী নাকি?'

দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে বসে ছিল নিত্য ঢালী। এবার সে মুখ তুলল। ভাঙা ভাঙা ধরা গলায় বলল, 'সগলই অদৃষ্ট সাহাব বাবা। আমার কপাল। কাপাসী বুঝি পাগলই হইয়া গেল।'

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল নিত্য ঢালী।

পাল সাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'কাঁদ মাত্ শালে। তুমি কৌন?'

'আমি নিত্য ঢালী—কাপাসীর বাপ।'

একটু থামে নিত্য। পাঁজর ফুঁড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তারপর আস্তে আস্তে সে বলে, 'সুখে কি আর কাঁদি বাবা, চোখের জল ফেলতে কার সাধ হয়! বড় দুঃখু বাবা, এই দুঃখু কোন কালে ঘুচবে না।'

নিজের কপালটা দেখিয়ে নিত্য বলতে থাকে, 'এই যে কপাল সাহাব বাবা, এই কপালই কাঁদায়। কপালের লেখা কি খণ্ডান যায়!'

বলে আর কাঁদে নিত্য ঢালী। কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে ওঠে। ঘোলা ঘোলা চোখের তারা দুটো ফেটে ফোঁটায় ফোঁটায় নোনা জল ঝরতে থাকে।

গলার স্বরটা এবার নরম শোনায় পাল সাহাবের, 'কী হয়েছে?'

'কাপাসী পাগল হইয়া গেছে। সগলই আমার দোষে, আমার পাপে।'

দুই হাঁটুর ফাঁকে আবার মাথা গোঁজে নিত্য ঢালী। অদম্য যন্ত্রণায় তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

পাল সাহাব বলে, 'লেড়কী পাগল হল কেন ?'

নিত্য বলল, 'আজ না বাবা, আর একদিন বলব। সে কথা বলতে গেলে বুক আমার ভেঙ্গে যায়। বাপ না আমি শত্তুর, রাক্ষস—'

পাল সাহাব কি বুঝল সে-ই জানে। একেবারেই চুপ করে গেল সে।

বেলা বেড়ে বেড়ে পুরাপুরি দুপুর হয়ে গিয়েছে। সূর্যটা সিধা মাথার উপর এসে উঠেছে। সামনের জটিল অরণ্যকে এখন রহস্যময় দেখায়।

হঠাৎ যেন হুঁশ ফেরে পাল সাহাবের। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে সে, 'শালেরা খানা খাবি না ?'

মানুষগুলো দলা পাকিয়ে বসে ছিল। এবার নড়ে চড়ে উঠল।

পাল সাহাব সমানে চিল্লাতে লাগল, 'তোরা মানুষ না দুসরা কিছু ? কাল রাত্তিরে গিলেছিস, এখন দুপুর। শালেদের খিদের হুঁশও থাকে না! উল্লু, বুদ্ধু, নালায়েক কাঁহাকা! শালেদের খাওয়ার কথাও বলে দিতে হবে।'

এবার পাল সাহাব ঘুরে দাঁড়াল। পাটোয়ারী, চেইন ম্যানদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জলদি খানা লাও, জোর কদমে যাও—'

চেইন ম্যান, পাটোয়ারী আর আদিবাসী রাঁচী কুলীরা টিলা থেকে নেমে জঙ্গলে ঢুকল। খানিকটা পর মস্ত মস্ত লোহার বালতি ভরে ভাত, ডাল এবং ঘ্যাঁট নিয়ে ফিরল।

পাল সাহাব টিলার মাথায় মানুষগুলোকে কাতার দিয়ে বসিয়ে দিল।

খাওয়ার পালা চুকল।

সূর্যটা পশ্চিম দিকে আরো খানিকটা ঢলে পড়েছে।

এতক্ষণ ছু চার টুকরা মৌসুমী মেঘ আকাশে আটকে ছিল। হঠাৎ সমুদ্র ফুঁড়ে উন্মাদ বাতাস উঠে এসেছে। সেই বাতাস দিগন্তের ওপার থেকে সাদা সাদা মেঘের টুকরাগুলিকে উত্তর আন্দামানের এই আকাশে টেনে আনতে শুরু করেছে।

পাল সাহাব বলল, 'শালে লোগ, যারা মরদানা আমার সাথ সাথ চল্।'

হারাণ বলল, 'কোথায় যামু পাল সাহাব ?'

'জমিন লিবি না ?'

পাল সাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'শালে, একটু আগে বলছিলি না, বাঁচতে চাস। জমিন না পেলে বাঁচবি কেমন করে ? চল্—'

পুরুষ মানুষগুলো উঠে পড়ল।

সকলের আগে আগে চলল সি, এ, পাল সাহাব। মধ্যে মানুষগুলো। সবার পিছে পিছে পাটোয়ারী, চেইন ম্যান এবং চারজন আদিবাসী রাঁচী কুলী।

টিলার মাথা থেকে নেমে সকলে জঙ্গলে ঢুকল।

উত্তর আন্দামানের এই অরণ্য। নিরালোক, জটিল, ছুর্জ্ঞেয়। পৃথিবীর আলো সেই অরণ্য ফুঁড়ে ভিতরে ঢোকে না। সরীসৃপের চোখে জ্বলন্ত ফসফরাস ছাড়া এখানে কোন আলো নেই। অরণ্যের মধ্যে এক ধরনের বিচিত্র নীলাভ ছায়া। সেই ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারে পেঁচার চোখ ধকধক করে। পেঁচার চোখের আগুন ছাড়া এখানে অন্য কোন আগুন নেই।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটা চড়াই, ছুটো উতরাই এবং ছোট একটা উপত্যকা পার হয়ে একটা মালভূমি পাওয়া গেল। ছুদিকে

দুটো খাড়া পাহাড়, মাঝখানে বিরাট অংশ জুড়ে মালভূমি। মালভূমিটা সমতল।

এখানে অরণ্য নেই।

হাজার বছরের জঙ্গল নির্মূল করে ফেলা হয়েছে। প্যাডক, দিদু, চুগলুম, টমপিঙ—বিরাট বিরাট বনস্পতি আকাশের সীমাহীনতার দিকে মাথা তুলে ছিল। মোটা মোটা মুথিয়া লতা, বেতের লতা আর থুমিয়া লতা গাছগুলিকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে অরণ্যকে জটিল করে তুলেছিল।

পেট্রোল ছড়িয়ে ছড়িয়ে একদিন জঙ্গলে আগুন ধরানো হল। ডালপালা এবং ছাল পুড়ে পুড়ে গাছগুলি কবন্ধের মত সারি সারি এক পায়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এল করাত। করাতের দাঁতে দাঁতে বিরাট বিরাট বনস্পতি খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল।

গাছ পুড়েছে, লতা পুড়েছে, জলডেঙ্গুয়া আর হাওয়াই বুটির ঝোপ পুড়েছে। চারদিকে রাশি রাশি পোড়া অঙ্গার স্তূপাকার হয়ে রয়েছে, ছাই উড়ছে। ঘাসবন পুড়ে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। মালভূমিটা জুড়ে একটা মহাশ্মশান যেন ছড়িয়ে রয়েছে।

মানুষ আসবে। উপনিবেশ গড়বে।

আগুনের মুখে, করাতের মুখে, ধারাল কুড়ালের মুখে অরণ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। হাজার হাজাব বছর ধরে এই দ্বীপের উপর অরণ্য তার দাবী এবং দখল প্রতিষ্ঠা করেছে। মানুষের নিষ্ঠুর প্রয়োজনের কাছে অরণ্য চিরদিনের জন্য তার দাবী আর দখল হারাল।

অরণ্যের তলা থেকে মুখ তুলেছে কুমারী মাটি।

পাল সাহাব বলল, 'এই তোদের জমিন, শালে লোগ—'

মালভূমির এক কিনারে মানুষগুলো দলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অবাক হয়ে দু পাশের পাহাড়, মাঝখানের মালভূমি এবং মাটির নমুনা দেখছিল।

পাল সাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'ছাখ ছাখ—ভাল করে ছাখ। জমিন পছন্দ হয় কি না ?'

বুড়া রসিক শীল এক ডেলা মাটি হাতের চাপে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে পরখ করছিল। লোভে খুশীতে তার ঘষা ঘষা বিবর্ণ চোখজোড়া চক চক করছে। রসিক বলল, 'বড় বাহারের মাটি সাহেব বাবা। মাটি আমাগোর (আমাদের) পছন্দ হইছে।'

পাল সাহাব এবার আর কথা বলল না। মালভূমিতে নেমে গেল। তার পিছু পিছু নামল পাটোয়ারী, চেইন ম্যান এবং আদিবাসী রাঁচী কুলীরা।

খাকী প্যান্টের পকেট থেকে একটুকরা কাগজ বার করল পাল সাহাব। তারপর হাঁকল, 'ভীমরাজ জয়ধর—'

'এই যে সাহাব বাবা—'

আধা বয়সী একটা মানুষ জমিতে নামল।

পাল সাহাব বলল, 'শালে তিন একর জমি তুই পাবি। জমি বুঝে নে। মাপ দেখে নে।'

এবার ঘুরে দাঁড়াল পাল সাহাব। চিৎকার করে বলল, 'পাটোয়ারী, চেইন ম্যান, তিন একর জমিন মাপ।'

চেইন ম্যান লোহার ফিতে দিয়ে জমি মাপল।

এতক্ষণ চোখে পড়ে নি। এবার দেখা গেল একটা হাওয়াই বুটির ঝোপের পাশে হাত তিনেক করে লম্বা, সমান মাপের অনেকগুলো বাঁশের খণ্ড স্তূপাকার হয়ে রয়েছে। চেইন ম্যান জমি মাপল। রাঁচী কুলীরা বাঁশের খণ্ড পুঁতে জমির সীমানা ঠিক করে দিল। আর পাটোয়ারী একটা মোটা খেরো খাতায় জমির হিসাব টুকে রাখতে লাগল।

পাল সাহাব হেঁকে যেতে লাগল, 'রসিক শীল, হারাণ দাস, মনোহর ভক্ত, বিপদভঞ্জন বিশ্বাস—'

একে একে সকলে জমি বুঝে নিতে লাগল।

সূর্যটা পশ্চিম আকাশে অনেকখানি ঢলে পড়েছে। অরণ্যের মাথায় ম্লান, বিষন্ন একটু আলো আটকে রয়েছে। রোদের তেজ মরে গিয়েছে। হিম হিম বাতাস জঙ্গলের মধ্য থেকে উঠে আসছে।

পাল সাহাব ডাকল, 'হরিপদ বারুই—'

কেউ জবাব দিল না।

পাল সাহাব এবার গলা চড়াল, 'কৌন হো হরিপদ বারুই? নালায়েক হারামী, বুদ্ধু কাঁহাকা!'

এবারও কেউ জবাব দিল না।

টেনে টেনে বদখত, ভীষণ গলায় চিল্লাতে থাকে পাল সাহাব, 'হরিপদ কুত্তা—'

পিছনের জঙ্গলটা ফুঁড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বিশ বাইশ বছরের একটি যুবতী মেয়ে পাল সাহাবের সামনে এসে দাঁড়াল।

মেয়েটির গায়ের রঙ মাজা কালো; উজ্জ্বল মসৃণ ত্বক। তেলহীন রুক্ষ চুলগুলি উড়ু উড়ু। সিঁথিতে গুঁড়ো গুঁড়ো বাসী সিঁদুরের রেখা। সিঁদুর শুকিয়ে গিয়েছে। পাতলা নাকে লাল পাথরের নাকছাবি। চোখের মণি দু'টি ঈষৎ কটা। বাঁ গালে একটা কাটা দাগ মেয়েটিকে অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব দিয়েছে। মেয়েটির দীর্ঘ দেহে প্রচুর স্বাস্থ্য। সেই স্বাস্থ্যে কেমন এক ধরনের বন্যতা মিশে আছে।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অনেকটা চড়াই উতরাই ভেঙে এসেছে মেয়েটি। এখনও সমানে হাঁফাচ্ছে। বুকটা দ্রুত তালে উঠছে, নামছে।

মেয়েটি যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে, হুঁশ নেই পাল সাহাবের। সে সমানে চিল্লাচ্ছে, 'এ হারামী, এ হরিপদ কুত্তা—'

বিড়ালীর মত কটা চোখ দুটো কুঁচকে মেয়েটি ফুঁসে উঠল, 'এই ড্যাকরা, যমের অরুচি—'

পাল সাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'তুই কৌন? এ লেড়কী—'

'আমি তিলি।'

'এই জঙ্গলে কী করতে এসেছিস হারামী?'

তিলি বলল, 'রূপ দেখাইতে রে যমের অরুচি পাল সাহাব; রূপ দেখাইতে এসেছি।'

হঠাৎ পাল সাহাব গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'তামাশা মাত কর তিলি। এখন কামের সময়।'

'এই জঙ্গলে জনমনিষ্যি নাই, জঙ্গল দেখলে ডরে বুক কাঁপে। সেই জঙ্গল ভেঙে এখানে আমি তামাশা মারতে এসেছি! তামাশা মারার মানুষ পাইলাম না আর!'

তাচ্ছিল্যে মুখ বাঁকায় তিলি।

এবার তিলির দিকে তাকায় না পাল সাহাব। দেহের সবটুকু জোর গলায় ঢেলে চিল্লায়, 'এ হরিপদ—হরিপদ কুত্তা—'

হঠাৎ ক্ষেপে উঠল তিলি। ক্ষেপলে তার নাকের ডগাটা তির তির করে কাঁপতে থাকে। তিলি বলল, 'তুই কুত্তা, তোর বাপ কুত্তা, তোর চোদ্দ গুষ্ঠী কুত্তা—'

পাল সাহাব তাজ্জব বনে গিয়েছে। অস্ফুট স্বরে সে বলে, 'আজব লেড়কী!' আস্তে আস্তে গলার স্বরটা চড়তে থাকে, 'গালি দিচ্ছিস কেন?'

'তুই ক্যান গালি দিচ্ছিস আমার সোয়ামীরে?'

'আমি কখন তোর সোয়ামীকে গালি দিলাম?'

'গালি দিস, আর টের পাইস না ড্যাকরা?'

'নাম কী তোর সোয়ামীর?'

'ড্যাকরা পাল সাহাব, সোয়ামীর নাম জিগাইস (জিজ্ঞাসা করিস)! সরম লাগে না! মেয়েমানুষ সোয়ামীর নাম মুখে আনে না কি রে যমের অরুচি?'

তিলির পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে হারাণ। সে বলল, 'ওর সোয়ামীর নাম হরিপদ বারুই।'

পাল সাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'হরিপদ কোথায় ?'

তিলি বলল, 'ক্যাম্পে। তার হাঁপির (হাঁফানির) টান উঠেছে। তাই আমি আইলাম।'

'তুই এয়েছিস কী করতে ?'

বিড়ালীর মত কটা চোখ ছুটো কুঁচকে কিছুক্ষণ ভয়ানক ভাবে তাকিয়ে রইল তিলি। চোখের পাতা নড়ছে না। একটা কথাও বলছে না সে। রাগে গর গর করছে। নাকের মধ্যে ফোঁস্ ফোঁস্ করে কেমন এক ধরনের আওয়াজ করছে। আর সমানে ফুঁসছে। ফোঁসানির তালে তালে অস্বাভাবিক পুষ্ট বুক ছুটো উঠছে, নামছে।

তিলির ভয়ঙ্কর মূর্তির দিকে তাকিয়ে এমন যে পাল সাহাব, সে-ও ছুপা পিছু হটল। বিড় বিড় করে বকতে লাগল, 'শালী, আওরত না ছুসরা কিছু।'

পাল সাহাবের গলা তিলির কান পর্যন্ত পৌঁছেছে কি না, সে-ই জানে। তিলি এবার বলতে লাগল, 'বুকে দরদ, পিঠে দরদ, বুড়া মানুষ হাঁপির (হাঁফানির) টানে কাহিল হইয়া আছে। আর ড্যাকরা পাল সাহাব জিগায় (জিজ্ঞাসা করে) কি না, আমি আসছি ক্যান ? ক্যান আবার, জমিনের বুঝ নিতে। আমার ভাগের জমিন নেব না রে পোড়ার মুখ ?'

'জমিন লিবি ? লে না শালী। তোর ভাগের জমিন আমি দেব না, আমার বাপ দেবে। বাপরে বাপরে বাপ। আওরত না ছুসরা কিছু।'

পিছন দিকে ঘুরে পাল সাহাব বলল, 'এ পাটোয়ারী, এ চেইন-ম্যান, জমিন মাপ। শালীর জমিন আভি বুঝিয়ে দে।'

চেইনম্যান, পাটোয়ারী এবং কুলীরা মাপ জোখ করে বাঁশের খুঁটি পুঁতে সীমানা ঠিক করে দিল।

জমি মাপতে মাপতে সন্ধ্যা হয়ে এল।

চার পাশের জঙ্গলের মাথায় সাদা, ফিনফিনে কুয়াশার পর্দা নামল।

জমি বাঁটোয়ারা বন্ধ করে পাল সাহাব চেঁচিয়ে উঠল, 'আজকের মত কাম খতম। কাল আবার জমিন মেপে দেব। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, শালে লোগ আমার সাথ আ যা—'

পাল সাহাবের পিছু পিছু মানুষগুলো ট্রানজিট ক্যাম্পের দিকে ফিরে চলল।

নয়

মায়া বন্দর থেকে রাত থাকতে থাকতেই তারা বেরিয়ে পড়েছিল।

বিরাট একটা সুরমাই মাছের মত জল কেটে কেটে 'নটিলাস' বোটটা এই মাত্র উত্তর আন্দামানের এরিয়াল উপসাগরে পৌঁছেছে। ঘণ্টায় পনর নটিক্যাল মাইল বেগে ছুটে এসেছে বোটটা। মোটর এঞ্জিনটা ক্লান্ত একটা হৃৎপিণ্ডের মত একটানা শব্দ করে হাঁপাচ্ছে।

'নটিলাস' বোটে সওয়ারী মাত্র তিনজন। মালিক পানিকর; নিজেকে সে বলে প্রোপ্রাইটার। প্রোপ্রাইটর পানিকর ছাড়া আরো তুজন আছে। তু'জনই শেল ডাইভার। একজন লা তে। অন্য লোকটার নাম ধামুক; জাতে ওঁরাও।

রোজই রাত থাকতে থাকতে 'নটিলাস' বোট মায়া বন্দর থেকে এরিয়াল উপসাগরে আসে। এর কারণও আছে।

রাত্রিতে সমুদ্র জুড়োতে থাকে। তখন অথৈ দরিয়া থেকে টার্বো, ট্রোকাস, ক্রগশেল, কোঞ্চ, নী-ক্ল্যাম্প, সান ডায়াল—অজস্র ধরনের 'শেল' গুটি গুটি বুকে হেঁটে উপসাগর আর উপকূলের দিকে উঠে আসতে থাকে। যখন রোদ ওঠে, আস্তে আস্তে রোদের তেজ বাড়তে থাকে, তখন সেই সমস্ত 'শেল' গুলি আবার সমুদ্রের গভীরে পালিয়ে যায়। রোদের তেজ, দিনের তেজ তারা সহ্য করতে পারে

না। তাই সকাল বেলাটাই 'শেল' তোলার পক্ষে সেরা সময়। ডাইভাররা সকালেই সবচেয়ে বেশী 'শেল' তোলে।

এখনও ভোর হয় নি।

উপকূলের ম্যানগ্রোভ বনগুলি নির্দিষ্ট চেহারা নিয়ে ফুটে বেরোয় নি। দূরের স্যাডল পীকের মাথাটা দেখা যাচ্ছে না। গাঢ় কুয়াশা আর অন্ধকার উপসাগর, উপকূল, বন-পাহাড় এবং অনেক দূরের দরিয়াকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কুয়াশা এবং অন্ধকার ভেদ করে দৃষ্টি চলে না। শুধু বোঝা যায়, 'নটিলাস' বোটটার চারপাশে ঘন আলকাতরার মত কালো জল দুলছে।

উপসাগর ফুঁড়ে হিম হিম বাতাস উঠে আসছে।

শীতে কুঁকড়ে রয়েছে ধানুক। দুই হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। কিন্তু লা তে'র চামড়া কোন ধাতুতে তৈরি সে-ই জানে। সে চামড়ায় শীত বেঁধে না। 'নটিলাস' বোটের পাটাতনের উপর জুত করে বসে ডলে ডলে সারা দেহে কড়ুয়া তেল মাখছে লা তে। আর হুস্ হুস্ করে কেমন এক ধরনের শব্দ করছে।

মোটর এঞ্জিনটার পাশে চুপ চাপ বসে ছিল প্রোপ্রাইটর পানিকর। এবার সে নড়ে চড়ে উঠল। বলল, 'এ লা তে—'

'হাঁ জী—'

'আজ বড় জাড় (শীত) !'

'কোথায়! আমার তো তেমন জাড় (শীত) লাগছে না।'

'তুই কি মানুষ! তুই একটা জানোয়ার।'

লা তে কিছুই বলল না। হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল। পানিকর তাকে জানোয়ার বলেছে। এ ব্যাপারে লা তে'র পুরাপুরি সায় আছে। খুব খুশী হয়েছে সে।

চাপা স্বরে পানিকর আবার বলল, 'জানোয়ার!'

খানিকটা সময় কাটে।

পানিকরই আবার শুরু করল, 'আজ আমরা অনেক আগে এসে পড়েছি, তাই না রে লা তে ?'

'হাঁ মালিক।'

তেল ডলতে ডলতে জবাব দিল লা তে।

পানিকর স্বর চড়িয়ে ডাকল, 'এ ধান্নুক—ধান্নুক রে—'

'হাঁ জী, বহুত জাড় (ঠাণ্ডা)।'

কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে ধান্নুক। দুই হাঁটুর ফাঁক থেকে মাথা না তুলে অস্ফুট জড়ানো স্বরে কুঁই কুঁই করে উঠল। হিমে গায়ের রোঁয়াগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে।

এই প্রথম 'শেল' ডাইভারের কাজ নিয়েছে ধান্নুক। খাড়ি কি উপসাগর থেকে ডুব মেরে মেরে সামুদ্রিক শামুক তুলতে হবে। হাঙর-অক্টোপাস এবং বিষাক্ত রেমোরা মাছের সঙ্গে লড়াই করে 'সিপি' (শেল) শিকার করতে হবে। খুব সম্ভব এই সবই ভাবছে ধান্নুক। যতই ভাবছে, অদ্ভুত এক ভয় তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরছে। ভয় আর শীত—এই দুইয়ে মিলে ধান্নুককে বেজায় কাবু করে ফেলেছে। হাঁটু দুটো ঠক ঠক করে কাঁপছে। কিছুতেই তাদের বশে আনতে পারছে না ধান্নুক।

পানিকর আবার বলল, 'ডর লাগছে ধান্নুক ?'

'হাঁ মালিক। বদমাস মচ্ছির (হাঙর) সাথ লড়াই করে 'সিপি' (শেল) তুলতে হবে। জরুর মরে যাব।'

এতক্ষণ কুণ্ডলী পাকিয়ে ছিল ধান্নুক। এবার হাঁটুর ফাঁক থেকে মাথা তুলে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল।

হাঙর-অক্টোপাসের মুখ থেকে 'সিপি' তোলার লোক সহজে মেলে না। আন্দামানে যে ক'জন শেল ডাইভার আছে, 'সিপি'র

মরশুম পড়বার আগেই মহাজনেরা তাদের আগাম টাকা দিয়ে বায়না করে রাখে।

এই মরশুমে একমাত্র লা তে'কেই পেয়েছে পানিকর। লা তে ওস্তাদ ডাইভার। সারা আন্দামানে তার জুড়ি নেই। অন্য ডাইভার যখন দশটা শেল তোলে, লা তে তোলে বিশটা। যত ওস্তাদই হোক লা তে, একজন মাত্র ডাইভারের ভরসায় গোটা মরশুম চালানো যায় না। তা ছাড়া এই মরশুমের জন্য পুরা উত্তর আন্দামানের লাইসেন্স পেয়েছে পানিকর। উত্তর আন্দামানের উপকূল আর উপসাগরে যত 'সিপি' আসে, একমাত্র সে-ই তুলতে পারবে। কিন্তু উত্তর আন্দামানে কত যে খাড়ি, কত যে উপসাগর, কত যে উপকূল, কে তার হিসাব দেবে?

অনেক চেষ্টা করেছে পানিকর। কিন্তু লা তে ছাড়া আর একটা ডাইভারও সে জোটাতে পারে নি। সবাই অন্য অন্য মহাজনের কাজ নিয়ে দক্ষিণ আন্দামান, নিকোবর, মধ্য আন্দামান কি লিট্‌ল্ আন্দামানে চলে গিয়েছে।

মাস খানেক হল ফরেস্টের কুলী হয়ে আন্দামান এসেছিল ধানুক। সারা দিন জঙ্গলে কাজ করত। রাত্রে মায়া বন্দরে এক কারেনের কুঠিতে শুতে আসত সে। কারেনও ফরেস্টে কাজ করে। জবাবদারির কাজ তার। এবারের 'সিপির' মরশুমে মায়া বন্দরে কুঠি ভাড়া করে আছে পানিকর। তার ঠিক পাশেই কারেন জবাবদারের কুঠি।

সারাদিন লা তে'কে নিয়ে শেল তুলে রাত্রে মায়া বন্দরের কুঠিতে ফেরে পানিকর। কুঠির সামনে খানিকটা খোলা মাঠ। সেখানে দড়ির খাটিয়া পেতে দেয় পানিকর। গোটা দুই লণ্ঠন জ্বেলে দেয় কারেন জবাবদার। ধানুক আসে, জবাবদার আসে, মায়া-বন্দরের করাত কলে যারা কাজ করে, তারাও এসে পড়ে।

তারপর গানা-বাজনা-নাচনা-হল্লা শুরু হয়ে যায়। রোজই পুরাদস্তুর আসর বসে।

এই আসরেই ধান্নুকের সঙ্গে পানিকরের জান-পয়চান হয়েছে।

ধান্নুকের গলা বড় মিঠা। ডান হাতে বাঁ কানটা চেপে, বাঁ হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে, ঘাড়টা সামান্য কাত করে গেয়ে ওঠে—

ছারা রা-রা—চা-রা-রা-রা
দেখ চলি যা,
দেখ চলি যা,
ভগলুকা বহিনিয়া, পতিয়াকা বেটিয়া, জোয়ানিয়া ছোকড়িয়া
ঢুলায়ে ঢুলায়ে চহলিয়া-চহলিয়া—
দেখ চলি যা,
দেখ চলি যা,
চারা-রা-রা—চা-রা-রা-রা

গলায় গেটকিরি খেলে ধান্নুকের। খাদ থেকে গলাটাকে যখন চড়ায় তোলে, তখন ওস্তাদী মার মারে, 'তেরছি নজর, পতলি কোমর ঢুলায়া ঢুলায়া—'

চারপাশ থেকে হল্লা ওঠে, 'সাবাস, সাবাস—'

ধান্নুক তুখোড় ফুর্তিবাজ। দু দশ রোজের মধ্যে তার সঙ্গে দোস্তি পাতিয়ে নিয়েছিল পানিকর।

পানিকর অনেক বুঝিয়েছে ধান্নুককে, 'জঙ্গলে কুলীগিরি করে জিন্দগী খতম করে কি লাভ? কত রূপেয়া তলব (মাইনে) মেলে?'

'দো বিশ আউর দশ রুপেয়া।'

'ফুঃ!'

অদ্ভুত এক শব্দ করেছিল পানিকর। 'পঞ্চাশ রূপেয়াতে কি হয়! মুলুকে কে কে আছে তোমার?'

'জরু আছে, দুই লেড়কা আছে।'

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে ধান্নুকের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল পানিকর।

তারপর বলেছিল, 'তোমাকে আমি মাসে মাসে চার বিশ টাকা দেব।'

"কাঁহে ?'

'তুমি আমার কাছে কাজ করবে।'

'কী কাজ ?'

'সিপি চেন ?'

'হাঁ জী।'

'দরিয়া থেকে সিপি তুলবে। আর মাসে মাসে চার বিশ রুপেয়া পাবে। জঙ্গলের নোকরি তুমি ছেড়ে দাও।'

'জী।'

ফরেস্টের নোকরি ছেড়ে দিল ধানুক। মাসে মাসে চার বিশ অর্থাৎ আশী টাকার লোভটাকে কিছুতেই দাবাতে পারল না।

মায়া বন্দরের অগভীর উপসাগরে নামিয়ে ধানুককে দিন কয়েক তালিম দিল পানিকর। দরিয়া থেকে কেমন করে সিপি তুলতে হয়, তার প্রক্রিয়াটা শিখিয়ে দিল।

আজ প্রথম ধানুককে নিয়ে সিপি তুলতে বেরিয়েছে পানিকর।

'নটিলাস' বোটের ডেকে শীতে আর দুর্বোধ্য এক ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে ধানুক। মাঝে মাঝে বিকট শব্দ করে ফুঁপিয়ে উঠছে।

হাতে পায়ে কড়ুয়া তেল ডলতে ডলতে লা তে ধমকে ওঠে, 'এ শালে, বেফায়দা কাঁদছিস কেন ?'

'মর যায়েগা, মর যায়েগা—জরুর মর যায়েগা—হু-হু—' কোঁপাতে কোঁপাতেই বলে ফেলে ধানুক, 'আমি সিপি তুলব না। চার বিশ রুপেয়ার তলব আমার লাগবে না।'

কিছুক্ষণ হা হা করে হাসে লা তে। তারপর বলে, 'ডরপোক কাঁহাকা! মরবি কেন? হয়েছে কি? তাগড়া জোয়ান মরদ। বুরবক—বুদ্ধু—'

'সিপি তোলার সময় বদমাস মচ্ছি (হাঙর) জরুর কাটবে।'

ধানুকের ফোঁপানি বাড়তেই থাকে। এক দমে সে বলে যায়, 'জঙ্গলের কামই আমার ভাল, আমি আভী মায়া বন্দর ফিরে যাব। দরিয়ায় নেমে জান দিতে পারব না।'

লা তে কিছুই বলল না। একটি মাত্র শব্দ করল, 'ডরপোক!'

লা তে'র একটি মাত্র শব্দে অদ্ভুত ঘৃণা মিশে রয়েছে।

একটু পরেই ভোর হয়ে এল।

অন্ধকার ফিকে হতে হতে উধাও হয়ে গিয়েছে। সারা রাত এই উপসাগরের উপর অন্ধকারের যে জালটা ছড়িয়ে থাকে, এই মাত্র অদৃশ্য হাতে কে যেন তাকে গুটিয়ে নিয়েছে। রাশি রাশি সোনার তীর ছুঁড়ে দিনের প্রথম রোদ গাঢ় কুয়াশার স্তরগুলিকে ছিঁড়ে ফেলেছে। অনেক, অনেক দূরে যেখানে আকাশ আর সমুদ্রের মধ্যে সীমারেখাটা মুছে গিয়েছে, সেখানে সূর্য নামে রক্তিম আগ্নেয় গোলকটি দেখা দিতে শুরু করেছে।

উপসাগরের জল কাচের মত স্বচ্ছ।

'নটিলাস' বোট সন্তর্পণে সামনের দিকে এগুতে থাকে। জলে ঢেউ ওঠে কি ওঠে না।

জলের নীচে বাদামী রঙের বালির বিছানা। তার উপর রাশি রাশি টার্বো আর ট্রোকাস পড়ে রয়েছে! সারা রাত ধরে এই সব সামুদ্রিক শামুকগুলি গভীর সমুদ্র থেকে অগভীর উপসাগরে উঠে এসেছে।

উপসাগরের উপর ঝুঁকে রয়েছে লা তে। তার চাপা কুতকুতে চোখদুটো চক চক করছে।

টার্বো ট্রোকাসগুলোর চারপাশে এক ঝাঁক ছোট ছোট হাঙর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঝপাং করে একটা শব্দ হল। উপসাগরে লাফিয়ে পড়েছে লা তে।

সারাদিন ডুব মেরে মেরে সিপি তুলল লা তে।

দরিয়ার কাছ থেকে কি সহজে কর মেলে!

নোনা জলের সঙ্গে অবিরাম যুঝে যুঝে, হাঙর আর অক্টোপাসের সঙ্গে লড়াই করে সিপি তুলতে হয়।

যতক্ষণ উত্তর আন্দামানের আকাশে দিনের শেষ আলোটুকু ছিল, যতক্ষণ জলের নীচে টার্বো ট্রোকাসগুলোকে দেখা যাচ্ছিল, ততক্ষণ উপসাগর থেকে ওঠে নি লা তে। সমানে সিপি কুড়িয়েছে।

দুপুরের দিকে একবার মাত্র মোটর বোটে উঠেছিল লা তে। খান দশেক রুখা রোটি আর খানিকটা ভাজি গিলেই আবার উপসাগরে নেমে গিয়েছিল।

দ্বীপ আর অরণ্যের ও পাশে সূর্যটা কখন যে নেমে গিয়েছে, কে তার হদিস দেবে? এখন যতদূর তাকানো যায়, সমুদ্র জুড়ে সন্ধ্যা নামার আয়োজন চলছে। আবছা অন্ধকারে আর কুয়াশায় চারদিক কেমন যেন বিষণ্ন, নিরানন্দ। এখন উড়ুক্কু মাছগুলি ফিনফিনে রূপালী ডানায় জল কাটছে না। পাঁশুটে রঙের সাগরপাখিগুলো সারাদিন দরিয়ায় ঘুরে ঘুরে এখন দ্বীপের আশ্রয়ে ফিরে আসতে শুরু করেছে।

আকাশ থেকে দিনের শেষ আলোটুকু মুছে যাবার সঙ্গে সঙ্গে উপসাগর থেকে মোটর বোটে উঠে এসেছে লা তে। সারা দিন নোনা জলে ডুব মেরে মেরে সিপি তুলেছে। জল শুকিয়ে লা তে'র সারা গায়ে কণা কণা নুন হয়ে ফুটে বেরিয়েছে।

শেডের এপাশে চুপচাপ বসে রয়েছে ধানুক। দুই হাঁটুর ফাঁকে তার মাথাটা গোঁজা। হাঙর, অক্টোপাশ আর রেমোরা মাছের ভয়ে সে জলে নামে নি। তোষামোদ করে, ধমক-ধামক দিয়ে, বাড়তি টাকার লোভ দেখিয়ে—কোন উপায়েই তাকে জলে নামাতে পারে নি পানিকর। ধানুককে অন্তত হাজার বার সিপি তোলার কথা বলে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছে লা তে।

জলে নামল না ধানুক। সারাদিন কিছু খেল না। দুই হাঁটুর ফাঁকে মাথাটা ঢুকিয়ে জানের ডরে মেয়েমানুষের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। আর ভাবল, চার বিশ (আশী) টাকার লোভে হাঙর আর অক্টোপাশের সঙ্গে লড়াই করে সিপি তোলার কাজটা না নিলেই ভাল করত সে। এর চেয়ে ফরেস্টের কাজই তার ভাল। মেহনত হয়ত বেশি, তলব (মাইনে) হয়ত কম, কিন্তু জানের ডর তো নেই! সিপি তুলে কাজ নেই। মায়াবন্দর ফিরে ফরেস্টের নোকরিটাই আবার নেবে ধানুক।

শেডের ওপাশে বসে আছে প্রোপ্রাইটর পানিকর। তার গা ঘেঁষে উবু হয়ে রয়েছে লা তে।

পানিকর আজ বেজায় খুশী।

সিপিতে সিপিতে 'নটিলাস' বোটের আধাআধি ভরে ফেলেছে লা তে।

এই মরশুমে সমুদ্র থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে শেল উপসাগর আর উপকূলের দিকে উঠে আসছে। চোখ দুটো সামান্য কুঁচকে প্রোপ্রাইটর পানিকর মনে মনে হিসাব কষতে লাগল। এটা তার মুদ্রাদোষ। কোন কিছু ভাবতে শুরু করলেই আপনা থেকে তার চোখ দুটো কুঁচকে যায়।

পানিকর ভাবল, সব মরশুমেই এমন সিপি আসে না। পনের বছর ধরে আন্দামানের সমুদ্র থেকে সিপি তুলছে সে। কিন্তু এই মরশুমের মত এত সিপি কচিৎ কদাচিৎ দেখেছে।

হিসাব কষতে কষতে পানিকরের মনে হল, এবার ঠিকমত সিপি তুলতে পারলে বাকী জীবনের জন্য চিন্তাধান্দা থাকবে না। ভাবল পোর্ট ব্লেয়ার শহরে একটা কুঠিবাড়ি কিনে কায়েমী হয়ে বসবে।

পনের বছর ধরে আন্দামানের দরিয়া থেকে সিপি তুলছে

পানিকর। সিপির ব্যবসা বড় অনিশ্চিত। দরিয়ার মর্জির উপর এ ব্যবসা নির্ভর করে। যেবার দরিয়ার মেজাজ দরাজ থাকে সেবার পানিকররা দু পয়সা কামিয়ে নেয়। কিন্তু মাঝে মাঝে সমুদ্র বড় কৃপণ হয়ে যায়। সে সব বারে উপকূলের দিকে সিপি আসে না। যা-ও আসে, তা হল ফ্রগ শেল, ক্লাম, স্পাইডার—বাজারে যাদের দর কানাকড়িও না। সে সব বার মাথায় হাত দিয়ে বসে পানিকররা। ডাইভারদের মজুরি, মোটর বোটের তেলের খরচ, খাইখরচা—কিছু ওঠে না। লাভ দূরের কথা, ঘরের মজুদ টাকা ঢেলে তাল সামলানো দায় হয়ে ওঠে।

দরিয়ায় দরিয়ায় সিপির পিছনে, সিপির সঙ্গে সঙ্গে অনিশ্চিত ভাগ্যের পিছনে পনের বছর ধরে ঘুরছে পানিকর। কিন্তু ভাগ্যকে মুঠোর ভিতর পুরতে পারল কই ?

পানিকর ভাবল, এই মরশুমটা ভালয় ভালয় কাটলে হয়। পোর্ট ব্লেয়ার ফিরে অন্য ব্যবসার ফিকির দেখবে। তার অনেক দিনের সাধ, একটা সরাইখানা খোলে।

পানিকরের ভাবনাটা ঘুরে ঘুরে সিপির মধ্যে এসে পড়ল।

এবার ঝাঁকে ঝাঁকে টার্বো, ট্রোকাস, নটিলাস, সান ডায়াল উপসাগরের দিকে উঠে আসছে। দরিয়া এবার দরাজ হাতে দিচ্ছে। টার্বো, ট্রোকাস, নটিলাস, এগুলি কুলীন জাতের সিপি।

পানিকর ভাবল, ডাইভার হিসাবে লা তে যত ওস্তাদই হোক, শুধুমাত্র তার ভরসায় এত বড় একটা মরশুম চালানো যাবে না। শিখিয়ে পড়িয়ে ধানুককে এনেছিল। অক্টোপাস আর হাঙরের ভয়ে সে তো জলেই নামল না।

অথচ এ মরশুমে অনেক, অনেক ডাইভার দরকার। এত ডাইভার পায় কোথায় পানিকর!

চোখ দুটো কুঁচকেই আছে। কপালের উপর অনেকগুলো ভাঁজ পড়েছে। হঠাৎ পানিকরের মনে পড়ে গেল।

পাশেই উবু হয়ে রয়েছে লা তে। তার পাঁজরে আস্তে একটা গুঁতো দিয়ে পানিকর ডাকল, 'এ লা তে—'

'হাঁ মালেক—'

'ডিগলিপুরে তো বহুত নয়া মানুষ এসেছে?'

'হাঁ মালেক—'

'শুনেছি পাঁচ ছ মাইল দূরে ওদের সেটেলমেণ্ট বসেছে।'

লা তে সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়, 'আমিও শুনেছি।'

'দু চার রোজের মধ্যে একবার সেটেলমেণ্টে যাব।'

'কী মতলব মালেক?'

'কাম আছে।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে পানিকর।

কিছুই না বুঝে পানিকরের দেখাদেখি লা তে'ও মাথা নাড়তে থাকে।

দশ

শুধু কি বুড়ী বাসিনী, আজকাল উদ্ধব বৈরাগীও বাঁচার স্বপ্ন দেখছে শুধু কি নিজেই দেখছে, আর দশজনকেও দেখাচ্ছে।

উদ্ধব হল জাত বৈরাগী।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে আসার আগে অন্য একটা জীবন ছিল উদ্ধবের। সেই জীবনটাকে একটা ধূ ধূ স্বপ্নের মত মনে হয়। সেই জীবনটা আদৌ সত্য ছিল কি না, এক এক সময় উদ্ধবের মনে সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে।

জিরানিয়া গ্রামের কথা মনে পড়ে।

জিরানিয়া গ্রামের শিয়র ঘেঁষে একটি মাঝারি নদী তির তির করে বয়ে যেত। নদীর নাম ধলেশ্বরী; রসিক সুজনেরা বলত উজানিয়া গাঙ, মাতানিয়া নদী।

ধলেশ্বরীর মিঠান জলে উজান ভাটির লহর খেলত।

নদীর পারে কত যে হিজল গাছ, তার লেখাজোখা নেই। ধলেশ্বরীর জল যেমন মিঠা, হিজলের ছায়া তেমনি মিঠা। হিজলের ঠাণ্ডা ছায়ায় জিরানিয়া গ্রামটি জুড়িয়ে থাকত।

মাঝারি নদীটির পারে জিরানিয়া গ্রামটি কিন্তু বেশ বড় ছিল। মোট তিন শ ঘর সদগোপ, যুগী আর সোনারুর বাস।

কঁ্যাচা বাঁশের বেড়া আর ঢেউটিনের চালের সারি সারি ঘর। আম গাছ, জাম গাছ, বেতফলের গাছ, বন্যা আর ঝিকিট গাছ। পাখি—তাও হাজার রকমের। শালিক, ডাহুক, হাড়গিলা, বখারি, তিতির, কাদাখোঁচা—কত যে, কে তার হিসাব রাখে? আর আছে জমি-একফসলা, দোফসলা, তেফসলা। বছর ভরে মাটিতে বীজ ছড়িয়ে যাও। মাটিও অকৃপণ হাতে দিয়ে যাবে। আহা, কি বাহারের জমি! বছরের কোন সময় তার ঝাঁপি শূন্য হয়ে যায় না।

মাটি, মানুষ, পাখি, গাছ, ছায়া, নদী—এই সব নিয়েই তো জিরানিয়া গ্রাম।

তাঁতি, সদগোপ, সোনারু—জিরানিয়া গ্রামের কেউ কৌলিক ব্যবসা করত না। সবাই কৃষাণী ক ত। মাটি নিয়ে মেতে থাকত। তাই জিরানিয়া ধানী গৃহস্থের গ্রাম হয়ে উঠেছিল।

বিষয় বাসনা ছিল না উদ্ধবের। বিষয় বাসনা কেন, ছেলে-বউ-সংসার, কিছুই ছিল না। পৃথিবীর কোন কিছুর জন্য টান কি মোহ, লোভ কি আসক্তি, কিছুই ছিল না।

ধলেশ্বরীর কিনার ঘেঁষে একখানা দোচালা ঘর তুলে নিয়েছিল উদ্ধব। সম্পত্তি বলতে এই দোচালা ঘরটাই ছিল উদ্ধবের সব কিছু। এই ঘরটাই শুধু নয়, খানদুই আট হাতি ধুতি, খান দুই ফতুয়া, একটা জলচৌকি, রাধামাধবের যুগলমূর্তির একটি ছবি আর ছিল একটি সারিন্দা। সারিন্দাটা নিজেই বানিয়েছিল উদ্ধব। নিজের হাতেই সারিন্দাতে তার বেঁধেছিল। তারই শুধু বাঁধে নি, সুরও সাধত।

নিজেই গীত বাঁধত উদ্ধব, সুরও বাঁধত। ভোর হতে না হতে সারিন্দায় ছড় টানতে টানতে বেরিয়ে পড়ত। গলাটি বড় মিঠা তার। মাথাটা একপাশে হেলিয়ে সে গাইত—

যন্ত্র যদি পড়ে থাকে লক্ষ জনার মাঝে,
যন্ত্রী বিহনে যন্ত্র কেমন করে বাজে,
যন্ত্র বাজে না, বাজে না।

জিরানিয়া গ্রামে তিন শ' ঘর গৃহস্থের বাস। আর গৃহস্থদের দাক্ষিণ্যের মুঠিটি কৃপণ নয়। পুরা গ্রাম না ঘুরলেও চলে। সাত বাড়ি থেকে সাত মুঠি পেলেই অক্লেশে দিন চলে যায়। তা ছাড়া সঞ্চয়ের মোহ নেই উদ্ধবের। সাত মুঠি জুটলেই সে গ্রাম ছেড়ে নদীর পথ ধরত।

নদীর পারে খা খা শূন্য বালিয়াড়ি। বালিয়াড়ির উপর দিয়ে সারিন্দার ছড় টেনে আপন উদাস মনে গাইতে গাইতে কোন দিকে যে চলে চলে যেত, দিশা থাকত না উদ্ধবের।

কাম ক্রোধ লোভ ত্যজহ
কাঞ্চনময় হবে এ দেহ।

গীত বেঁধে, সুর সেধে, সারিন্দায় ছড় টেনে আর সাত গৃহস্থের ঘর থেকে সাত মুঠি জুটিয়ে জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারত উদ্ধব।

কিন্তু ধলেশ্বরীর মিঠান জলে আচমকা কোথা থেকে একদিন অন্ধ, উন্মাদ একটা স্রোত ছুটে এল। হিজলগাছের মিঠা ছায়ায় শান্ত, ঘুমন্ত গ্রামটা চমকে উঠল।

আগের দিন বড় গৃহস্থ মহিন্দর সোনারু ঢাকা শহরে গিয়েছিল। খবরটা সে-ই এনেছে।

ঢাকা থেকে ফিরেই গ্রামের সব গৃহস্থকে নিজের উঠানে ডেকে আনল মহিন্দর সোনারু। এমন যে বিষয়-বিমুখ উদ্ধব, যার কোন ব্যাপারেই মোহ নেই, সেও বাদ পড়ল না।

খবরটা শোনার পর থেকেই সাজ্ঘাতিক ভয় পেয়েছে মহিন্দর সোনারু। জিরানিয়া গ্রামের সবচেয় বড় গৃহস্থ সে; সমাজের মাথা। পুরাপুরি ছ'শ কানি তেফসলা জমিন রাখে মহিন্দর সোনারু।

শহর-বন্দরের খবরের জাতই ভিন্ন।

জিরানিয়া গ্রামের বাসিন্দারা কোনকালে ইতিহাস-ভূগোল পড়ে নি। পুথি-পুরাণের কড়িও তারা ধারে না।

ঢাকা শহরে গিয়ে খবরটা শুনে এসেছে মহিন্দর সোনারু। পুথি-পুরাণে ছাপার অক্ষরে নাকি খবরটা বেরিয়েছে। দেশটা ছ্খান ভাগ হয়ে গিয়েছে। সাতপুরুষের ভিটামাটি ছেড়ে, জমি-জিরাত, এই গ্রাম, আর মিঠান নদী ধলেশ্বরীর মায়া কাটিয়ে অন্য কোথায় চলে যেতে হবে।

মহিন্দর সোনারুর উঠানে ঠাসাঠাসি করে বসে ছিল মানুষগুলো। তারা ভেবেই পায় না, কেমন করে দেশটা ভাগ হয়ে গেল। যেমন বাতাস তেমনি বইছে, মাটিতে দাগ পড়ল না, নদীর জলে রেখ্ পড়ল না, তবু পুথি-পুরাণের ক'টা অক্ষরের কারসাজিতে দেশখান ভাগ হয়ে গেল! দেশ যে কেমন করে ভাগাভাগি হয়, বাপের বয়সে জিরানিয়া গ্রামের বাসিন্দারা কোনকালে শোনে নি।

এই গ্রামের মাটির সঙ্গে বত্রিশ নাড়ির যোগ। সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে এখানকার বাস উঠিয়ে চলে যেতে হবে। বড় গৃহস্থ মহিন্দরের খবরটা পুরাপুরি বিশ্বাস করতে পারল না মানুষগুলো। পুথি-পুরাণের মাত্র কয়েকটি অক্ষরের মর্জিতে জিরানিয়া গ্রামের সঙ্গে এতকালের সম্বন্ধটা চুকিয়ে চলে যেতে হবে। মন ঠিক সায় দিয়ে ওঠে না। তা ছাড়া তারা যাবেই বা কোথায়? এই গ্রামের সীমানার বাইরে যে বিপুল পৃথিবী পড়ে রয়েছে, কী-ই তার চেনে? কতটুকুই·বা তারা দেখেছে?

ঘরবসত ছেড়ে চলে যেতে হবে।

ধলেশ্বরীর পারে হিজল গাছের মিঠা ছায়ায় শান্ত, নিরুদ্বেগ জিরানিয়া গ্রামটা ভয়ে আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠল।

প্রথম প্রথম আশে পাশের গ্রামগুলিতে ভাঙন ধরল। চরবেহুলা, রসুনিয়া, গোপীগঞ্জ—নানান খান থেকে কাঠামি নৌকা ভরে ভরে মানুষগুলো চলে যেতে লাগল।

একবার ভাঙন শুরু হলে তাকে ঠেকান কি সোজা কথা! চারপাশ থেকে বেড়া আগুনের মত ভাঙন এসে পড়ল জিরানিয়া গ্রামে। প্রথম গ্রাম ছাড়ল সোনারুরা। তারপর সদগোপেরা। তারও পর যুগীরা। ধলেশ্বরীর মিঠান জলে ভেসে ভেসে ঝাঁকে ঝাঁকে নৌকার বহর কোনদিকে যে চলে যেতে লাগল, কে তার হদিস দেবে?

শেষ পর্যন্ত গ্রামের মাটি কামড়ে পড়ে ছিল উদ্ধব। কিন্তু কিসের আশায়, কার ভরসায় সে পড়ে থাকবে?

একটা মানুষও আর নেই। খা খা গ্রামটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদ্ধব। সব ব্যাপারেই সে নিস্পৃহ, উদাসীন। তবু শূন্য গ্রামটার দিকে তাকিয়ে কেন যেন উদাস থাকতে পারে না সে। নিজের অজান্তে কখন যেন চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে।

একদিন রাধামাধবের ছবিখানা, খান দুই আট হাতি ধুতি, খাটো ফতুয়া আর সারিন্দাটা একটা পুঁটুলিতে বেঁধে নৌকায় উঠল উদ্ধব। জিরানিয়া গ্রামের সঙ্গে সম্পর্কটা চিরদিনের জন্য ঘুচে গেল।

জিরানিয়া গ্রাম ছেড়ে নানান ঘাটে অঘাটে ঘুরে কলকাতায় এসে উঠল উদ্ধব।

কলকাতায় আসার পর নিদারুণ জীবন শুরু হল।

রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্‌ম। প্ল্যাটফর্‌ম থেকে ফুটপাথে, ফুটপাথ থেকে ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে মরতে লাগল উদ্ধব।

এখানে সাত গৃহস্থের ঘর থেকে সাত মুঠি মেলে না। এখানে

দাক্ষিণ্যের মুঠি বড় কৃপণ! পেটটাকে ভরাবার তাড়নায় উন্মাদ হয়ে উঠল উদ্ধব। শুধু কি উদ্ধব, হাজারে হাজারে লাখে লাখে মানুষ খাদ্যের জন্য, ক্ষুধা নামে আদিম জৈবিক দাবীটাকে ঠাণ্ডা করার জন্য না পারল হেন কাজ নেই।

আধা পশুগঠন বর্বরের যে জীবন, কলকাতায় আসার পর সেই জীবনটাকে ভোগ করেছে উদ্ধব। এক এক সময় তার ধন্দ লেগেছে, একে আদৌ জীবন বলে কি না!

জিরানিয়া গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে ন'টা বছর কাটিয়ে দিয়েছে উদ্ধব। এই নয় বছরে একটু একটু করে অদ্ভুত এক মৃত্যুর স্বাদ পেয়েছে সে। হ্যাঁ, মৃত্যু ছাড়া একে কি-ই বা বলা যায়! জীবনে সব ব্যাপারেই উদ্ধব নির্বিকার, নিরাসক্ত। তবু বাড়ির টান রয়েছে যে মাটির সঙ্গে, সেই জিরানিয়া গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক চুকল, গ্রামের মানুষগুলো ছন্নছাড়ার মত কোন দিকে ভেসে গেল। ঘর গেল, বসত গেল, আত্মবান্ধবেরা গেল। পুথি-পুরাণের কয়েকটা অক্ষরের কারসাজিতে সব গেল। সব খুইয়ে শুধুমাত্র একমুঠা খাদ্যের জন্য জানোয়ারের মত ধুঁকে ধুঁকে টিকে থাকা, আর যাই হোক, এর নাম জীবন নয়। এ মরার সামিল। ন'টা বছর বেঁচে থেকেও মরে রইল উদ্ধব।

সারিন্দাটা ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছে এই ন' বছরে। একটি পদ গান বাঁধে নি উদ্ধব; গলায় তার সুর ফোটে নি।

ন বছর পর হঠাৎ একদিন ক্যাম্পে খবর এল, আন্দামান দ্বীপে গেলে জমি-জিরাত, হাল-হালুটি, সব মিলবে। যে জীবন তারা পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীর ওপারে রেখে এসেছে, আন্দামান দ্বীপে গেলে তা ফিরে পাবে।

আশায় আশায় সকলে বুক বাঁধল। জমি পাবে, মাটি পাবে, জীবন পাবে। নতুন করে বেঁচে উঠবে। বাঁচার নেশায় অন্ধ হয়ে

কত মানুষ যে কালাপানির জাহাজে উঠল, তার লেখাজোখা নেই তাদের সঙ্গে উদ্ধবও উঠল। সে বাঁচতে চায়।

উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপে এসে তিন একর অর্থাৎ নয় বিঘা জমি পেয়েছে উদ্ধব। সারাদিন কোদালের মুখে মাটি কেটে কেটে জমি চৌরস করে। রাত্রে ট্রানজিট ক্যাম্পে ফিরে গানের আসর বসায়।

সারিন্দাটা ভেঙে গিয়েছে, সে জন্য দুঃখ নেই উদ্ধবের। আন্দামানে এসে একটা দো-তারা বানিয়ে নিয়েছে সে। দো-তারার তারে আঙুলের ঘা মেরে মেরে মিঠান গলায় সুর তোলে—

'পরবাসী নাইয়া রে-এ-এ-এ—'

পাল সাহাব উদ্ধবের গান-বাজনার সবচেয়ে বড় সমঝদার। উদ্ধবের গানের সময় দুই হাঁটুতে তাল ঠোকে সে। ঘন ঘন মাথা ঝাঁকায় আর মুখে বলে, 'বহুত আচ্ছা উস্তাদ, বহুত আচ্ছা—'

পাল সাহাবের গলা যেমন কর্কশ, তেমন বাজখাঁই। মাঝে মাঝে নিজের স্বরের মহিমা ভুলে উদ্ধবের সুরে সুর মেলাতে যায় সে, 'পরবাসী লাইয়া রে-এ-এ—'

নিজের কানেই নিজের স্বরটা কেমন যেন বেখাপ্পা শোনায়। সুর থামিয়ে পাল সাহাব বলে, 'বুঝলি উস্তাদ, গলাটা আমার বহুত নালায়েক, বদখত। শালে যেন ঘোড়ার ডাক ডাকে।'

নিজের গলার সঙ্গে ঘোড়ার ডাকের তুলনা দিয়ে খ্যা খ্যা করে হেসে ওঠে পাল সাহাব।

বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে উদ্ধব।

ধলেশ্বরী পারের যে সুর, যে গান কলকাতায় এসে হারিয়ে ফেলেছিল উদ্ধব, বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে এই দ্বীপে এসে সেই সুর সেই গান আবার ফিরে পেয়েছে সে।

এখন সন্ধ্যা।

কুয়াশা আর অন্ধকারের নীচে উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপটা তলিয়ে গিয়েছে। এখন আকাশটা আর দেখা যায় না। চারপাশের অরণ্যকে ধোঁয়ার পাহাড়ের মত মনে হয়।

সারাদিন জমি মাপ জোখ করেছে পাল সাহাব। হিসাব করে সকলকে জমি বুঝিয়ে বাঁশের টুকরা পুঁতে সীমানা ঠিক করে দিয়েছে।

সারাদিন পর মানুষগুলো ট্রানজিট ক্যাম্পে ফিরে এল। সকলের সঙ্গে সঙ্গে পাল সাহাবও এসেছে।

আজ কি তিথি কে বলবে?

কুয়াশা আর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে খানিকটা চাঁদের আলো এসে পড়েছে। সে আলোতে কিছুই স্পষ্ট নয়। এই ট্রানজিট ক্যাম্প, টিলা, চারপাশের জঙ্গল—সব কেমন যেন আবছা, রহস্যময়।

টিলার মাথায় ট্রানজিট ক্যাম্প।

টিলা বেয়ে উপর দিকে উঠতে উঠতে পাল সাহাব হাঁকল, 'এ উস্তাদ, উস্তাদ হো—'

পাল সাহাব উদ্ধবকে উস্তাদ বলে ডাকে।

সকলের পিছনে টিলা বাইছিল উদ্ধব। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পাল সাহাবের কাছে এসে পড়ল। বলল, 'এই যে পাল সাহাব—'

'হাঁ উস্তাদ; দিল চায়—'

একটু থামল পাল সাহাব। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'দিল কী চায় বল দিকি উস্তাদ?'

'কি জানি।'

ভয়ে ভয়ে পাল সাহাবের মুখের দিকে তাকাল উদ্ধব। এই রহস্যময় মানুষটাকে আদৌ বুঝতে পারে না সে। কখন কোন কথায় পাল সাহাব ক্ষেপে উঠবে, কোন কথায় খুশী হবে, আগে থেকে তার হদিস মেলে না। পাল সাহাবের চরিত্র বড় দুর্জ্ঞেয়। তাই সব সময় উদ্ধব তটস্থ হয়ে থাকে। মাপ জোখ করে তার কথার জবাব দেয়।

পাল সাহাব আবার বলল, 'আমার দিল কী চায় উস্তাদ ?'

এবার জবাব দিল না উদ্ধব। পাল সাহাবের মুখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

পাল সাহাব উদ্ধবের পিঠে একটা হাত রেখে সস্নেহে বলল, 'নালায়েক, বুদ্ধু, এতরোজ আমার সাথ থেকেও দিলের কথাটা বুঝতে পার না উস্তাদ! দিলের কথা না বুঝলে দোস্ত বনবে কেমন করে ?'

কিছু বুঝে, কিছু না বুঝে উদ্ধব বলল, 'হু।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

যে মানুষগুলো জমির ভাগ নিতে গিয়েছিল, তারা ট্রানজিট ক্যাম্পের ঝুপড়িগুলোর ভিতর ঢুকে পড়েছে।

পাল সাহাব বলল, 'এ উস্তাদ, দিল চায় একটু গান-বাজনা হোক।'

অবাক হয়ে পাল সাহাবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে উদ্ধব। এই মানুষটা সম্বন্ধে ভেবে ভেবে থই পায় না সে।

সারাদিন অসুরের মত খেটেছে। এক হাতে জমি মেপেছে, আর এক হাতে বাঁশ পুঁতে সীমানা ঠিক করেছে। আজ সমস্ত জমি ভাগ বাটোয়ারা করে দিয়েছে পাল সাহাব। উদ্ধব ভাবতে চেষ্টা করল, হাজার খেটেও কি পাল সাহাবের ক্লান্তি আসে না ? সারাদিন খাটুনির পর যখন চোখ দুটো আপনা থেকেই বুঁজে আসে, আপনা থেকেই ঢুলুনি লাগে, শরীরটা আর বশে থাকতে

চায় না, তখনও গান-বাজনা করার মত উদ্যম কোথায় পায় পাল সাহাব

প্রাণশক্তি । সাহাবের। অদম্য তার উৎসাহ।

পাল সাহাবের প্রাণশক্তি হাজার অপচয় করেও ফুরায় না। আজকের উদ্ধব জানে না, কিন্তু বহুকাল পরের আর এক উদ্ধব জেনেছিল, পাল সাহাবের দৌলতেই নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে সে। শুধু সে-ই না, এখানে যারা উপনিবেশ গড়তে এসেছে পাল সাহাবের কল্যাণে তারা সকলেই বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে। উত্তর আন্দামানের এই নিদারুণ দ্বীপে নতুন করে বেঁচে উঠেছে।

পাল সাহাব এবার তাড়া লাগায়, 'যাও উস্তাদ, গান-বাজনার ইন্তেজাম কর। জলদি উস্তাদ—'

ঝুপড়ি থেকে দো-তারাটা নিয়ে এল উদ্ধব।

ট্রানজিট ক্যাম্পের সামনে খানিকটা সমতল ঘাসের জমি। সেখানে পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল উদ্ধব আর পাল সাহাব।

দো-তারার তারে মৃদু মৃদু ঘা মারে উদ্ধব। টুং টাং করে সুর ফোটে।

দুই হাঁটুর উপর চাপড় মেরে মেরে তাল দেয় পাল সাহাব। দো-তারার বাজনা যখন জমে ওঠে, তখন বলে, 'লাগাও উস্তাদ, গানা লাগাও—'

দো-তারার শব্দ পেয়ে ঝুপড়িগুলোর ভিতর থেকে হারাণ, রসিক শীল আর বুড়ী বাসিনী বেরিয়ে এসেছে। সরাসরি পাল সাহাব আর উদ্ধবের গা ঘেঁষে বসে পড়েছে।

পাল সাহাব অস্থির হয়ে উঠল, 'লাগাও উস্তাদ—'

উদ্ধব মিঠান সুরে গান ধরল,

গোরানাম লইতে অলস
ক'রো না রসনা,
যা হবার তাই হবে।

ভবের তরঙ্গ বেড়েছে
বলে কি
ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে ?

পাল সাহাব সায় দেয়, 'ঠিক ঠিক, বড় সাচ্চা বাত বলেছ উস্তাদ, ঢেউ দেখলেই কি নাও ডুবাতে হয় ?'

উদ্ধব উত্তর দেয় না। গানের শেষ পদটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, নানান তালে নানান সুরে গাইতে থাকে, 'ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে ?'

হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসল পাল সাহাব। উদ্ধবের মুখে হাত চাপা দিয়ে গান থামিয়ে দিল। বলল, 'এট্টু থাম উস্তাদ, আগে শালে লোগদের ডেকে আনি। তাদের তুমি সমঝিয়ে দাও। শালেরা মুখ বেজার করে থাকে, খালি কাঁদে। আরে নালায়েক বুদ্ধুর দল, ডরের কি আছে! এক জিন্দগী তুড়ে গেছে, যাক। এই দ্বীপে জমিন পেয়েছিস। নয়া জমানা, নয়া জিন্দগী বানা।'

পাল সাহাব ট্রানজিট ক্যাম্পটার দিকে ছুটল। ঝুপড়িগুলোর সামনে এসে চিল্লাতে লাগল, 'এ শালে লোগ, এ কুত্তার দল বেরিয়ে আয়।'

পাল সাহাবের চিল্লাচিল্লিতে ক্যাম্প থেকে সবাই বেরিয়ে এসেছে। সকলকে সঙ্গে নিয়ে উদ্ধবরা যেখানে বসে আছে, সেখানে এসে পড়ল পাল সাহাব। বলল, 'গাও উস্তাদ, তোমার সেই গানটা এবার শুরু কর। শালে লোগদের বুঝিয়ে দাও, জিন্দগীতে বহুত ভারী ভারী তুফান আসে। তুফান দেখেই যারা নাও ডুবিয়ে দেয়, তারা মানুষ না।'

গলার স্বরটা গাঢ় শোনায় পাল সাহাবের। অনেক কথাই সে বলে যায়। জীবনে কত তুফান আসে, ঘর বসত, সাধ-বাসনা কত বার ভেঙে যায়, তাই বলে কি হতাশ হলে চলে ? কোন ব্যাপারে কোন আপসোস নেই। বিমুখ, প্রতিকূল অবস্থা থেকে সব বাধা,

সব হতাশা ভেঙেচুরে ওঠার নামই তো জীবন। এই কথাগুলিই নিজের ভাষায়, নিজের নিয়মে বলে যায় পাল সাহাব।

উদ্ধব আবার গান ধরে।

ভবের তরঙ্গ বেড়েছে
বলে কি,
ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে ?

উদ্ধবকে দিয়ে বার বার গানটা গাওয়ায় পাল সাহাব। গানটা তার মনে বড় ধরেছে।

এগার

চার পাশে নোনা জল, মাঝখানে মিঠে মাটি।

মাপজোখ করে সেই মাটি সকলকে ভাগ করে দিয়েছে পাল সাহাব। বাঁশের ছোট ছোট টুকরা পুঁতে সীমানা ঠিক করে দিয়েছে।

দু পাশে উঁচু উঁচু পাহাড়। মাঝখানটা সমতল। মানুষের জন্য জঙ্গল সাফ করে এই দ্বীপের কাছ থেকে মাটি আদায় করা হয়েছে।

পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী পারের মাটি হারিয়ে এসেছে মানুষগুলো। বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপে আবার তারা মাটি পেল।

নিঃস্ব, নিভূর্ম, দুঃখী মানুষগুলো মাটি পেয়েছে।

জমি বাটোয়ারা করতে করতে পাল সাহাব বলেছিল, 'জমিন দিলাম। শালে লোক এবার নয়া জিন্দগী, নয়া জমানা বানা।'

বলতে বলতে স্বপ্নাতুর হয়ে উঠেছে পাল সাহাব। তার চোখ দুটো উঁচু উঁচু পাহাড় পেরিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। গাঢ়, অদ্ভুত গলায় সে বলেছে, 'এখানে গাঁও বসাবি, ধান মলবি, দেওয়ালে ঘিউ দিয়ে বসুধারা আঁকবি...'

মানুষগুলো জবাব দেয় নি। শুধু মাথা নেড়ে সায় দিয়েছে।

নতুন বসতের আশায় সমুদ্র পেরিয়ে যারা এখানে এসেছে, তাদের কেউ বারুজীবী, কেউ সোনারু, কেউ কাহার, কেউ কুমার, কেউ জোলা, কেউ মালো, কেউ যুগী, কেউ কামার, আবার কেউ সদগোপ। কিন্তু এ সবই তাদের বিগত জীবনের পরিচয়। সে জীবন তারা পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীর পারে পারে হারিয়ে এসেছে।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপ মানুষগুলোর অতীত পরিচয় ঘুচিয়ে দিয়েছে। এখানে কেউ আর কাহার-কুমার-সদগোপ কি যুগী নয়; এখানে সকলের একটা মাত্র পরিচয় একটা মাত্র বৃত্তি। মাটি পেয়ে সকলেই এখানে কৃষাণ হয়ে গিয়েছে।

কৃষির দৌলতেই পৃথিবীর আদিম, যাযাবর মানুষ প্রথম গৃহী হয়েছিল। কৃষির কল্যাণেই সভ্যতার স্বাদ পেয়েছিল।

হাজার মাইল বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে যারা এই দ্বীপে এসেছে, একদিন তারাও গৃহস্থ ছিল। তাদের নিরাপদ, নিশ্চিন্ত, সভ্য একটা জীবন ছিল। কি না ছিল তাদের! মাটি ছিল, ঘর ছিল, গান ছিল, জীবন ছিল।

পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীপারের মাটি মরশুমে মরশুমে ফসলের লাবণ্যে ভরে উঠত। দূর থেকে ফসলের ক্ষেত দেখে মনে হত, কেউ যেন পরম আদরে একখানা নক্সিকাটা আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে।

ফসল ওঠার পর আসত ঢপের দল; জারি সারি লীলাপালার দল। গানে গানে নদীতীরের গ্রাম মাতোয়ারা হয়ে উঠত। গাথকেরা বড় দরদ দিয়ে পিরীতের গীত গাইত ঃ

'ও সজনী, প্রাণ সজনী, মুখ তুলিয়া চায়।

ভরা দেহের গাঙ্গে লো সই, সাধের জোয়ার যায়।'

জীবনে রঙ ছিল, রস ছিল।

ঘরে পায়ে মল, কানে বনফুল—ছোট এক বউ ছিল। তার কোলজোড়া শিশু ছিল, বুকভরা সুধা ছিল, মন পিরীতিতে ভরপুর ছিল।

ছোট একটি ঘর ছিল। তকতকে নিকানো আঙিনায় জাম গাছের ছায়া ছিল। ঘুঘুর ডাক ছিল। মাটির দেওয়ালে বসুধারা আঁকা ছিল। গৃহপালিত জীবনটিকে ঘিরে স্বপ্ন উচ্ছ্বসিত হয়ে ছিল। আহা, যেদিকে তাকানো যায়, সুধা যেন উছলে উছলে পড়ত।

কিন্তু কি বিড়ম্বনা!

কোথায় কোন হিল্লি দিল্লীতে কাগজে কলমে কারসাজি হল। পুথি পুস্তকে কোথায় যেন রেখ্ পড়ল। পুথি পুস্তকেই শুধু রেখ্ পড়ল না, সেই রেখ্ মাটিতেও পড়ল।

ভূগোলের কোলাহল থেকে অনেক, অনেক দূরে পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীপারের সেই নিরুদ্বেগ, শান্ত গ্রামগুলি। সেই সব গ্রামের মানুষ পুথি পুস্তকের কড়ি ধারে না। নিজেদের ছোট জীবন, ছোট সাধ আর অপরিমেয় সুখে তারা বিভোর হয়ে ছিল। তারা বুঝল না, কিন্তু শুনল, দেশখান নাকি দুভাগ হয়ে গিয়েছে।

তাদের সাধের ঘর ভেঙে গেল।

পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীপারের সেই গ্রামগুলি, সেই জীবন, সাত পুরুষের ঘর-ভদ্রাসন কোথায় পড়ে রইল! সুখী, গৃহী মানুষগুলি যাযাবর হয়ে পৃথিবীর আদিম পরিচয়ে ফিরে গেল।

কি নিদারুণ বিড়ম্বনা!

এই সভ্যতা পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীপারের গৃহস্থ মানুষগুলোকে কত হাজার বছর পর আবার যাযাবর করে দিল।

উত্তর আন্দামানের জঙ্গলের তলা থেকে মুখ তুলেছে কুমারী মাটি।

নিঃস্ব, যাযাবর মানুষগুলি এই দ্বীপে আবার মাটি পেয়েছে। পায়ের নীচে আশ্রয় পেয়ে মাথা তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে!

হাল-হালুটি, লাঙ্গল-বলদ এখনও আসে নি। পাল সাহাব সবাইকে একটা করে কোদাল দিয়েছে। কোদাল নিয়ে সকলে জমিতে নেমে পড়েছে। মাটি কোপাচ্ছে। জমি চৌরস করছে।

পাল সাহাব এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। পাগলা বুঝি স্বপ্নই দেখছে।

অরণ্যের তলায় যে মাটি বন্দিনী হয়ে ছিল, সে মাটি তো কুমারী। মানুষের ভোগের জন্য তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। লোহার কোদালের কোপ পড়ছে তার গায়ে। এই দ্বীপের কুমারী মাটি এই প্রথম মানুষের স্পর্শ, পুরুষের স্পর্শ পাচ্ছে।

পাগলা পাল সাহাব ভাবছে, একদিন হাল লাঙ্গল আসবে। লাঙ্গলের ধারাল ফলায় ফলায় মাটি তৈরী হয়ে যাবে। একদিন অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামবে। একদিন নরম মাটি বীজদানা পেয়ে গর্ভিণী হয়ে উঠবে। তারপরও আর একদিন আছে, যেদিন মাটি ফসলবতী পুলকময়ী হবে।

এক কিনারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাগলা পাল সাহাব সেই স্বপ্নই দেখে। দেখে দেখে সাধ আর মেটে না।

বার

এতকাল এই মাটির উপর অরণ্য চেপে বসে ছিল। পরম নিশ্চিন্তে সে তার সংসার বাড়িয়েই যাচ্ছিল। তার অধিকারে হাত দেবার মত দ্বিতীয় কোন দাবীদার এই দ্বীপে ছিল না।

উত্তর আন্দামানের এই জটিল অরণ্য !

তার ভিতরে মানুষের নজর পৌঁছায় না। পৃথিবীর আদিম অন্ধকারকে নিজের মধ্যে ধরে রেখে নির্বিঘ্নে তার সময় কেটে যাচ্ছিল।

কিন্তু এই দ্বীপে মানুষ এসেছে। মানুষের প্রয়োজন এসেছে।

মানুষের প্রয়োজনের জন্য করাতের মুখে, আগুনের মুখে অরণ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। মাটির উপর এক আস্তর অঙ্গার ছড়িয়ে রয়েছে।

অঙ্গারের স্তূপের নীচে আছে মাটি। কিন্তু সে মাটিও আসল নয়। কোদাল কি লাঙ্গলের ফলায় একটা পরল তুলে ফেলার পর যে মাটি মেলে, সেই মাটিই জন্ম দেয়। সেই মাটি বীজদানার বুকে প্রাণ আনে, প্রাণের ভারে সে গরবিনী হয়ে ওঠে। সেই মাটির খোঁজেই মানুষগুলো জমিতে নেমে পড়েছে।

উদ্ধব বৈরাগী, রসিক শীল, চন্দ্র জয়ধর—বুড়া-যুবা, সকলেই কোদালের মুখে মুখে পরল পরল মাটি তুলছে। শুধু কি পুরুষ মানুষরাই এসেছে, ঘরের বউ-ঝিরাও জমিতে এসে নেমেছে।

হরিপদ বারুইর বুকে টানের দোষ ; নড়াচড়া করলেই ব্যথাটা

বাড়ে। তাই তার বউ তিলি এসেছে। শুধু কি তিলি? হিম্মি, ক্ষিরি, সারী, কাপাসী, বুড়ী বাসিনী—আরো কত জন এসেছে, কে তার হিসাব রাখে?

যে সব ঘরের বাপ-ভাই-সোয়ামী অক্ষম, অপারগ, নিত্য দিন ব্যারামে ভোগে, সেই সব ঘরের বউ-ঝিদের জমিতে না নেমে উপায় কী? বিশেষ এই আন্দামান দ্বীপে!

পাগলা পাল সাহাব যেন ঘোরের মধ্যে ছুটছে। মাটি কোপাতে কোপাতে তিলি হয়ত হয়রাণ হয়ে পড়েছে। ছোঁ মেরে তার কোদালখান ছিনিয়ে খানিকটা কুপিয়ে দিচ্ছে। পোড়া অঙ্গারের স্তূপ সরাতে সরাতে বুড়ো রসিক শীলের হয়ত জিভ বেরিয়ে পড়েছে। ছুটে গিয়ে পাল সাহাব অঙ্গার সরিয়ে আসছে।

এক মাথা থেকে আর এক মাথায় ছুটে বেড়াচ্ছে পাল সাহাব। এর মাটি কুপিয়ে দিচ্ছে, ওর অঙ্গার সরিয়ে দিচ্ছে, তার কোদালের আছাড়ি পরিয়ে দিচ্ছে।

পাল সাহাবের উপর বিচিত্র এক নেশা যেন ভর করেছে। ঠিক নেশা নয়, পাগলার প্রাণের মধ্যে কোথায় যেন উৎসব শুরু হয়েছে। পাল সাহাব দেখতে পাচ্ছে, প্রাণেই শুধু নয়, উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপ জুড়ে জীবনের উৎসব শুরু হয়েছে।

অসহ্য আনন্দে দিশাহারা হয়েই বুঝি পাগলা পাল সাহাব ছুটে বেড়ায়।

এখন বেলা কত, কে তার হদিস দেবে?

আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বেলার বয়স বোঝার জো নেই। তা ছাড়া বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে যারা নয়া বসতের

আশায় আশায় এসে পড়েছে, এমনিতেই তারা সময়ের কড়ি ধারে না।

মাথার উপর আকাশের বিরাট টুকরাটা জ্বলছে। এক ঝাঁক সাগরপাখি উড়তে উড়তে বুঝি বা এরিয়াল উপসাগরের দিকেই চলে গেল।

সবার শেষে জমিতে এল হারাণ।

একটু পরেই সূর্যটা দ্বীপের মাথায় এসে পৌঁছুবে।

হারাণ এসে দেখল, জমি কোপানো চলছে। কোদালের মুখে মুখে পরল পরল মাটি উঠছে।

উত্তর দিকে পাহাড় ঘেঁষে হারাণের জমি। সেদিক থেকেই ডাকটা আসছে, 'এ শালে হারাণ, এ কুত্তা, লবারকা বাচ্চা, ইধর আয়।'

খিস্তির নমুনাতেই বোঝা গেল, পাল সাহাব।

দৌড়তে দৌড়তে নিজের জমিতে এসে পড়ল হারাণ।

পাল সাহাব হারাণের জমি কোপাচ্ছিল। কপালে, মুখে, হাতে পায়ে, সারা দেহে মাটি-মাখা। কামিজ আর প্যান্টে, মাথার ফেল্ট হ্যাটে, রোমশ বুকে, পিঙ্গল রঙের এক মুখ দাড়িতে ডেলা ডেলা মাটি লেগে রয়েছে। ঘামে ভিজে সেই মাটি লেপটে গিয়েছে। কি অদ্ভুতই না দেখেছে পাল সাহাবকে!

মুখখান কাচুমাচু করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে হারাণ।

'কুত্তা এত দেরী করলি যে? সব আদমী এক পর্দা মিট্টি তুলে ফেলল—'

একটু থেমে এক মুহূর্ত কি যেন ভেবে নিল পাল সাহাব। তারপর খেঁকিয়ে উঠল, 'শালে শোন, এই দ্বীপ আমার এলাকা। এখানে লবাবী চলবে না। রোজ সুবেতে (সকালে) জমিন কোপাতে না এলে পিটিয়ে পাছার হাড্ডি ঢিলা করে দেব। হাঁ, কথাটা ইয়াদ রাখিস্।'

হারাণের জমি থেকে উঠে এল পাল সাহাব।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে হারাণ। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে যে মানুষটার হাতে তাদের মরা বাঁচা নির্ভর, সেই পাল সাহাব নিজে তার জমি কুপিয়ে দিয়েছে। এ লজ্জা কোথায় রাখবে হারাণ? মাথা তুলে সে পাল সাহাবের দিকে তাকাতেই পারছে না।

কাঁপা ভীরু গলায় এক সময় হারাণ বলল, 'আপনে আমার জমিন কুপাইলেন (কোপালেন) ক্যান? আমার কত অপরাধ হইল!'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ হারাণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল পাল-সাহাব। তারপর বলল, 'দিল হল তাই তোর মিট্টি কুপিয়ে দিলাম। সবার জমিন কোপানো হচ্ছে, খালি তোরটাই বাদ পড়ে থাকবে?'

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল পাল সাহাব। হঠাৎই স্বপ্নাতুর হয়ে উঠল সে। আকাশের ওপারে কোথায় যেন দৃষ্টিটাকে হারিয়ে ফেলল। এই দ্বীপের নতুন মানুষ আর অরণ্যের তলা থেকে মুখ তোলা নতুন মাটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মাঝে মাঝেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে পাল সাহাব।

এখন, এই মধ্য দুপুরে সূর্যটা যখন সরাসরি দ্বীপের মাথায় এসে উঠেছে, পাগলা পাল সাহাব সেই স্বপ্নটাই দেখতে লাগল। অনুচ্চ ফিস ফিস স্বরে সে বলল, 'এই দ্বীপে তোরা এক সাথ এসেছিস। এক সাথ তোদের জমিন ভাগ করে দিয়েছি। এক সাথ তোরা মিট্টি কোপাবি, ফসল ফলাবি। কেউ আগে না, কেউ পিছে না। সবাই এক সাথ। কেউ পিছে পড়লে আমি তার কাম করে দেব।'

পাল সাহাব আবার থেমে গেল।

আস্তে আস্তে হারাণ ডাকল, 'পাল সাহাব—'

পাল সাহাবের হুঁশ নেই। উঁচু উঁচু পাহাড়ের ওপারে কোথায় যেন সেই স্বপ্নটাই দেখছে সে। সেই স্বপ্নটার মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে

আছে। এই মুহূর্তে পাল সাহাবকে ঠিক বোঝা যায় না। সে এখন দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য, অনেক দূরের এক মানুষ।

ভয়ে ভয়ে হারাণ আবার ডাকল, 'পাল সাহাব—'

'হাঁ—'

একটু আগের ঘোরটা কেটে গেল পাল সাহাবের। হুঁশ ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে সে খেঁকিয়ে উঠল, 'এ কুত্তা, আমার মুখের দিকে চেয়ে কী দেখছিস! যা শালে, আপনা কাম কর—'

হারাণের ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে জমিতে নামিয়ে দিল পাল সাহাব। তার পর পশ্চিম দিকে তিনখানা জমি বাঁয়ে রেখে বুড়ো রামকেশবের জমির দিকে ছুটল।

মাটিতে কোপ মেরেই হারাণ চমকে উঠল। কোদালের মুখে মাটির যে পরলটি উঠল, তার নীচে সরুমোটা কত যে শিকড় রয়েছে, লেখাজোখা নেই।

সরকারী বনবিভাগের লোকেরা মাটির উপরের জঙ্গল সাফ করে গিয়েছিল। কিন্তু অরণ্যকে নির্মূল করা এতই সহজ! মাটির নীচে কত কাল ধরে হাজার হাজার শিকড় নামিয়ে অরণ্য তার দখল কায়েম করে রেখেছে। শুধু কি শিকড়, মাটির গর্ভে হাওয়াই বুটি, জলডেঙ্গুয়া, ইকড় ঘাস, কড়ুই ঘাস, প্যাডক-দিহু-চুগলুম গাছের কত বীজ যে জমা রয়েছে, কে তার হিসাব কষে? আর এই সব বীজ আর শিকড়ের মধ্যেই রয়েছে নতুন অরণ্যের সম্ভাবনা।

প্রাণপাত করে জমি কুপিয়ে চলেছে হারাণ। মাটির সঙ্গে টুকরা টুকরা শিকড় উঠছে।

এই দ্বীপের মাটি কি বাহারের! এক ডেলা মাটি হাতে তুলে চাপ দিলে গুঁড়া গুঁড়া ঝুরা ঝুরা হয়ে যায়। কিন্তু সেই মাটিকে অরণ্যের থাবা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সোজা ব্যাপার নয়।

এতকাল অরণ্য এই দ্বীপের মাটি ভোগ করেছে। এখন মানুষ এসেছে, তার প্রয়োজন এসেছে। কোদালের মুখে মুখে অরণ্য মাটির দাবী ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। নতুন করে বাঁচার জন্য এই মানুষগুলোর যে মাটি চাই।

সমানে জমি কোপাচ্ছে হারাণ। সারা গায়ে মাটি আর অঙ্গার মাখামাখি হয়ে রয়েছে।

বনবিভাগের লোকেরা জঙ্গল পুড়িয়ে গিয়েছিল। পুরা জঙ্গল পোড়ানো হয় নি। মাঝে মাঝে হাওয়াই বুটি আর জলডেঙ্গুয়ার ঝোপ রয়েছে।

হারাণ এক একবার আগাছার জঙ্গল সাফ করছে, আবার মাটি কোপাচ্ছে।

পিছল মাটি থেকে কত যে জোঁক বেয়ে বেয়ে গায়ে উঠছে, এক একসময় খেয়াল থাকে না হারাণের। যখন খেয়াল হয়, দা দিয়ে জোঁকগুলোকে চেঁছে ফেলে। যেগুলি অলক্ষ্যে থেকে যায়, রক্ত শুষে শুষে কচি তেলাকুচের মত ফুলে আপনা থেকেই খসে পড়ে।

বেলা এখন ঢলে পড়েছে। রোদের তেজ মরে আসতে শুরু করেছে।

কোদালটা নামিয়ে রেখে একবার পিছন দিকে তাকাল হারাণ। আজ বেশ খানিকটা জমি কোপানো হয়েছে। কিন্তু আরো অনেক-টাই বাকী পড়ে আছে। পুরা জমি কোপাতে কত দিন লাগবে, কে জানে?

এবার অন্য দিকে তাকাল হারাণ। চারপাশের জমিগুলোতে কাজ চলেছে। কেউ মাটি কোপাচ্ছে, কেউ বনতুলসীর ঝোপ সাফ করছে, আবার কেউ কেউ একটু জিরিয়ে নিচ্ছে।

হারাণের চোখ দুটো ঘুরতে ঘুরতে পাশের জমিতে এসে পড়ল।

মাঝখানে বাঁশের টুকরা পুঁতে সীমানা ঠিক করে দিয়েছে পাল সাহাব। বাঁশের খুঁটির ওপারে নিত্য ঢালীর জমি।

নিত্য ঢালী জমি কোপাতে আসে নি। এসেছে কাপাসী।

কাপাসী মাটিতে দু চার কোপ বসায় আর হাঁপায়। হাঁপায় আর কাঁদে। কাঁদে, কিন্তু শব্দ হয় না। চোখ বেয়ে লোনা জলের যে ধারা নামে, হাতের পিঠ দিয়ে তা মুছে ফেলে কাপাসী।

হারাণ তাজ্জব হয়ে গিয়েছে। যে কাপাসীর হাসি কি কান্না তীব্র, অবোধ এবং অবুঝ, আশ্চর্য, তার কান্নায় এখন শব্দ নেই।

একদৃষ্টে অনেকক্ষণ কাপাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল হারাণ। তারপর এদিক সেদিক দেখে কাপাসীর জমিতে এসে উঠল।

খুব আস্তে হারাণ ডাকল, 'কাপাসী—'

'কে ?'

কাপাসী চমকে উঠল।

'ডর নাই, আমি হারাণ।' একটু থেমে কি যেন ভেবে নিল হারাণ। বলল, 'কান্দো (কাঁদো) ক্যান ?'

'কোথায় কান্দি (কাঁদি) ? কান্দি না তো।'

'এই যে দেখলাম। অখনও তো তোমার চোখ ভিজা।'

'ভুল, ভুল দেখেছ পুরুষ।'

ভিজা চোখদুটো ডলে ডলে শুকিয়ে ফেলে কাপাসী। তারপর শব্দ করে অদ্ভুত হাসে। বলে, 'কই, কান্দি (কাঁদি) না। এই তো হাসি।'

হেসে হেসে ঢলে পড়ে কাপাসী। হাসির দমকে দেহটা ধনুকের মত বেঁকে যায়। সর্বাঙ্গ দিয়ে অস্বাভাবিক, অবুঝ হাসছে মেয়েটা

অবাক তাকিয়ে থাকে হারাণ। কাপাসীর হাসির এই তীব্র, বিচিত্র শব্দটা যখনই সে শোনে, তখনই অদ্ভুত এক ভয় তাকে ঘিরে ধরে।

এক সময় কাপাসীর হাসি থামে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হারাণ হঠাৎ বলে, 'তুমি জমিন কুপাইতে আসছ যে, নিত্য তালুই আসে নাই?'

হারাণ নিত্য ঢালীকে তালুই ডাকে।

কাপাসী বলল, 'না, বাবায় আসে নাই। শূলের ব্যথাটা বাড়ছে। তাই আমি জমিন কুপাইতে আসছি।'

মাঝে মাঝে সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষের মত কথা বলে কাপাসী। তখন আশায় বুক বাঁধে হারাণ। খুশিতে, আনন্দে চোখ দুটো চক চক করে। হারাণ নিজের মনকে বুঝ মানায়, আর দশ জনের মত কাপাসী আবার সুস্থ হবে, স্বাভাবিক হবে। তাকে ঘিরে জীবনের সুন্দর সাধটাকে মিটিয়ে নেবে সে।

কাপাসীকে ঘিরে হারাণের বুকে কত আশা, কত সাধ।

কাপাসী বলতে থাকে, 'বাপ শূলের ব্যথায় কাতর। আমি জমিন কুপাইতে আসলাম। জমিন না কুপাইলে ফসল ফলামু কেমনে? খামু কী?'

আর কথা বাড়ায় না কাপাসী। কোদালটা তুলে মাটিতে কোপ বসায়।

হারাণ খালি চেয়ে চেয়ে দেখে। মেয়েমানুষের হাতে কত শক্তিই বা ধরে! কোদালের ফলা মাটির নীচে ঢোকে না। মাটির উপর আঁচড় বসায় মাত্র।

হারাণ হাসে। বলে, 'এই কোপের কাম না কাপাসী। পরল পরল মাটি তুইলা জমিনেরে উথাল পাথাল, উলট পালট কইর‍্যা ফেলতে হইব। তবে না মাটি চাষের যুগ্য হইব। তবে না মাটি ফসলের জন্ম দিব।'

একটু দম নিয়ে আবার শুরু করে, 'কোদালখান আমারে দাও, আমি জমিন কুপাইয়া দি।'

'না।'

কাপাসীর শান্ত গলায় একটি মাত্র শব্দ ফোটে।

হারাণ জোরাজোরি করে, 'দাওই না কোদালখান।'

'না, তুমি তোমার জমিনে যাও।'

বলে আর মাটি কোপায় কাপাসী।

হারাণ বলে, 'যা কোপ মার, তাতে কোন কালে জমিন চৌরস হইব না কাপাসী।'

'দেখ পুরুষ, তা হইলে লয়ন ভইর‍্যা দেখ; কেমন কোপ মারি!'

জোরে, আরো জোরে কোপ বসায় কাপাসী। এবার কোদালের ফলা পরল পরল মাটি তুলতে থাকে।

মাটি কোপাতে কোপাতে তীব্র, অবুঝ গলায় হেসে ওঠে কাপাসী। হাসির দাপটে দেহটা বেঁকে চুরে তুমড়ে যায়।

বড় দুঃখের ছাপ পড়ে হারাণের মুখে। অবোধ এক ব্যথা তাকে ছেয়ে ফেলে।

একটু আগে স্বাভাবিক, ভাল মানুষের মত কথা বলছিল কাপাসী। এই মুহূর্তে সেই অদ্ভুত। হাসিটার মধ্য দিয়ে আবার ভয়ানক অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে।

হারাণের মনে হল, ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। যে কান্নাটা গলার ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে পড়তে চাইছে, অতি কষ্টে তাকে বাগ মানালো হারাণ।

কাপাসী সমানে হাসছে। সারা দেহ লুটিয়ে লুটিয়ে, ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে, চারপাশে চমক দিয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ, ভীষণ হাসি হাসছে।

পশ্চিম দিকের পাহাড় ঘেঁষে বুড়ো রসিক শীলের জমি। তার মাটি কুপিয়ে দিচ্ছিল পাল সাহাব। হাসির শব্দে সে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। ফেল্ট হ্যাটটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল; সেটাকে ঠিক করে মাথার উপর বসাল। তার বিরক্ত মুখে কতকগুলি ভাঁজ পড়ল। রোমশ ভুরু দুটো কুঁচকে গেল।

হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল পাল সাহাব, 'কৌন, কৌন হাসতা? শালের জান লে লেগা।'

পাশ থেকে কে যেন বলল, 'কাপাসী হাসে সাহেব বাবা, নিত্য ঢালীর মেয়ে কাপাসী।'

হাতের কোদালটা ছুঁড়ে ফেলে দৌড়তে দৌড়তে কাপাসীর জমিতে এসে পড়ল পাল সাহাব। হাঁপাতে হাঁপাতে হুমকে উঠল, 'এই মাগী, হাসো মাত। হাসবি না শালী। তোর হাসি শুনলে আমার মেজাজ বিগড়ে যায়।'

হাসিটা তুমুল হয়ে উঠল কাপাসীর। হাসির দাপটে দেহটা একবার ধনুকের মত বেঁকে যায়, আবার সঙ্গে সঙ্গে টান টান খাড়া হয়ে পড়ে। হাসতে হাসতে সে বলে, 'আঁই ড্যাকরা, আঁই পাল সাহাব, আমার হাসন থামাইতে চাস?'

'হাঁ শালী, এখানে এ্যায়সা হাসি চলবে না।'

'হাসন তো থামাইতে চাস! আরে সোনা, আমার হাসন কি তোর বশে?'

পাল সাহাব গর্জে ওঠে, 'চোপ্ শালী—'

হাসিটা বাড়তেই থাকে কাপাসীর। সে বলে, 'ধমক দিয়া আমার হাসন থামাইতে পারবি না। আমার হাসন তোর বশে না, আমার বশে না, এই পিরথিমীর কোন মনিষ্যের বশে না।'

এবার আর কথা বলে না পাল সাহাব। একদৃষ্টে কাপাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন বুঝতে চেষ্টা করে।

কাপাসী হাসে আর বলে। তার গলাটা বড় করুণ শোনায়, 'ভগমান জন্মের সময় কপালে যা লিখছিল, তা কি মিছা হয় পাল সাহাব? হাসতে হাসতেই আমার পরাণ যাইব।'

পাল সাহাব মুখটা অন্য দিকে ঘোরায়। কি যে সে ভাবে, সে-ই জানে।

অনেকটা সময় কাটে।

হঠাৎ পাল সাহাবের নজরে পড়ে, কাপাসীর জমির এক কোণায় হারাণ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পাল সাহাব ক্ষেপে উঠল, 'এই শালা, এখানে কি করছিস ?'

হারাণ থতমত খেল। কাঁপা গলায় বলল, 'কাপাসী জমিন কুপাইতে পারে না। দুই চার কোপ দিয়াই হাঁপায়, হয়রাণ হইয়া পড়ে। তাই—'

'তাই কি রে শালে ?'

পাল সাহাব মুখিয়ে উঠল।

মাথাটা নামিয়ে আস্তে আস্তে হারাণ বলল, 'তাই ওর জমিনটা কুপাইয়া দিতে আসছিলাম।'

'হারামী, নালায়েক কাঁহাকা! রসিক শীলের জমিন থেকে আমি দেখছি, কতক্ষণ ধরে শালে তুই কাপাসীর কাছে ঘুরঘুর করছিস! আওরতের গায়ের গন্ধ না পেলে দিলে ফুর্তি লাগে না! যাও কুত্তা, আপনা কাম কর। আপনা জমিন বানাও।'

মুখখান কাচুমাচু করে নিজের জমিতে গিয়ে নামল হারাণ।

আর কাপাসীর হাসি আরো তীব্র হতে লাগল। শরীরটা বাঁকিয়ে চুরিয়ে হাসতে হাসতে সে বলল, 'আমার উপকারী বন্ধু, জমিন কুপাইয়া দিতে চায়! ঠিক করছিস পাল সাহাব, ওরে খেদাইয়া দিছিস। অত উপকার আমার সইব না। হিঃ—হিঃ—হিঃ—'

সন্ধ্যের আগে আগে কাজ বন্ধ করে দিল পাল সাহাব।

আজকের মত মাটি কোপানো, জমি চৌরস করা কি জঙ্গল সাফ করা শেষ হল।

এখন সূর্যটাকে আকাশের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আকাশটা জঙ্গলের ওপারে যেখানে ধনুরেখায় নেমে গিয়েছে, এক ঝাঁক সিন্ধুশকুন সেদিকে উড়ে গেল।

সবাইকে নিয়ে পাল সাহাব রওনা হল।

গোটা পাঁচেক টিলা, অনেকগুলো চড়াই-উতরাই আর ছোট পাহাড়ী নদী কিলপঙ পেরিয়ে ট্রানজিট ক্যাম্প। পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে।

জমি কোপাতে কোপাতে সেই যে হাসতে শুরু করেছিল কাপাসী, সে হাসি এখনও থামে নি। চারপাশের অরণ্য এবং পাহাড়গুলিকে চমক দিয়ে হাসতে হাসতে সে চলেছে।

সবার আগে আগে চলছে পাল সাহাব আর হারাণ।

হঠাৎ পাল সাহাব ডাকল, 'হারাণ—'

হারাণ মুখে কিছু বলল না। আস্তে আস্তে পাল সাহাবের পাশে ঘেঁষে এল। তারপর চুপচাপ চলতে লাগল।

পাল সাহাব আবার ডাকল, 'এই হারাণ—'

হারাণ জবাব দিল না।

এবার এক কাণ্ডই করে বসল পাল সাহাব। হারাণের কাঁধে একটা হাত রেখে নিজের দিকে টেনে নিল। সস্নেহ, গাঢ় গলায় বলল, 'কি রে কুত্তা, গোসা হয়েছিস ?'

'না।'

ঘাড় গোঁজ করে এগুতে লাগল হারাণ।

'হয়েছিস, জরুর গোসা হয়েছিস।'

হারাণ ফিস ফিস করে বলে, 'কার উপুর গোসা হমু পাল সাহাব ?'

'আমার ওপর।'

পাল সাহাব বলতে থাকে, 'তোকে কাপাসীর জমিন থেকে ভাগিয়ে দিয়েছি, তাই তুই গোসা হয়েছিস।'

হারাণ জবাব দেয় না।

এদিকে কাপাসীর হাসি মেতে মেতে উঠছে। অন্ধ উন্মাদের মত হাসছে সে।

হঠাৎ হারাণের পাঁজরে আস্তে একটা গুঁতো মারে পাল সাহাব। ডাকে, 'এই হারাণ—'

'কী বলেন পাল সাহাব ?'

'কাপাসীর সাথ তো তোর অনেক কালের জান-পয়চান ?'

মাথাটা নীচের দিকে নামিয়ে চুপচাপ টিলা বাইতে থাকে হারাণ।

পাল সাহাব আবার বলে, 'জান পয়চান না থাকলে এত দরদ হয়! আপনা জমিনের কাম ফেলে কাপাসীর জমিন কোপাতে যাস। সবই সমঝাচ্ছি রে হারাণ, তোর দিলের অন্দরে মহব্বতের খুসবু আছে।'

পাল সাহাবের গলাটা কেমন যেন রহস্যময় শোনায়।

'কী যে বলেন পাল সাহাব!'

হারাণের গলা শোনা যায় কি যায় না। অদ্ভুত এক লজ্জা তাকে ছেয়ে ফেলে।

পাল সাহাব বলে, 'সরমাচ্ছিস (লজ্জা কচ্ছিস) কেন রে কুত্তা! জোয়ান মরদানা জোয়ানীর সঙ্গে মহব্বৎ করবে, এ তো দুনিয়ার কানুন।'

বলতে বলতে হঠাৎ খ্যা খ্যা করে হেসে উঠল পাল সাহাব। একটু পর হাসিটা থামিয়ে আবার শুরু করল, 'এই শালে বল না, কাপাসীর সাথে তোর কত কালের জান-পয়চান ?'

'দুই বছরের জানাশুনা পাল সাহাব। আমরা এক সাথ এক গাড়িতে কইলকাতায় (কলকাতায়) আসছিলাম। দুই বছর এক সাথ শিয়াল-দা ইস্টিশনে কাটাইছি।'

'দু বরষ ধরে মাগীটা হাসছে ?'

'হ পাল সাহাব, দুই বছর তারে এমন হাসন হাসতে দেখি

'মাগী হাসে কেন ?'

'তা ত জানি না পাল সাহাব।'

পাল সাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'তা কেন জানবি! বুদ্ধু, নালায়েক, হারামী কাঁহাকা! আপনা পেয়ারের লেড়কী এমন বেতর্বিয়ত হাসি হাসে, আর তুই শালে কুচ্ছু জানিস না।'

একটু দম নেয় পাল সাহাব। আবার বলে, 'কাপাসী পাগলী না কি রে হারাণ ? ওর বাপ নিত্য শালে তো বলে পাগলী!'

'পাগল না ভাল মানুষ, কাপাসী যে কি, কিছুই জানি না পাল সাহাব, কিছুই বুঝতে পারি না।'

'হুঁ—'

হুস্ করে বড় রকমের একটা শ্বাস ফেলে পাল সাহাব।

হারাণ বলে, 'কাপাসীর কথা তার বাপের কাছে শুনবেন পাল-সাহাব।'

পাল সাহাবের গলাটা এবার বড় শান্ত শোনায়, 'মনে হয়, কাপাসীর বুকে বহুত দরদ, বহুত ব্যথা। লেড়কী বহুত বদ্নসীব (মন্দ ভাগ্য)।'

একটু থেমে উদাস স্বরে পাল সাহাব বলে, 'নিত্য শালের কাছে যাব। লেড়কীর জিন্দগীর কথা শুনতে হবে।'

চড়াই-উতরাই, পাহাড় বেয়ে বেয়ে মানুষগুলো ট্রানজিট ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে চলে।

আর কাপাসীর তীব্র, অবুঝ, অস্বাভাবিক হাসিটা মাতভেই থাকে।

তের

পুরা দিনটা নেশার ঘোরের মধ্যে যেন কেটে যায়।

রাত থাকতে থাকতেই ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে পাল সাহাব। তখনও মা-তিন পাশের মাচানে ঘুমোতে থাকে।

চেইনম্যান, পাটোয়ারীদের নিয়ে পাল সাহাব যখন ট্রানজিট ক্যাম্পে এসে পৌঁছায়, তখন সকালের প্রথম রোদ রাত্রির কুয়াশা আর অন্ধকার ছিঁড়তে শুরু করে।

এই দ্বীপের নতুন মানুষগুলোকে নিয়ে সারাটা দিন মেতে থাকে পাল সাহাব। সকালে ট্রানজিট ক্যাম্পে এসে তাদের নিয়ে জমিতে যায়। মাটি কোপানো, জমি চৌরস করা, জঙ্গল সাফ করা, ক্যাশ ডোল দেওয়া—এমনি হাজার কাজের তদারকিতে দিনটা কাবার হয়ে যায়।

এক দণ্ড এই মানুষগুলোর সঙ্গে না থাকলে উপায় আছে! হয়ত জমি কোপাবে না, মাটি বানাবে না, এমন কি খাবে না পর্যন্ত। হয়ত ট্রানজিট ক্যাম্পের টিলার মাথায় জড়াজড়ি করে দলা পাকিয়ে বসে শোর তুলে কাঁদতে থাকবে।

এই মানুষগুলোর নিজস্ব কোন ইচ্ছা নেই। পাল সাহাবের ইচ্ছাই তাদের ইচ্ছা। তাই সব সময় পাল সাহাবকে এদের তাড়িয়ে ফিরতে হয়। ধমকে, চিল্লিয়ে, খিস্তিখেউড় করে চালাতে হয়।

দুপুরেও ঝুপড়িতে ফিরতে পারে না পাল সাহাব। এদের সঙ্গেই খানাপিনা সেরে নেয়।

জমির কাজ চুকিয়ে, মানুষগুলোর খাওয়ার পর্ব শেষ করে,

উদ্ধবকে দিয়ে একটু গান-বাজনা করিয়ে যখন ঝুপড়ির দিকে পাল সাহাব রওনা হয়, তখন সমস্ত দ্বীপ জুড়ে স্তরে স্তরে কুয়াশা নামতে থাকে। তখন অরণ্য নিঝুম হয়ে যায়, রাত্রি গভীর এবং ঘন হতে থাকে।

আজও অনেকটা রাত হয়ে গেল।

এখন হাওয়াই বুটির ঝোপে ঝিঁঝিঁদের একটানা বিষণ্ণ আলাপ চলছে। জঙ্গলের মাথায় গোয়েলেথ পাখিগুলি ককিয়ে ককিয়ে মরছে।

আজকের কুয়াশা অন্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি গাঢ়। তা ছাড়া দক্ষিণ দিক থেকে মৌসুমী বাতাস ছুটেছে।

একটা মশাল জ্বালিয়ে নিয়েছে পাল সাহাব। মৌসুমী বাতাসের দাপটে মশালটা নিবু নিবু হয়ে যায়। কুয়াশা, অন্ধকার আর বাতাসের সঙ্গে ক্রমাগত যুঝে যুঝে এক সময় পাল সাহাবের মশালটা নিবেই গেল। রোজই নিবে যায়।

ঝুপড়ির সামনের সেই খাদটার কাছে এসে পাল সাহাব ডাকা-ডাকি শুরু করল, 'এ মা-তিন, মা-তিন—'

অন্য দিন দু তিন ডাকেই জবাব মেলে। আজ অনেক চিল্লাচিল্লি করল পাল সাহাব, মা-তিনের সাড়া না পেয়ে অশ্রাব্য খিস্তি করল। তারপর বিড় বিড় করে বকতে বকতে অন্ধকারেই খাদটা পেরিয়ে ঝুপড়িতে এসে ঢুকল।

তাজ্জবের ব্যাপার।

ঝুপড়ির ভিতর লণ্ঠন জ্বলছে। দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনিটা ঢুকিয়ে পাটাতনের উপর বসে রয়েছে মা-তিন। তার চাপা কুত-কুতে চোখদুটো ঝিকঝিক করে জ্বলছে।

পাল সাহাব ভেবেছিল, মা-তিন বুঝি ঘুমিয়েই পড়েছে। লণ্ঠন

জ্বালিয়ে তাকে বসে থাকতে দেখে খানিকটা ফুটন্ত রক্ত মাথায় চড়ে বসল পাল সাহাবের। সে খেঁকিয়ে উঠল, 'কুত্তীর বাচ্চী, জেগে বসে রয়েছিস! ডেকে ডেকে গলা আমার ফেঁসে গেল।'

মা-তিন নড়ল না। হাঁটুতে থুতনি রেখে যেমন বসে ছিল, ঠিক তেমনি বসে রইল। একটা কথাও বলল না মা-তিন। শুধু তার চোখ দুটো ধক্ ধক্ করতে লাগল।

পাল সাহাব গর্জে উঠল, 'মাগী জবাব দিচ্ছিস না কেন? জেগে বসে রয়েছিস, তবু লালটিন (লণ্ঠন) নিয়ে আমাকে পথ দেখাতে গেলি না! তুই ভেবেছিস কী? খাদে পড়ে যদি আমার হাড্ডি ভাঙত।'

এই প্রথম কথা বলল মা-তিন। গলাটা তার অদ্ভুত শোনায়, 'হাড্ডি ভাঙলে ভালই হত, আমার দিল খোশ হত। তবু তুই ঝুপড়িতে থাকতি, আমার আঁখের সামনে থাকতি।' একটু দম নেয় মা-তিন। আবার শুরু করে, 'এখন তো তামাম দিন রিফুজী লোগদের নিয়ে মেতে থাকিস। আমার কথা ভুলে যাস। কুত্তা কাঁহাকা।'

পাল সাহাব চিল্লায়, 'এ নোকরি। নোকরি না করলে কী খাবি শালী?'

অবুঝ গলায় মা-তিন বলে, 'নোকরি উকরি আমি বুঝি না। সেই সুবেতে (সকালে) বেরিয়ে যাস, ফিরিস মাঝ রাতে। আমি একা একা ঝুপড়িতে থাকতে পারব না।'

কিছুক্ষণ মা-তিনের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল পাল সাহাব। তারপর খিঁচিয়ে উঠল, 'নোকরি উকরি ছেড়ে ঝুপড়ির অন্দর থাকব। দিনরাত তোর পাছার কাছে বসে মহব্বতের মিঠা মিঠা কথা বলব। কী রে মাগী, এই তো তোর মতলব?'

পাটাতন থেকে উঠে আসে মা-তিন। পাল সাহাবের বুকের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়ায়। গাঢ় গলায় বলে, 'হাঁ, এই আমার মতলব।'

'পন্দর (পনের) বছর মহব্বতের মিঠা কথা শুনিয়েছি, কত পেয়ার করেছি, তবু শালী তোর পিয়াসা মেটে না ?'

'না।'

পাল সাহাব ভাবতে চেষ্টা করে, পনের বছর একসঙ্গে থেকে এত পেয়ার মহব্বতের কথা শুনে, এত আদর, এত ডলন-পেষণ ভোগ করেও অরুচি ধরে না মা-তিনের, এতটুকু বিতৃষ্ণা আসে না। মাগীর খাঁই কত ?

পনের বছর ধরে মা-তিনের দেহের মনের সব খাঁকতি পূরণ করে আসছে পাল সাহাব। তবু তার আশ মেটে না !

এতকাল মা-তিনকে নিয়েই আকণ্ঠ মজে ছিল পাল সাহাব। ছোট একটি ঝুপড়ি, ছোট একটি নোকরি, মা-তিন, ছোট ছোট সুখ, ছোট সোহাগ আর আনন্দে বিভোর হয়ে ছিল। মেতে ছিল। তুনিয়ার কোন দিকে মুখ তুলে তাকাবার ফুরসতই ছিল না পাল সাহাবের। তার দিল জুড়ে, চোখ জুড়ে যে ছিল, সে মা-তিন। সারা তুনিয়াকে এক পাশে সরিয়ে মা-তিনকে নিয়ে এই দ্বীপে পনেরটা বছর কাটিয়ে দিয়েছে পাল সাহাব।

মা-তিনকে নিয়েই বাকী জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারত পাল সাহাব। কিন্তু সব কিছু ওলট পালট হয়ে গেল।

আগে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে গার্ডের কাজ করত পাল সাহাব।

বছর কয়েক ধরে পুব বাঙলার উদ্বাস্তু আর মালাবারী সেট্‌-লাররা বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে আশ্রয়ের আশায় আসতে শুরু করেছে। দক্ষিণ আন্দামান, মধ্য আন্দামান, উত্তর আন্দামান, হ্যাভলক দ্বীপ—সমস্ত আন্দামান জুড়ে উপনিবেশ তৈরির কাজ চলেছে। উদ্বাস্তু উপনিবেশ, সরকারী পরিভাষায় যার নাম 'রিফুজী সেটেলমেণ্ট'।

হঠাৎ কী খেয়াল হল পাল সাহাবের, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের

নোকরি ছেড়ে 'সেটেলমেন্টে'র কাজ নিল। এখন সে কলোনাইজেসন এ্যাসিস্টান্ট। সংক্ষেপে সি, এ,।

'সেটেলমেন্টে'র কাজ নেবার পর থেকেই জীবনটা ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করেছে পাল সাহাবের। আশ্চর্য জীবন-রসিক হয়ে উঠেছে সে।

এতকাল পাল সাহাবের যে মহব্বৎ একটি মাত্র নারীকে নিয়ে মেতে ছিল, আজকাল সেই মহব্বৎটাই অসংখ্য মানুষের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছে। পাল সাহাবের সমস্ত উদ্যম, উৎসাহ আর প্রাণশক্তি মা-তিনকে ডলে-পিষে আর সোহাগ জানিয়ে ফুরিয়ে যাচ্ছিল। সেই উদ্যম উৎসাহ আর অফুরন্ত প্রাণশক্তি এখন হাজার হাজার মানুষের মধ্যে মুক্তি পেয়েছে।

অসংখ্য মানুষকে ভালবাসার মধ্যে অদ্ভুত এক নেশা আছে। সেই নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছে পাল সাহাব।

অনেক মানুষের ভিতর নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে বলে মা-তিনের কথাটা মনেই থাকে না পাল সাহাবের। উপনিবেশ তৈরির কাজে সারাদিন এত মেতে থাকে যে, ঝুপড়িতে ফেরার কথা প্রায়ই ভুলে যায়।

হাজার হাজার মানুষ পেয়েছে পাল সাহাব। নিজের সব উদ্যম, উৎসাহ আর প্রাণশক্তি অকৃপণ হাতে ঢেলে দিতে পেরেছে।

কিন্তু মা-তিন পেয়েছে কী? মা-তিন কিছুই পায় নি, বরঞ্চ সব কিছুই হারাতে বসেছে। পনের বছর ধরে পাল সাহাব নামে একটি মাত্র পুরুষকে, একটি মাত্র মানুষকে নিয়ে বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ দ্বীপে কাটিয়ে দিচ্ছে মা-তিন। পাল সাহাব ছাড়া আর কোন মানুষের এতটুকু ভালবাসা সে কোনদিন পায় নি। এজন্য তার আপসোস নেই, দুঃখ নেই, বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। পাল সাহাবের মহব্বৎ এত প্রবল, এত প্রখর, এত অপর্যাপ্ত যে পুরা পনের বছর

ভোগ করেও তা ফুরাতে পারে নি মা-তিন। কোনদিন তা পুরানো হয় নি ; সব সময় মনে হয়েছে, তাজা, সরস, সতেজ।

পাল সাহাব আজকাল তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সারাদিন কতটুকু সময়ই বা তাকে কাছে পায় মা-তিন ? রাত থাকতে থাকতেই ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, ফেরে মাঝ রাত্রে।

এই দ্বীপের নতুন মানুষগুলো তার কাছ থেকে পাল সাহাবকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এ জন্য ভয়ানক রাগ হয় মা-তিনের, আক্রোশ হয়, ভয় হয়। বিচিত্র এক যন্ত্রণা তাকে দিনরাত আচ্ছন্ন করে রাখে।

মা-তিন আর পাল সাহাব পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল।

অনেকটা সময় কেটে গেল।

মা-তিনই প্রথম শুরু করল, 'তামাম দিন তুই রিফুজীদের সঙ্গে সঙ্গে কাটাস।'

পাল সাহাব বলল, 'তবে কি তোর সাথ সাথ থাকব মাগী ?'

'হাঁ, জরুর—'

'কভী নেহী—'

পাল সাহাব চিৎকার করে উঠল, 'পন্দর (পনের) বরষ তোর গায়ের গন্ধ শুঁকেছি। আর পারব না। কভী নেহী। আমার দুসরা কাম আছে, বহুত ভারী কাম। এই জাজিরাতে (দ্বীপে) নয়া মানুষ এসেছে, নয়া জিন্দগী নয়া জামানা বানাচ্ছে। সেই আদমীগুলোর সাথ সাথ থাকব, না তোর সাথ থাকব রে মাগী ?'

'পন্দর (পনের) বরষ আগে সেই কথাই তো ছিল। সেই ভরসাতেই তো তোর কাছে রয়েছি। ইয়াদ হয়না, কী কথা দিয়েছিলি ?'

'হয়, হয়। সবই ইয়াদ হয়। লেকিন আর পারব না। পন্দর বরষ পেয়ার করেছি। এখনও তোর খাঁই মিটল না। আমি আর

পারব না।' একটু থেমে পাল সাহাব বলে, 'তুই কী আমার শাদী-করা আওরত যে তামাম জিন্দগী পেয়ার করতে হবে ?'

'কী বললি রেণ্ডির বাচ্চা—'

মা-তিন ফুঁসে উঠল। চাপা, কুতকুতে চোখ জোড়া ধক ধক করতে লাগল। ক্রুদ্ধ বুকটা ফোঁসানির তালে তালে ওঠানামা করছে।

ধাঁ করে বাঁশের বেড়া থেকে একটা বর্মী দা টেনে বাগিয়ে ধরল মা-তিন। সমানে চিল্লাতে লাগল, 'নিকালো শালে, আভী নিকালো—'

মা-তিনের ভয়ানক চেহারাটা দেখে এমন যে দুর্দান্ত পাল সাহাব, তার বুকের মধ্যটা কেঁপে উঠল। এক মুহূর্ত অসহায়, ভীত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল পাল সাহাব। তারপর গুটি গুটি পিছু হটতে হটতে ঝুপড়ির বাইরে এসে পড়ল।

ভিতর থেকে ঝাঁপটা টেনে বন্ধ করে দিল মা-তিন।

রাত আরো বেড়েছে। অন্ধকার আর কুয়াশা পাল্লা দিয়ে গাঢ় হতে শুরু করেছে। এখন এই দ্বীপের কিছুই স্পষ্ট নয়। নিরেট অন্ধকার ফুঁড়ে দৃষ্টি চলে না। পাহাড়, জঙ্গল, আকাশ—এই দ্বীপের সব কিছুই ঘন কুয়াশায় অবলুপ্ত।

ঝুপড়ির ভিতর অস্থির পায়ে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে মা-তিন। বাঁশের পাটাতনটা মচ মচ করছে। ঝুপড়িটা কাঁপছে।

মা-তিন দাপাদাপি করে আর অদ্ভুত শব্দ করে কাঁদে। মাঝে মাঝে কান্না থামিয়ে ফোঁসে, 'রেণ্ডির বাচ্চা, শালে হারামী, দুশমন, পন্দর (পনর) বরষ পরে এখন বলছে আমি ওর শাদি-করা আওরত না! আরে কুত্তা, শাদি-করা আওরত কি আমার চেয়ে বেশি সুখ দিত ? বেশি মহব্বৎ দিত ? বেইমান—'

এক সময় ফোঁপাতে শুরু করে মা-তিন।

ঝুপড়ির বাইরে একটা বাঁশের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে চুপচাপ

বসে রয়েছে পাল সাহাব। এখন বুঝি বা তার একটু দুঃখই হচ্ছে। মা-তিনকে এমন করে না বললেই হত। আওরতটার দিল ভরা গোসা। একটুতেই ক্ষেপে ওঠে।

কিন্তু কি করবে পাল সাহাব? মেজাজটা আজ তার বশে ছিল না। সারাটা দিন এই দ্বীপের নতুন মানুষগুলোকে নিয়ে সে মেতে ছিল। তাদের সঙ্গে জমি কুপিয়েছে, মাটি চৌরস করেছে, বনতুলসী আর জলডেঙ্গুয়ার ঝোপ সাফ করেছে। সারা দিন পর হয়রাণ হয়ে, প্রাণশক্তির অনেকখানি অপচয় করে একটু শান্তি, একটু বিশ্রামের আশায় মা-তিনের কাছে এসেছিল পাল সাহাব। রোজই 'সেটেলমেণ্টে' যে উদ্যম যে উৎসাহ সে খরচ করে, মা-তিনের কাছে এসে তা আবার পূরণ করে নেয়।

আজ খাদটার কাছে এসে ডেকে ডেকে গলা ফাটাল পাল সাহাব। তবু যখন মা-তিনের সাড়া মিলল না, তখনই মেজাজটা বদখত হয়ে গিয়েছিল। তারপর ঝুপড়িতে ঢুকে যখন দেখল লণ্ঠন জ্বালিয়ে মা-তিন বসে আছে, তখন খানিকটা ফুটন্ত রক্ত সরাসরি পাল সাহাবের মাথায় চড়ে বসেছিল।

এখন জঙ্গল ফুঁড়ে মৌসুমী বাতাস ছুটেছে।

ঠাণ্ডা বাতাসে মাথাটা জুড়িয়ে গিয়েছে। পাল সাহাব উঠে দাঁড়াল।

এতক্ষণ ঝুপড়ির ভিতর দাপাদাপি করছিল মা-তিন, ফোঁপাচ্ছিল, ফুঁসছিল। আক্রোশে, রাগে অস্থির, উন্মাদ হয়ে গালি দিচ্ছিল, খিস্তি করছিল।

এখন ঝুপড়িতে কোন শব্দ নেই।

ক্যাঁচা বাঁশের ঝাঁপের ফাঁকে চোখ রাখল পাল সাহাব। লণ্ঠনটা জ্বলছে। পাটাতনের উপর আলুথালু হয়ে পড়ে রয়েছে মা-তিন। রুক্ষ চুলগুলি লুটোচ্ছে। বুকের উপর একটা উড়নি ছিল, সেটা খসে পড়েছে।

দেহটা তির তির করে কাঁপছে। এতক্ষণ শব্দ করে ফোঁপাচ্ছিল মা-তিন। এখন ফোঁপানিটা থেমে গিয়েছে। অনেকক্ষণ পর পর জোরে জোরে এক একটা ক্লান্ত, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছে সে। বড় অসহায়, বড় দুর্বলা দেখাচ্ছে তাকে।

দেখতে দেখতে বুকের মধ্যটা কেমন যেন করে উঠল। কণ্ঠার কাছে অসহ্য এক ব্যথা, অদ্ভুত এক কান্না পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। মা-তিনের জন্য জীবনে এই দ্বিতীয়বার ব্যথা বোধ হচ্ছে, কান্না পাচ্ছে।

মা-তিনের জন্য আরো একবার ব্যথার স্বাদ পেয়েছে পাল সাহাব। আরো একবার কেঁদেছে। কিন্তু সে সব পনের বছর আগের কথা।

আস্তে আস্তে পাল সাহাব ডাকল, 'মা-তিন, এ মা-তিন—'

মা-তিন জবাব দিল না।

গাঢ়, অস্থির গলায় পাল সাহাব আবার ডাকল, 'মা-তিন, এ মাগী, ঝাঁপটা খোল না। খুব যে গোসা।'

চুপচাপ পড়ে রইল মা-তিন। দেহটা তার তির তির করে কাঁপছিল। এখন সেই কাঁপুনিটা বাড়ল। ফুলে ফুলে অনুচ্চ, আবছা গলায় ফোঁপাতে লাগল মা-তিন।

পাল সাহাব আর ডাকাডাকি করল না। বাঁশের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে আবার বসে পড়ল।

চারপাশ থেকে কুয়াশা আর অন্ধকারের খাড়া খাড়া দেওয়াল উঠে গিয়েছে। সেই কুয়াশা আর অন্ধকার ফুঁড়ে পাল সাহাবের দৃষ্টিটা অনেক, অনেক দূরে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

বুকের মধ্যে যে ব্যথাটা কাঁপছে, কণ্ঠার কাছে যে কান্নাটা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে, সেই ব্যথা আর কান্না পাল সাহাবকে পনের বছর আগের কতকগুলি বেহিসাবী, বেপরোয়া দিনের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

পনের বছর পরও কিসমৎ খানকে অবিকল মনে করতে পারে পাল সাহাব। ভারতবর্ষের মেনল্যাণ্ড থেকে একই জাহাজে দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে তারা এই দ্বীপে কয়েদ খাটতে এসেছিল।

সাত বছর সাজা খাটার পর সরকারী টিকিট (সেল্‌ফ সাপোর্টার্স টিকেট) পেল কিসমৎ খান। তারপর এক মঙ্গলবার জেনানা কয়েদীদের কয়েদখানা রেঙ্গিবারিক জেলে গিয়ে ম্যারেজ প্যারেডে দাঁড়াল। (ম্যারেজ প্যারেড অদ্ভুত এক প্রথা। আন্দামান দ্বীপে পুরুষ কয়েদীদের জন্য যেমন সেলুলার জেল, আওরত কয়েদীদের জন্য তেমনি রেঙ্গিবারিক বা সাউথ পয়েন্ট জেল। পুরুষ কয়েদীদের সরকারী টিকেট (সেল্‌ফ্‌ সাপোর্টার্স টিকেট) পাবার পর সাদী করার যোগ্যতা আসে।

মঙ্গলবার মঙ্গলবার জেলার, জেল সুপারিনটেণ্ডেণ্টদের তদারকিতে সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানায় ম্যারেজ প্যারেড হয়। ম্যারেজ প্যারেড এক ধরনের বিচিত্র স্বয়ম্বর। পুরুষ আর জেনানা কয়েদীরা কাতার দিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায়। তারপর যে যার ইচ্ছা মত সাথী পছন্দ করে। দুলহা এবং দুলহান, পরস্পর রাজীবাজী হবার পর ডেপুটি কমিশনার এবং চীফ্‌ কমিশনারের অফিসে ছাপানো কাগজে (ম্যারেজ রেজিষ্ট্রেশন ফর্‌মে) টিপছাপ দিয়ে সাদিটা রেজিস্ট্রি করিয়ে নেয়।)

ম্যারেজ প্যারেডে এসে বর্মী জোয়ানী মা-তিনকে পছন্দ করে ফেলল কিসমৎ খান। কিসমৎ খানের মাংসল গর্দান, খাড়া চোয়াল, মজবুত জোয়ান চেহারাটার দিকে তাকিয়ে মা-তিনের চাপা কুতকুতে চোখজোড়া মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মা-তিনকে শাদি করে শাদিপুরে কুঠি ভাড়া নিল কিসমৎ খান।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে একই সঙ্গে একই দ্বীপান্তরী সাজা

নিয়ে পাল সাহাব আর কিসমৎ খান এসেছিল। এত বছর এক সঙ্গে কয়েদ খেটে, হুইল ঘানি ঘুরিয়ে, রস্বাস ছিঁচে, সড়কের পাথর ভেঙে, ফুসফুসে একই লোনা বাতাস টেনে হুজনের মধ্যে যা গড়ে উঠেছিল, তা হল পাকা দোস্তি।

শাদিপুরের কুঠিতে মা-তিনকেই শুধু তুলল না, পাল সাহাবকেও জবরদস্তি করে নিয়ে গেল কিসমৎ খান।

পাঠান কিসমতের রক্তে খানিকটা আদিমতা ছিল। তার রুচি অদ্ভুত। বিশেষ করে আওরত সম্পর্কে তার মনোভাব ছিল আশ্চর্য বন্য, হিংস্র। রাত্রে চুটিয়ে চোলাই মদ গিলে শাদিপুরের কুঠিতে ফিরত। আর ফিরেই মা-তিনকে নিয়ে পড়ত।

কুঠিতে মার্বেল কাঠের নিরেট একটা ডাণ্ডা ছিল। সেটা দিয়ে মা-তিনকে উন্মাদের মত পিটত কিসমৎ। যতক্ষণ না তার নাকমুখ দিয়ে খুন ছুটত, হাড্ডি চুরচুর হয়ে যেত, যতক্ষণ না বেহুঁশ হয়ে সে লুটিয়ে পড়ত, ততক্ষণ তাকে ছাড়ত না কিসমৎ খান।

পাশের ঝুপড়িতে দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকত পাল সাহাব। এক একদিন অসহ্য হলে ছুটে আসত। কিসমতের গর্দান ধরে বাইরে বার করে চিল্লাত, 'শরাবী হারামী, আওরতটাকে পিটিয়ে পিটিয়েই এক রোজ খতম করে ফেলবে।'

'হাঁ-হাঁ জরুর, শালীকে একরোজ খতম করবই।'

খ্যা খ্যা করে হেসে উঠত কিসমৎ খান। জড়ানো জড়ানো মাতাল গলায় বলত, 'কুত্তীটাকে কোতল করতে পারলে আমার দিল খুশ হবে।'

পাল সাহাব ধমকে উঠত, 'চোপ শালে, রেণ্ডির বাচ্চা, বেদরদী হুশমন।'

পাল সাহাবের খিস্তি গ্রাহ্যেই আনত না কিসমৎ খান। নিজের খেয়ালেই বলে যেত, 'আওরত লোগদের না পিটলে সজুত থাকে না। একরোজ দেখবি শালীরা হাতের কব্জা থেকে ছুটে যাবে।'

যে সময় কিসমৎ খান শরাবের ঘোরে থাকত না, সে সব সময় তাকে বোঝাত পাল সাহাব, 'বেফায়দা মা-তিনের জান চুরচুর করিস কেন? আওরতটাতো বহুত আচ্ছা, বহুত ভাল। বদমাস না, বেয়াদপ না, বেতর্বিয়ত বেদরদী না। তোর জন্যে ওর দিলে বহুত পেয়ার।'

কিসমৎ জবাব দিত না। ডাইনে এবং বাঁয়ে মাথাটা ঝাঁকিয়ে কি যে বোঝাত, সে-ই জানে।

পাল সাহাব আবার বলত, 'শাদি করেছিস, আওরতটাকে থোড়া পেয়ার কর।'

পাঠান কিসমৎ অস্থির হয়ে উঠত, 'হ্যাখ্ ইয়ার, আমাদের পাঠান মুলুকে এক কানুন আছে। কানুনটা বহুত আচ্ছা।'

'কী কানুন?'

'জেনানা যতই পেয়ারী হোক, যতই খুবসুরতী হোক, যতই বেকসুর বেগুণাহ্ হোক, মরদরা তামাম দিন কামানের পর রাতে কুঠিতে ফিরে একবার পিটবেই।'

'কিঁউ?'

'এতে জেনানার দিল কুঠিতে থাকে। না হলে শালীরা চিড়িয়ার মাফিক দুসরা মরদের পিছে উড়তে চায়।'

একটু দম নিয়ে আবার শুরু করেছিল কিসমৎ খান। গলাটা তার সাজ্ঘাতিক শোনাচ্ছিল, 'হ্যাখ্ দোস্ত, আমার মুলুকের কানুন তুড়ে আমার আওরতকে পেয়ার করেছিলাম। দিল মুচড়ে সবটুকু মহব্বৎ তাকে দিয়েছিলাম। অন্য মরদানার মাফিক রাতে ফিরে আমি তাকে পিটতাম না; বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতাম। লেকিন—'

'লেকিন কী?'

'লেকিন রেণ্ডি, কুত্তীর বাচ্চীটা আমার দিল তুড়ে দিয়ে গেল। আমার পেয়ারের কীম্মৎ কেমন করে পেয়েছিলাম, জানিস?'

'কেমন করে ?'

'এক রোজ কাম থেকে ফিরে দেখলাম কুঠি ফাঁকা। শুনলাম, শালী গাঁওয়ের ছট্টু খানের সাথ ভেগেছে।'

'তারপর ?'

'তারপর আবার কী ? সাত রোজ তাদের খুঁজলাম। আমাদের গাঁওয়ের পর তিনটে পাহাড়, ছোট একটা নদী। তার পরে এক শহর। শহরে গিয়ে দুটোকে খুঁজে পেলাম। এক সাথ দুটোকেই কোতল করে দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে এই জাজিরাতে (দ্বীপে) এলাম।'

পাল সাহাব চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। একটা কথাও বলে নি।

কিসমৎ খান বলতেই লাগল, 'বুঝলি দোস্ত, দুনিয়ার কোন আওরতকেই আমি বিশোয়াস (বিশ্বাস) করি না। এক মরদে কোন শালীই খোশ না। শালীরা শাদি করে এক মরদকে, আর বিশটা মরদ ছুপকে ছুপকে পোষে।'

'ঝুট।'

পাল সাহাব গর্জে উঠেছিল।

'না, সচ্।'

এর পর কিসমৎ খান যা বলেছিল, তার মধ্যে প্রচুর খিস্তি এবং খেউড় মিশে ছিল। খিস্তি এবং খেউড়গুলো বাদ দিলে যা দাঁড়ায়, তা হল, দুনিয়ার তাবত আওরতের মধ্যে কেউই সৎ নয়, কেউ এক পুরুষে তুষ্ট নয়, সবাই নষ্ট, দুষ্ট, অসৎ।

জীবনে একবার ঘা খেয়েই একটা স্থির, অটুট সত্যে পৌঁছে গিয়েছে কিসমৎ খান। এই সত্যটা থেকে কোনমতেই তাকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। সে সার বুঝেছে, দুনিয়ার কোন মেয়েমানুষকেই বিশ্বাস করতে নেই।

শেষ পর্যন্ত একটা অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গেল।

ট্রান্সপোর্টের কাজ সেরে শরাব গিলে প্রতি রাত্রে কুঠিতে ফিরত কিসমৎ খান। তারপর নিয়ম করে মার্বেল কাঠের ডাণ্ডাটা দিয়ে মা-তিনকে পিটত, আর চিল্লাত, 'মাগী, পিটিয়ে পিটিয়ে তোর জান লবেজান করে দেব। তোকে সাবাড় করে আর একটা শাদি করব। যতগুলো আওরত পাব, সবগুলোকে খতম করব। শালী জমানা তুড়নেবালী বিশোয়াস (বিশ্বাস) ঘাতীর পাল।'

একটা মেয়েমানুষ তাকে ঠকিয়েছে। তাই দুনিয়ার সব মেয়ে মানুষের উপর কিসমতের আক্রোশ।

অনেক বুঝিয়ে, ধমকে ধমকে, কোনমতেই পাঠান কিসমতের স্বভাবটা শোধরাতে পারলে না পাল সাহাব। কিসমৎ যখন মা-তিনকে ঠেঙাত, পাশের কুঠরিতে দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকত সে। যেদিন অসহ্য লাগত, বেরিয়ে যেত। মা-তিনের জন্য অদ্ভুত এক ব্যথা, বিচিত্র এক কান্না বুকের মধ্যে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠত পাল সাহাবের।

একদিন ব্যাপারটা চরমে উঠল।

সেদিন মাত্রা ছাড়িয়ে চোলাই শরাব গিলে এসেছিল কিসমৎ-খান। মারটাও এমন বেহিসাবী হয়েছিল, যার ফলে তিন দিন বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল মা-তিন।

আজও হুবহু মনে করতে পারে পাল সাহাব। সেদিন কিসমতের হাত থেকে ডাণ্ডাটা ছিনিয়ে নিয়ে কিল-ঘুষা-লাথি মারতে মারতে তাকে কুঠুরির বাইরে বার করে দিয়েছিল।

পাল সাহাবের মার খেতে খেতে কিসমৎ গোঙাচ্ছিল, 'আমার জেনানাকে আমি মারি, কাটি, কোতল করি, তোর কিরে শালে? মাগীর জন্যে তোর যে বহুত দরদ, বহুত পেয়ার—'

'হাঁ রে রাঁড়ের বাচ্চা, দরদ, পেয়ার—'

কিসমৎ খান খেঁকিয়ে উঠেছিল, 'অতই যখন পেয়ার

তখন মাগীটাকে নিয়ে নিলেই পারিস। লে লেও শালীকে।'

ফস করে পাল সাহাব বলে ফেলেছিল, 'জরুর লে লেগা। তোর মাফিক বেদরদী হারামীর কাছে মা-তিনকে আর রাখব না।'

বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে সমস্ত কিছুই সৃষ্টিছাড়া।

তুমি, আমি কি আর দশটা সৎ, সুস্থ, ভদ্র মানুষের পৃথিবীতে যে নিয়মে জীবনটা বয়ে চলে, এখানে সে নিয়ম গ্রাহ্য নয়। এখান-কার নিয়ম, কানুন—সব কিছুই আলাদা। তুমি, আমি যে রীতিতে জীবনের কথা ভাবি, জীবনের মূল্য কষি, সেই রীতির সঙ্গে এই দ্বীপের বাসিন্দাদের রীতি আদৌ মেলে না, আদৌ খাপ খায় না।

সেদিন শরাবের ঘোরে মা-তিনকে পিটেছিল কিসমৎ খান, শরাবের ঘোরেই মা-তিনকে পাল সাহাবের হাতে বিলিয়ে দিয়েছিল। পাল সাহাবও নিজের নিয়মে তার ন্যায় এবং নীতি গড়ে তুলেছিল। যে মা-তিন এত মার খায়, সে কিসমতের শাদি করা আওরত হওয়া সত্ত্বেও তাকে নিতে পাল সাহাবের ন্যায় কি নীতিতে এতটুকু বাধে নি।

নেশার ঘোরেই মা-তিনকে দিয়েছিল কিসমৎ খান। নেশা ছুটবার পরও একই কথা বলল সে, 'শালীকে দিয়ে আমার পোষাবে না। তুই ওকে লিয়ে লে পাল সাহাব। মাগীকে বহুত পিটেছি, এবার দুসরা আওরত আনব।'

সিকমেনভেরায় (হাসপাতালে) তিন দিন বেঁহুশ হয়ে পড়েছিল মা-তিন। হুঁশ ফিরবার পর চোখ মেলে পয়লাই যাকে সে দেখল, সে পাল সাহাব।

অস্থির, অবুঝ গলায় মা-তিন বলেছিল, 'তুমি পাল সাহাব, তুমি আমাকে বাঁচাও। আমি ঐ দুশমন, ডাকুটার কাছে আর যাব না। জরুর ও একরোজ আমাকে খতম করে ফেলবে। জরুর—'

গাঢ়, কাঁপা গলায় পাল সাহাব বলেছিল, 'হাঁ শালী, তোকে

আমি বাঁচাব। কুত্তাটার হাত থেকে জরুর বাঁচাব। আমার জিন্দগীর কসম।'

পাল সাহাবের স্বরে আশ্বাস ছিল, দৃঢ়তা ছিল। তার উপর নির্ভর করা চলে, এমন এক প্রতিজ্ঞা ছিল। নিজের জীবনের নামে কসম খেয়ে সে মা-তিনকে বাঁচাবার ভার নিয়েছিল।

মা-তিনের দ্বিধা ছিল না, সন্দেহ ছিল না। কোন দিকে নজর দেওয়া কি কোন কিছু ভাবার মত মনটা সজুতও ছিল না। কিসমতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এক অন্ধ, উন্মাদ ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসেছিল।

পাল সাহাব যে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল, চোখ বুঁজে সেটা চেপে ধরেছিল মা-তিন। সে বাঁচতে চায়।

'মেরিন ডিপার্টমেণ্টে' বার্জ চালাবার কাজ করত পাল সাহাব। 'মেরিনে'র কাজ ছেড়ে 'ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে' নোকরি নিল সে। তারপর একদিন মা-তিনকে নিয়ে মিড্‌ল্ আন্দামানের লং আইল্যাণ্ডে চলে এল।

লং আইল্যাণ্ডে আসার আগে মা-তিন কতকগুলো শর্ত করিয়ে নিয়েছিল।

পুরা দিল মা-তিনকে দিতে হবে। বেদরদী কিসমৎ খানের মত সে ঠেঙাতে পারবে না। অন্য কোন আওরতের দিকে নজর দেওয়া চলবে না।

মা-তিনকে নিয়েই তাকে সুখী থাকতে হবে। মা-তিনের দিল-মর্জি, জান-জিন্দগী, সব সময় খুশি রাখতে হবে।

কিসমতের কাছে যা পায় নি, সেই অগাধ মহব্বৎ এবং অঢেল সোহাগ পাল সাহাবের কাছ থেকে আদায় করে নেবে মা-তিন।

এক কথায় রাজী হয়ে গিয়েছিল পাল সাহাব।

লং আইল্যাণ্ডে আসার পর পনেরটা বছর পার হয়ে গেল।

দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনিটা গুঁজে ঝিম মেরে বসে ছিল পাল সাহাব।

রাত আরো গাঢ় হয়েছে। বাতাসে হিম হিম ভাবটা আরো ঘন হয়েছে। সামনে কুয়াশা আর অন্ধকার দিয়ে বোনা নিরেট একটা পর্দা ঝুলছে। সেই পর্দাটাকে আলোর ছুঁচের মত বিঁধে বিঁধে জোনাকি জ্বলছে।

পাল সাহাব অন্ধকার দেখছিল না, কুয়াশা দেখছিল না, এমন কি জোনাকিও না। তার চোখ দুটো অনেক, অনেক দূরে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে।

ঝুপড়ির ভিতর মা-তিন বুঝি পাশ ফিরল। কঁ্যাচা বাঁশের পাটাতন মচ মচ করে উঠল।

হাঁটুর ফাঁক থেকে থুতনিটা তুলে খাড়া হয়ে বসল পাল সাহাব।

এবার মা-তিনের অস্ফুট, বিষণ্ণ, কেমন এক ধরনের ভোঁতা কান্নামেশা দীর্ঘশ্বাস শোনা যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ কান পেতে মা-তিনের ফোঁপানি শুনল পাল সাহাব।

হঠাৎ একসময় ঝুপড়ির মধ্যেকার সব শব্দ বন্ধ হয়ে গেল।

জঙ্গল ফুঁড়ে হিম হিম ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে।

কখন যে পাল সাহাবের ঘাড়টা হাঁটুর উপর কাত হয়ে পড়েছিল, কখন যে ঘুমের আঠায় চোখ এঁটে এসেছিল, হুঁশ ছিল না।

মা-তিনের ঠেলাঠেলিতে ধড়মড় করে উঠল পাল সাহাব। চোখ ডলতে ডলতে বলল, 'কৌন, কৌন রে ?'

মা-তিন খেঁকিয়ে উঠল, 'কৌন আবার ? এত রাত্তে কোন্ মেহমান আসবে ? আমি—আমি—'

পাল সাহাব কিছু বলল না। মাথা খাড়া রাখতে পারছে না সে। ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়ছে।

এবার মা-তিন পাল সাহাবের চুলের মুঠি পাকিয়ে ধরল।

তারপর খনখনে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এ রেণ্ডির বাচ্চা, অন্দর চল। ঠাণ্ডায় বুখার ধরলে আমাকেই তো ভুগতে হবে। না তোর শাদি-করা সাত জন্মের আওরত এসে ভুগবে? চল—চল কুত্তা—'

মা-তিন পাল সাহাবের চুল ঝাঁকাতে লাগল।

মা-তিনেব কাঁধে ভর দিয়ে ঝুপড়িতে ঢুকল পাল সাহাব। ঢুকেই সরাসরি বিছানায় গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে নাক থেকে ভোঁস্ ভোঁস্ আওয়াজ বেরুতে শুরু করল।

এক মুহূর্ত পাল সাহাবের রকম সকম দেখল মা-তিন। তার চাপা, কুতকুতে চোখজোড়া ঝিক ঝিক করে জ্বলতে লাগল।

চাপা, তীব্র গলায় মা-তিন ডাকল, 'পাল সাহাব, এ হারামী—'

পাল সাহাব সাড়া দিল না। সমানে তার নাক ডাকতে লাগল।

পাল সাহাবের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ফুঁসল মা-তিন। তারপর হঠাৎ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আঁচড়ে, কামড়ে, খিমচে, লাথি মেরে পাল সাহাবকে ফালা ফালা করে ফেলল।

মুহূর্তে ঘুম ছুটে গেল। লাফ মেরে উঠে বসল পাল সাহাব।

আঁচড়ে কামড়ে পাল সাহাবকে ফালা ফালা করে হাঁপাতে শুরু করেছে মা-তিন। বুকটা নিশ্বাসের তালে তালে জোরে জোরে ওঠানামা করছে। কপালে, থুতনিতে কণা কণা ঘাম দেখা দিয়েছে।

পাল সাহাব তাজ্জব বনে গিয়েছে। বিমূঢ়, কিছুটা বা ভীত। বিহ্বল গলায় সে বলল, 'মাগী এমন করছিস কেন?'

'কুত্তা কাঁহাকা—'

টেনে টেনে মা-তিন বলতে লাগল, 'তোকে কি ঘুমোবার জন্যে ঝুপড়ির অন্দর ঢুকিয়েছি? শালে—'

'তবে কী জন্যে?'

এবার এক কাণ্ডই করল মা-তিন। পাল সাহাবের পাশে ঘন হয়ে বসল। বড় নরম গলায় ডাকল, 'পাল সাহাব—'

'কি ?'

'তুই আগের মত আমাকে আর পেয়ার করিস না।'

'ঝুট্।'

'সচ্।'

'কভী নেহী।'

অনেক সময় গলার স্বরে আর মুখেচোখে মনের ছায়া পড়ে। পাল সাহাবের স্বরটা বুঝতে চেষ্টা করল মা-তিন। আড়চোখে তার মুখটা দেখতে লাগল।

পাল সাহাবের মুখে কোন ছায়া পড়েছে ? ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না মা-তিন।

মা-তিন বলল, 'সচ্ই (সত্যিই) যদি পেয়ার করিস, তবে তামাম দিন আমাকে ঝুপড়িতে ফেলে রেখে যাস কেন ?'

'কোথায় রেখে যাব ?'

'কোথাও রাখতে হবে না। আমাকে তোর সাথ লিয়ে যাবি।'

'তুই যাবি ?'

কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না পাল সাহাব। অবাক হয়ে মা-তিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মা-তিন বলল, 'আমিও তোর সাথ যাব। তোর সাথ কাম করব।'

'সচ্!'

পাল সাহাবের চোখ দুটো অস্বাভাবিক চক চক করতে লাগল।

শান্ত গলায় মা-তিন বলল, 'সচ্, জরুর সচ্। রিফুজীদের মধ্যে আমিও তোর সাথ কাম করব।'

'আ রে মেরে পেয়ারে, তু আমার আসলী মহব্বৎ—'

উন্মাদের মত মা-তিনকে দু হাতে জাপটে ধরল পাল সাহাব। চোখা চোখা দাড়িভরা মুখটা মা-তিনের নরম গালে ঘষতে লাগল।

'ছোড়্ শালে, ছোড়্—'

মা-তিন চিল্লাতে থাকে। পাল সাহাব ছাড়ে না। বরঞ্চ মা-তিনের দেহটা আরো জোরে জোরে একপিণ্ড কাদার মত ছানতে থাকে।

এক সময় মা-তিনের চিল্লানি থামে। অদ্ভুত এক সুখে চোখ দুটো তার বুঁজে আসে। চোখ বুঁজেই পাল সাহাবের প্রবল ,প্রখর, সাজ্ঘাতিক সোহাগ ভোগ করতে থাকে মা-তিন।

এখন একবার যদি মা-তিনের মুখের দিকে তাকাত পাল সাহাব! দেখতে পেত, মা-তিনের ঠোঁটে সূক্ষ্ম, ধূর্ত, দুর্বোধ্য একটু হাসি ফুটে আছে।

চোদ্দ

তিলির সোয়ামী হরিপদ বারুই কিছুই আনতে পারে নি।

না বলতে কিছুই না।

না জমিজমা, না বিত্ত ব্যাসাদ, না সোনাদানা, কিছুই আনতে পারে নি হরিপদ। এমন কি নীরোগ একটি দেহ, উজ্জ্বল পরমায়ু কি সুস্থ একটি মন—তাও না।

সব খুইয়ে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে এসেছে হরিপদ।

সুখ, আনন্দ, খুশির স্বাদ কবে ভুলে গিয়েছে সে।

আজকাল ট্রানজিট ক্যাম্পের মাচানে শুয়ে শুয়ে দিনরাত হাঁপায় হরিপদ। হাঁপানির টানটা যখন বাড়ে, কাশতে কাশতে দেহটা ধনুকের মত বেঁকে দুমড়ে যায়। শুকনো, জিরজিরে বুকের হাড়-গুলো মট মট করতে থাকে ; বুঝিবা ভেঙেই যাবে। চোখের ডেলা দুটো ঠেলে বেরিয়ে পড়ে। হাজার চেষ্টা করেও কাশিটাকে দাবাতে পারে না হরিপদ।

কাশির দমকটা যখন কমে আসে, ক্লান্তিতে, অবসাদে নির্জীব হয়ে পড়ে সে। চোখ দুটো আপনা থেকেই বুঁজে আসে। গলার মধ্য দিয়ে অস্বচ্ছ, ঘড়ঘড়ে, গোঙানির মত একটা আওয়াজ বেরুতে থাকে। তখন মাছের মত হাঁ করে শ্বাস নেয় হরিপদ। শ্বাস নেবার তালে তালে অশক্ত দুর্বল দেহটা তোলপাড় হতে থাকে।

বঙ্গোপসাগরের ওপারে সেই পদ্মা-মেঘনার দেশ থেকে কিছুই আনতে পারে নি হরিপদ। কিন্তু রুগ্ন, বিষাক্ত, ভয়ানক একটা

মন নিয়ে এসেছে। আর সেই মনের ভিতর পুরে এনেছে একটা সাঙ্ঘাতিক বাতিক, যার নাম সন্দেহ।

পৃথিবীর কারুকে বিশ্বাস করে না হরিপদ। বিশ্বাস করার মত মনের জোর এবং সাহস তার নেই।

হরিপদর সব চেয়ে বেশি সন্দেহ তিলির উপর।

হাঁপানি আর নানা ধরনের আদিব্যাধি দেহের মতই হরিপদর মনটাকে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে। সহজ, স্বাভাবিক, সুস্থ—এমন কোন কিছুই সে ভাবতে পারে না। দিবারাত্রি শুয়ে শুয়ে বিড় বিড় করে। কি যে সে বকে যায়, কে তার হদিস দেবে? মাঝে মাঝে নিজের খেয়ালে কাঁদে। অসুস্থ, অস্বাভাবিক, ভাঙা ভাঙা এক ধরনের শব্দ বেরোয়।

এই দ্বীপে হরিপদকে কেউ হাসতে দেখে নি।

সেই বিকাল থেকে পাখিটা ডাকছে।

কখনও তীব্র অবুঝ, কখনও মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ। এক এক সময় ভাঙা ভাঙা কর্কশ গলায় ডেকে উঠছে পাখিটা।

কী পাখি ওটা?

একবার হরিপদর মনে হল, এই দ্বীপেরই কোন সাগরপাখি, যার নাম সে জানে না। একবার মনে হ'ল, ভীমরাজ পাখি।

অনেকক্ষণ ডাকটা শুনেও হরিপদ ঠিক করতে পারল না, পাখিটা কোন জাতের? কোন নামের?

মাচানের উপর উঠে বসল হরিপদ। ট্রানজিট ক্যাম্পের জানালায় চোখ রেখে আঁতি পাঁতি করে খুঁজল। কিন্তু না, পাখিটাকে দেখা গেল না। ঘন জঙ্গলের মধ্যে পাখিটা কোথায় যে ডেকে ডেকে সারা হচ্ছে, কে তাকে বলে দেবে?

পাখি খুঁজতে গিয়েই হঠাৎ খেয়াল হ'ল হরিপদর।

জঙ্গলের মাথায় রোদ নিবু নিবু হয়ে গিয়েছে। দূরের ছোট ছোট পাহাড়গুলো আবছা হয়ে যাচ্ছে। সাগরপাখিরা সমুদ্রের দিক থেকে দ্বীপে ফিরতে শুরু করেছে।

এক সময় কেউ যেন রোদটুকু গুটিয়ে নিল। সমস্ত দ্বীপ জুড়ে বিষণ্ণ, ছায়া ছায়া একটা পর্দা নেমে এল।

প্রথমে বিরক্ত, তারপর ক্ষেপে উঠল হরিপদ। সেই সকালে বেরিয়েছে তিলি, এখনও ফিরছে না।

চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল হরিপদ। একটু পরেই পুরাপুরি সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

এখনও তিলি কেন ফিরল না? এই চিন্তায় অস্থির হয়ে রইল হরিপদ। তিলির ভাবনাটা ক্রমাগত তার মাথায় বিঁধছে।

আবছা অন্ধকার গাঢ় হয়ে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে হরিপদ বকতে লাগল, 'ঘরে সোয়ামী হাঁপির টানে মরে। মাগীর সেদিকে মন নাই। তোর মন যে কোথায়, আমি জানি। এই ঘরে শুইয়া শুইয়া আমি সগল টের পাই।'

বকতে বকতে এক সময় হাঁপানির টান ধরে। হরিপদ হাঁপায় আর কাশে। কাশতে কাশতে জিভটা আধ হাত খানেক বেরিয়ে পড়ে।

কাশির ধমকটা একটু কমলে আবার শুরু করে, 'নষ্ট, দুষ্ট মাগী। মনে কী মতলব নিয়া এই দ্বীপি আসছিস, আমি বুঝি কিছুই বুঝি না! সোয়ামী তোর ব্যারামে ভোগে, আর তুই দিন দিন ফুলিস। কোন্ সুখ তোর মনে? সারা দিনে একবারও আমার কাছে আসিস না। আমি বাঁচলাম না মরলাম—তোর তাতে কি আসে যায়! সব্বনাশী—'

নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিড় বিড় করে হরিপদ, 'সব্বনাশী, আমারে ঘরের মধ্যে রেখে নাগর নিয়া ফুত্তি করে। আমি কিছুই বুঝি না, না? আমি আন্ধা (অন্ধ) হইয়া গেছি? কিছুই

আমার চোখে পড়ে না? আমি কালা হইয়া গেছি? কিছুই আমার কানে আসে না? আমি সগল শুনি, সগল দেখি, সগল বুঝি। খালি মুখখান খুলি না। দিন আসুক। এমুন দিন এমুন যাইব না। চিরটা কাল এমুন ব্যারামে ভুগুম (ভুগব) না লো মাগী। এট্টু ভাল হইতে দে, তোরে আমি সজুত করুম।'

আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'হে ভগমান, মাগীর এত নষ্টামি তুমি সহ্য কইরো (করো) না। হে ভগমান—'

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল হরিপদ, তার আগেই তিলি ঝুপড়িতে ঢুকল। তিলিকে দেখেই মুখটা ঘুরিয়ে নিল সে। তিলি গায়ে মাখল না। আস্তে আস্তে তার সামনে এসে দাঁড়াল। হরিপদর একটা হাত ধরে বলল, 'কেমুন আছ? হাঁপির টানটা আইজ (আজ) কম আছে?'

এক ঝটকায় তিলির হাত থেকে নিজের হাতটা ছুটিয়ে নিল হরিপদ। গোঁজ হয়ে বসে রইল।

তিলি আবার হরিপদর হাত ধরল। বলল, 'কী হইল? কথা কও না ক্যান?'

হরিপদ ভেংচে উঠল, 'অত সোহাগে কাম নাই।'

'কী কও!'

অবাক হয়ে হরিপদর মুখের দিকে তাকাল তিলি।

'কী আবার কই? যা যা মাগী, চোখের সুমুখ থিকা যা। তোরে দেখলে পাপ হয়। তোর নাম মুখে আনলে পাপ হয়।'

'সোয়ামী হইয়া এমুন কথা কও!'

তিলির গলায় বড় দুঃখের স্বর ফোটে।

'হ, কই, এক শ' বার কই। যতবার পারি ততবার কই।'

হরিপদ হাঁপাতে লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল, 'অখন তুই যা।'

'কোথায় যামু?'

'সারাটা দিন যে ভাতারের লগে (সঙ্গে) কাটাইয়া আসলি, তার কাছে যা মাগী। যা যা—'

তিলি এবার রুখে উঠল, 'মুখে যা আসে, তা-ই যে কও!'

'হ কই। কইলাম তো আমার মাথা কাটবি?'

'সারাটা দিন আমি অন্য পুরুষ লইয়া কাটাই?'

'কি করিস না করিস, তোর ধম্ম তোর মন জানে। আমি ব্যারামে ভুগি, আমি ঘর ছাইড়া বাইরে যাইতে পারি না। তোর কত সুবিধা, কত সুযুগ (সুযোগ)!'

হরিপদ তিলির দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, 'পাঁচজনের মুখে পাঁচ কথা শুনি। মুখ বুইজা (বুজে) শুনতে হয়। ঈশ্বর আমারে মাইরা (মেরে) রাখছে। সগলই কপালের দোষ।'

হরিপদ জোরে জোরে কপাল থাপড়ায়।

সেই সকালে পাল সাহাবের সঙ্গে জমি কোপাতে বেরিয়েছিল তিলি। দুপুরে ট্রানজিট ক্যাম্পে ফিরে নাকে মুখে দু চার খাবলা ভাত গুঁজে আবার জমিতে ফিরে গিয়েছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে। তার আগেই আগাছা বেছে মাটি কুপিয়ে চৌরস করে রাখতে হবে। তাই সমস্ত দিন জমি বানাবার কাজ চলছে।

সারাটা দিন মাটি কোপাবার পর শরীরটা আর বশে থাকে না। হাত দুটো যেন যন্ত্রণায় খসে পড়তে থাকে। কোমর খাড়া রেখে দাঁড়াতে পারে না তিলি। কোমরটা বুঝি ছিঁড়েই পড়বে।

সমস্ত দিন জমি কুপিয়ে একটু জিরোবার আশায় ট্রানজিট ক্যাম্পে ফিরে আসে তিলি। এখন দেহটাকে বিছানায় সঁপে দিতে পারলে সে বাঁচে। একটু যে ঘুমোবে, তার কি জো আছে!

হরিপদ বলল, 'অখনও খাড়াইয়া (দাঁড়িয়ে) আছিস! যা যা কুচরিত্তির, মরদচাটা মাগী!'

ভাঙা ভাঙা কাতর গলায় তিলি বলল, 'বড় সুখে রাখছ!'

অতি দুঃখে চোখ ফেটে জল আসে তিলির। সারা দিন পর ট্রানজিট ক্যাম্পে ফিরে হরিপদর গঞ্জনা আর সয় না।

হরিপদর জন্য কি না করেছে তিলি!

ধর্ম বল, কর্ম বল, পুণ্য বল, সোয়ামীই হ'ল সব। সোয়ামীর মধ্যেই সকল ধর্ম, সকল পুণ্যের সার। সে সারাৎসার। সোয়ামী ভজলে ভগবান তুষ্ট। সোয়ামী বিহনে জগৎ অন্ধকার।

সকল ঈশ্বরের সেরা ঈশ্বর হ'ল সোয়ামী। সোয়ামীর জন্য সতী নারী না পারে কী? না করে কী?

জ্ঞান হবার পর থেকেই এই সব কথা শুনে আসছে তিলি। শুনতে শুনতে সোয়ামী সম্বন্ধে তার মনে একটা সংস্কার গড়ে উঠেছে।

হরিপদর জন্য সব গঞ্জনা সয়েছে তিলি; অকাতরে সব দুঃখ মাথায় পেতে নিয়েছে।

হরিপদ কী আজই ভুগছে!

হাঁপির টান নিয়েই তিলিকে সে বিয়ে করেছিল। বিয়ের পর একটা দিনও কি তিলির সুখে কেটেছে? সুখ দূরের কথা, একটু সোয়াস্তিও কি মিলেছে কোনদিন? হাজার চেষ্টা করেও সে কথা মনে করতে পারে না তিলি।

দেশে থাকতে তামাকের ব্যাপার করত হরিপদ। হাটে হাটে ঘুরে চট বিছিয়ে দোকান পাতত। মাখা তামাক, মতিহারি তামাক, শুখা তামাক, গুঁড়া তামাক, পাতা তামাক—হাজার জাতের তামাক বেচত।

তামাকই শুধু বেচত হরিপদ। কিন্তু কাঁচা তামাক শুকতো কে? তামাকের আবাদ করত কে? তামাক দা-কাটা করত কে? তামাকে চিটে গুড় মাখাত কে? সব, সব কিছুই তিলি করত।

হরিপদ যে করবে, সে সময় কোথায় তার? শরীরে সে সামর্থ্যই বা কোথায়? ঘরে যতক্ষণ থাকত, বসে বসে হাঁপাত আর কাশত।

রোগা, জিরজিরে, অস্থিসার বুকটার তোলপাড় দেখে বড় মায়া হত তিলির।

হরিপদর মন পাবার জন্য কী না করেছে তিলি? এক হাতে তামাকের কাজ করেছে, এক হাতে তার রোগের সেবা করেছে, আর এক হাতে সংসার করেছে।

হরিপদর মন যে কোথায়, বিয়ের দশ বছর পরও তার খোঁজ পায় নি তিলি।

যত দিন গিয়েছে, রোগ যত বেড়েছে, হরিপদর সন্দেহ আর গঞ্জনাও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে।

রোগে দিন দিন কাহিল হয়ে পড়েছে হরিপদ। শরীরটা আরো রোগা, আরো জিরজিরে, আরো কাবু হয়েছে। কিন্তু দিবারাত্রি এত খেটেও, হরিপদর এত কুকথা সয়েও দিনে দিনে অঢেল স্বাস্থ্যে, অফুরন্ত যৌবনে ভরে উঠেছে তিলি। তার সুছাঁদ মুখ, পুষ্ট বুক, কানায় কানায় ভরা দেহ দেখতে দেখতে ক্ষেপে উঠেছে হরিপদ।

তিলির শরীরটা হরিপদর আয়ত্তের বাইরে। হাঁপির টান ভিতরটা এত ঝাঁঝরা করে ফেলেছে যে তিলির অফুরন্ত স্বাস্থ্যের দিকে হতাশ চোখে চেয়ে থাকা ছাড়া তার উপায়ই বা কী?

তিলির দিকে যখনই তাকায়, যখনই তার কথা ভাবে, হরিপদর মাথাটা গরম হয়ে ওঠে।

ট্রানজিট ক্যাম্পের এই ঝুপড়িটার বাইরে রাত্রি আরো গাঢ় হয়েছে। ফিকে ফিকে কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে।

জমি থেকে সকলে ফিরে এসেছে। বাইরে তাদের শোরগোল শোনা যাচ্ছে। সব গলা ছাপিয়ে পাল সাহাবের গলাটা চড়ছে।

হরিপদ বিড় বিড় করতে থাকে, 'আমি না বুঝি কী? না দেখি কী? না শুনি কী?'

'হ্‌ হ্‌ তুমি সগলই বোঝ। এইবার এট্টু থাম। আর পাগলামি করে না।'

একদৃষ্টে তিলির দিকে চেয়ে থাকে হরিপদ। সে ভেবেই পায় না, এত যে দুঃখ, এত যে ধান্দা, দেশভাগের পর ভাসতে ভাসতে এ ঘাটে ও ঘাটে ঘুরে মরা, কোন দিন এক মুঠা জোটে, কোনদিন জোটেও না, তবু তো তিলি টসকায় না! প্রচুর স্বাস্থ্য, এত অঢেল যৌবন সে পায় কোথায়?

হরিপদ ভাবতে থাকে, মনে ফুর্তি না থাকলে দেহ কি ভরে ওঠে? তার মন সায় দেয় না। সে নিজে তো অশক্ত, পঙ্গু, ব্যারামী মানুষ। তার পক্ষে তো আর সম্ভব নয়। নিশ্চয় অন্য কেউ আছে। অন্য কেউ তিলির মনে রসের যোগান, ফুর্তির যোগান দেয়। না হলে এই দ্বীপে এসে পুরা না খেতে পেয়েও এমন ভরন্ত, সুঠাম, সুছাঁদ দেহ কেমন করে পায় তিলি! এই ভাবনাটা হরিপদকে অস্থির করে তোলে।

ভাবতে ভাবতে হরিপদ ক্ষেপে উঠল, 'থামুম, ক্যান থামুম! আমার বুকে বইসা (বসে) আমারই দাঁত ভাঙবি। আর আমি মুখ বুইজা (বুজে) সহ্য করুম। আমি জানি, সারাটা দিন তুই ক্যান বাইরে থাকিস? তোর হাজার নাগর। উই পাল সাহাব, উই হারাণ, উই গুপী, সগলের লগে (সঙ্গে) তোর ঢলাঢলি, মাখা-মাখি। তোর—'

জীবন ভর অনেক সয়েছে তিলি। চিরটা দিন হরিপদর মন যুগিয়ে চলেছে। তবু তার মন পেল না।

আজ হঠাৎ যেন কি হয়ে গেল তিলির। মাথার ভিতর হাজারটা চোখা চোখা শলা যেন ক্রমাগত বিঁধতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে সারা জীবনের একটা মোটামুটি হিসাব কষে নিল তিলি।

আজ পর্যন্ত হরিপদর কাছ থেকে কী সে পেয়েছে? না একটু সুখ, না সোহাগ, না একটু শান্তি। সারাটা জীবন মানুষটা তাকে

জ্বালিয়েছে, পুড়িয়েছে, উঠতে বসতে দিবারাত্রি অষ্ট প্রহর সন্দেহ করেছে। অথচ তার জন্য কী না সে করেছে? দেহকে দেহ মানে নি। গতরকে গতর ভাবে নি। তবু অকৃতজ্ঞ, নির্দয় মানুষটার কাছে কোনদিন সুখ পেল না তিলি। এ দুঃখ তার মরলেও ঘুচবে না।

তিলি রুখে দাঁড়াল। বলল, 'কী পাইছি (পেয়েছি) তোমার কাছে? কোনদিন দুইটা মিঠা কথাও কও নাই। তমস্ত (সমস্ত) জনম খালি দিয়াই গেলাম, পাইলাম না কিছু। তুমি আবার কও নাগর নিয়া আমি ঢলাঢলি করি, পরপুরুষের লগে আমার মাখা-মাখি। বেশ কথা, ভাল কথা। তুমি সোয়ামী, তোমার মনে যদি এই সন্দ জাগে, আমি কী করতে পারি? কিছুই না।'

হরিপদ টেনে টেনে বলে, 'সন্দ জাগে! মানুষের মনে মিছাই বুঝি সন্দ জাগে? তুই নষ্ট, কুচরিত্তির। তুই কত বড় সতীর ঝি সতী, সগল জানি। কিছুই জানতে বুঝতে বাকী নাই।'

তিলি ক্ষেপে উঠল, 'আমার অঙ্গ, আমার গতর উড়াইয়া দিমু, পুড়াইয়া দিমু। যা পরাণে চায় তাই করুম। না পাইলাম এট্টু সুখ, না পাইলাম একটা ছেলে। কী নিয়া বাঁচুম, কী নিয়া দুঃখু ভুলুম, কিসের আশায় বুক বান্ধুম (বাঁধব)? সোয়ামী পাইলাম, কিন্তুক তার শরীল পাইলাম না, মন পাইলাম না। ভরা শরীলে (শরীর) ভরা যৈবনে বুকের ভিতর যখন খা খা করে, এমন একটা বান্ধব পাইলাম না যারে মনের কথা শুনাইয়া জুড়ামু।'

একটু থামল তিলি। উত্তেজনায়, দুঃখে, যন্ত্রণায় বুকটা কাঁপিয়ে দ্রুত, দীর্ঘ, গরম নিশ্বাস পড়ছে। অন্ধকারে চোখ দুটো ধক ধক করছে।

তিলি আবার শুরু করল, 'এই অঙ্গ, এই জনম রাইখ্যা (রেখে) কী করুম? কারো ভোগে লাগলাম না, কামে লাগলাম না। তবু তমস্ত জীবন মানুষে সন্দই করল। সন্দ আর সন্দ থাকে ক্যান?

এইবার সন্দ সত্য হউক। এই অঙ্গ নিয়া যখন জ্বালা, তখন এরে রাখুম না। লুটাইয়া দিমু, মজাইয়া দিমু, বিলাইয়া দিমু।'

'তাই দে মাগী, তাই দে। তোর পরাণে যা চায় তাই কর।'

চিলের মত তীক্ষ্ণ গলায় টেনে টেনে চিল্লায় হরিপদ। চিল্লায় আর হাঁপায়। হাঁপাতে হাঁপাতে কেঁদে ফেলে।

পনের

বুঝি বা একটা চিত্রাল হরিণ কিংবা একটা ময়ূর।

হারাণের মনে হঠাৎ কেন যে হরিণ আর ময়ূরের ভাবনা এল, তা সে-ই জানে। অবশ্য হারাণ দেশে থাকতে ময়ূর দেখেছে। এই দ্বীপে এসে হরিণ দেখেছে।

টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যদিও হারাণ ময়ূর আর হরিণের কথা ভাবছে, আসলে সে কিন্তু ময়ূরও না, হরিণও না। সে কাপাসী।

বাঁ দিকে বিরাট একটা পাহাড়; নাম স্যাডল্ পীক। স্যাডল্ পীক থেকে মিঠে জলের একটা নদী পাক খেয়ে খেয়ে নীচে নেমে এসেছে।

লোকে বলে কিলপঙ নদী।

কিলপঙের সরু, নীল ধারা উপর থেকে নীচে নামছে। পাথর, নুড়ি আর গাছের শিকড়ে ঘা খেয়ে খেয়ে নীল জল অবিরাম বেজে চলে।

জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে সোনার তীরের মত বিকালের রোদ এসে কিলপঙ নদীটাকে বিঁধছে।

হারাণ বিকালের রোদ দেখছিল না, জলের বাজনা শুনছিল না। সে দেখছিল কাপাসীকে।

হয়ত কাপাসী জল নিতে এসেছে। কিন্তু জল তো সে তুলছে না। নদীর পারে চুপচাপ বসে বসে কি যে করছে, এত দূরের টিলার মাথা থেকে ঠিক বুঝতে পারে না হারাণ।

আজ জমি চৌরস করতে যায় নি হারাণ। সকালে কাঁপিয়ে জ্বর এসেছিল।

খিদিরপুর ডকে আন্দামানের জাহাজে উঠবার আগে সরকারী লোকেরা খান দুই পাটের কম্বল দিয়েছিল।

কম্বল মুড়ি দিয়ে সারা দিন ট্রানজিট ক্যাম্পের মাচানে পড়ে ছিল হারাণ। জ্বরের দাপটে মাথা খাড়া করতে পারে নি।

দুপুরের দিকে ঘাম ছুটিয়ে জ্বরটা ছেড়ে গিয়েছে। জ্বর ছাড়বার পরও অনেকক্ষণ মাচান ছেড়ে উঠতে পারে নি হারাণ। শরীরটা বেজায় কাহিল হয়ে পড়েছে।

দেশে থাকতে এমন জ্বরে মাঝে মাঝেই পড়ত হারাণ। মাধব কবিরাজ বলত পিত্তজ্বর।

দেশ থেকে কিছুই আনতে পারেনি হারাণ। কিন্তু পুরানো রোগটা হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপে ঠিক ধাওয়া করে এসেছে।

কথায় কথায় বুড়ী বাসিনী বলে, 'সু তো আসে না, পিছে পিছে দিন রাইত কু'টাই ঘোরে।'

ভালটা না আসুক, মন্দটা ঠিক পিছে পিছে এই দ্বীপ পর্যন্ত এসে পড়েছে।

হাজার বার একই ব্যারামে ভুগে ভুগে তার নিদানটা জেনে ফেলেছে হারাণ। শুধু নিদানই না, ওষুধ বিষুধ, টোটকা টাটকিও তার জানা।

বাসক পাতা ছেঁচে রস খেলে বেশ কিছুদিন পিত্তজ্বরটা মাথা চাড়া দিতে পারে না।

বিকালের দিকে কাহিল ভাবটা একটু কমলে ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়েছিল হারাণ। জঙ্গলে বাসক গাছ খুঁজতে খুঁজতে এই টিলার মাথায় এসে উঠেছে।

বাসক পাতার উগ্র গন্ধ ঠিকই নাকে আসছে। নাকটা ধেঁধে

যাচ্ছে। কিন্তু ঘন জঙ্গলের মধ্য থেকে বাসক গাছ খুঁজে বার করা সহজ কথা নয়।

তা ছাড়া বাসক গাছের কথা এখন ভাবছে না হারাণ।

ঘুরে ঘুরে সেই ভাবনাটাই তার মাথায় আসছে। একটা চিত্রাল হরিণ না একটা ময়ুর? কেন যে হরিণ আর ময়ুরের কথা ভাবছে, হারাণ নিজে দিশা করে উঠতে পারে না।

অনেকক্ষণ টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল হারাণ। কিন্তু নদীর পারে ঠায় বসে আছে কাপাসী, তার উঠবার নামগন্ধ নেই।

তর তর করে নীচে নেমে এল হারাণ।

এর নাম কিলপণ্ড নদী।

তা যে দেশের যে রীতি! তা না হলে হাত দশ বারো চওড়া একটা সোঁতা খালকে কেউ নদী বলে!

কিলপণ্ড নদী! খালের চেয়ে সরু একটা জলরেখার নাম নদী! অন্য দিন হলে তাজ্জবের কথাটা ভেবে খুব একচোট হাসত হারাণ। কিন্তু আজ চুপচাপ কাপাসীর পিছনে এসে দাঁড়াল।

খাটো গেরুয়া রঙের একটা আঙিয়া পরেছে কাপাসী। আঙিয়াটায় গোল গোল খয়েরী ফুটকি। শাড়িটার রঙ মেঘের মত।

এতক্ষণে হরিণ আর ময়ুরের ভাবনাটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

পিঠময় চুল ছড়িয়ে রয়েছে। নদীর দিকে চেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত বসে রয়েছে কাপাসী। চোখ থেকে গাল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় লোনা জল ঝরছে। নদীপারের শুকনা মাটি মুহূর্তে সেই জল শুষে নিচ্ছে।

হারাণ চমকে উঠল। আস্তে আস্তে ডাকল, 'কাপাসী—'

ডাকটা কাপাসীর কানে পৌঁছায় নি। আগের মতই বসে রইল সে।

হারাণ আবার ডাকল, 'কাপাসী—'

গলাটা ঘুরিয়ে অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্য থেকে যেন কাপাসী তাকাল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। অস্ফুট গলায় বলল, 'তুমি—'

'হ—হ—আমি—'

আগ্রহে, উৎকণ্ঠায় কাছাকাছি এগিয়ে গেল হারাণ।

গলাটা ঘুরিয়ে আবার নদীর দিকে তাকাল কাপাসী। আবার সে উদ্‌ভ্রান্ত উদাসীন হয়ে গেল। আগের মতই গাল বেয়ে চোখের লোনা জল ঝরতে লাগল।

হারাণ মনে মনে ভাবে, আহা কাঁদুক, কাপাসী কাঁদুক।

কাপাসীকে কাঁদতে দেখলে হারাণের আশা হয়। সে ভরসা পায়। যে দুঃখে, যে ব্যথায় কাপাসীর বুক ফাটে, লোনা জল হয়ে চোখ ফেটে তা ঝরে যাক।

আহা কাঁদুক, কাপাসী কাঁদুক। কেঁদে কেঁদে বুকটা হাল্কা হোক। অনেক পুড়েছে, অনেক জ্বলেছে কাপাসী। এবার একটু জুড়োক।

কাপাসীর বুকের মধ্যে যে কান্না জমাট বেঁধে আছে, এতদিনে বুঝি সেটা পথ পেয়েছে। চোখের মধ্য দিয়ে উষ্ণ লবণাক্ত ধারায় হু হু করে নামছে।

হারাণ ডাকে, 'কাপাসী—'

'কও—'

'কান্দো (কাঁদো), যত পার কান্দো (কাঁদো)।'

'কত দিন কান্‌তে (কাঁদতে) চাইছি, পারি নাই। ঈশ্বর এট্টু কান্‌তেও (কাঁদতে) ছায় নাই। যখন কান্‌তে (কাঁদতে) চাইছি, ঈশ্বর হাসাইছে। কত শাস্তি পাইলাম। ভগমান, তোমার মনে কী আছে—'

বলতে বলতে থেমে যায় কাপাসী।

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে হারাণ। গাঢ়, ধরা ধরা গলায় কি যে বলে, ঠিক বোঝা যায় না।

রোদের তেজ মরে আসে। জঙ্গলের মাথায় বিষণ্ণ একটু আলো আটকে রয়েছে। স্যাড্‌ল্‌ পীকের দিক থেকে হিম হিম মৌসুমী বাতাস ছুটে আসে।

এই দ্বীপে আর একটা দিন ফুরিয়ে গেল।

ফিস ফিস করে হারাণ বলল, 'সে কথা ভুলে যাও কাপাসী—'

'ভুলতেই তো চাই পুরুষ। কিন্তুক পারি কই? পারি না, পারি না, পারি না। কিছুতেই যে পারি না। হা ঈশ্বর!'

কাপাসী অস্থির হয়ে ওঠে। ছু হাতে চুল ছেঁড়ে। জোরে জোরে মাথাটা ঝাঁকায় আর কাঁদে। তীব্র, অবোধ কান্না। মুখের উপর গাঢ় যন্ত্রণার ছাপ পড়ে।

ফুলে ফুলে কাঁদে কাপাসী। কেঁদে কেঁদে এক সময় হয়রান হয়ে পড়ে।

এখন আর কান্নার শব্দ নেই। ছু হাতে মুখ ঢেকে বসে রয়েছে কাপাসী। শরীরটা তির তির করে কাঁপছে।

কাপাসীর পিঠে একটা হাত রাখল হারাণ। বলল, 'ভুলে যাও কাপাসী, ভুলে যাও। না ভুললে ছুঃখু তো ঘুচব না। সারা জনম কষ্ট পাইবা।'

'ভুলুম, ভুলুম। কিন্তুক ক্যামনে?'

হাতের ফাঁক থেকে মুখ তোলে কাপাসী। ভেজা ভেজা ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, 'ক্যামনে ভুলুম পুরুষ?'

বঙ্গোপসাগরের ওপার থেকে কিছুই আনতে পারে নি কাপাসী।

কাপাসী কুমারী!

কুমারী মেয়ের থাকেই বা কী? একটি সুন্দর শরীর আর একটি নিষ্পাপ মন। সম্বল বল, বিত্ত বল, বৈভব বল, এই ছুটোই তার সব। এই শরীর আর এই মন।

কাপাসী যখন এসেছে, তখন তার শরীরও এসেছে, মনও এসেছে। কিন্তু এ শরীর, এ মন তো কুমারী মেয়ের না!

নিজের মধ্যে অসহ্য এক যন্ত্রণা, আকণ্ঠ এক তুঃখ পুরে এই দ্বীপে এসেছে কাপাসী। সেই তুঃখ, সেই যন্ত্রণা কেমন করে ভুলবে সে? কেমন করে? এর উত্তর হারাণের জানা নেই। বোবার মত কাপাসীর মুখের দিকে সে তাকিয়ে আছে।

কাপাসী এখনও বলছে, 'কইয়া দাও পুরুষ, ক্যামনে ভুলুম?'

জঙ্গলের মাথা থেকে বিষণ্ণ আলোটুকু কে যেন মুছে নিয়েছে।

খানিকটা চুপচাপ।

কিলপঙ নদীর নীল জল ছোট ছোট নুড়ি, পাথর আর গাছের শিকড়ে ঘা খেয়ে খেয়ে একটানা বেজে চলেছে।

জলের শব্দ ছাড়া এখন আর কোন শব্দ নেই।

চৌকো তেলের টিন কেটে মোটা লোহার তার পরিয়ে বালতি বানানো হয়েছে। সেই বালতি নিয়ে জল তুলতে এসেছিল কাপাসী। সেটা এক পাশে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে।

হারাণ এক বালতি জল ভরল। কাপাসীর কাছে এসে বলল, 'ক্যাম্পে চল। সন্ধ্যা হইয়া আইল।'

তু জনে পাশাপাশি টিলা বাইতে লাগল।

হারাণ বলল, 'আমাগোর (আমাদের) সগল গেছে। ঘর গেছে, বসত গেছে, জমি জমা গেছে। সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছাইড়া (ছেড়ে) আমরা ভাইসা (ভেসে) পড়ছি। কম তুঃখু, কম কষ্ট পাইলাম এই কয় বছরে! ভাবতে বসলে মাথার ঠিক থাকে না।'

একটু দম নেয় হারাণ। আবার শুরু করে, 'এই দ্বীপি আইসা আমরা মাটি পাইছি। আশ্ৰয় (আশ্রয়) পাইছি। পুরান ঘরবসত, পুরান ভিটামাটির তুঃখু ভুলতে বসছি। পুরান তুঃখু না ভুললে নতুন কইরা বাঁচুম ক্যামনে? আমাগোর (আমাদের) বাঁচতে হইব। যেমুন কইরা পারি আমরা বাঁচুম। ঐ যে পাল সাহাব

কয়, মনিষ্য হইয়া জন্মাইছি, বাঁচার লেইগা (জন্য) যুঝুম (যুঝব) না ?'

একবার কাপাসীর মুখের দিকে তাকাল হারাণ। আবছা আলোতে তার মুখটা ঠিক বোঝা যায় না।

হারাণ কাপাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই বলল, 'ঠিক কি না ?'

কাপাসী অস্ফুট একটা শব্দ করল। কি যে বলল, সে-ই জানে।

হারাণ বলে, 'কুত্তাবিড়ালও বাঁচার লেইগ্যা (জন্য) কি না করে ? আমরা মানুষ, আমরা বাঁচুম না ? বাঁচ কাপাসী, তুমি ভাল হইয়া ওঠ। এইটুক বোঝ না ; তুমি বাঁচলে যে আমিও বাঁচি।'

খুব কাছে এসে গাঢ় গলায় সে বলতে থাকে, 'পুরান দুঃখু ভুলে যাও কাপাসী, যেমনে পার ভোল। দেইখো (দেখো) এমুন দিন এমুন থাকব না। সুদিন আসব।'

'সুদিন আসব! কি যে কও পুরুষ, যত পরণ-কথা (রূপকথা)!'

হঠাৎ তীব্র, অবুঝ, অস্থির গলায় সেই হাসিটা হেসে উঠল কাপাসী।

হারাণ চমকে উঠল।

কান্নার মধ্য দিয়ে অনেক কাছে এসে পড়েছিল কাপাসী। হাসি দিয়ে হারাণকে আবার অনেকটা দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এই হাসিটাই আবার তাকে অস্বাভাবিক করে ফেলেছে।

হারাণ আর কিছু বলে না। অসহ্য আকণ্ঠ এক ব্যথায় সে বোবা হয়ে গিয়েছে।

কাপাসী হাসতেই থাকে।

মুখ বুঁজে কাপাসীর হাসি শোনে হারাণ। কাপাসীর হাসির অনেক পরত নীচে কত কান্নাই না জমে আছে!

হারাণের মনে হ'ল, কখনও সখনও হাসিটা ঠেলে সরিয়ে কাপাসীর কান্নাটা বেরিয়ে পড়ে।

একটু আগে সেই কান্নাটাই তো শুনেছে হারাণ।

ষোল

উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপ জুড়ে উৎসব শুরু হয়েছে।

জীবনের উৎসব।

পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীর পারে পারে যে জীবন তারা ফেলে এসেছে, বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে তাকে নতুন করে ফিরে পাবার কাজে লেগেছে সবাই।

জোয়ান-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, বউ-ঝি—কেউ বসে নেই। কুড়াল কোদাল নিয়ে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সবাই নয়। একজন বাদ।

কাপাসীর বাপ নিত্য ঢালীর এই দ্বীপের কোন ব্যাপারেই উৎসাহ নেই, উদ্যম নেই। এমন কি লাভ-লোকসানের বোধটাই নেই। সব ব্যাপারেই সে উদাসীন; একেবারেই নির্বিকার।

জঙ্গলের তলা থেকে, সাপ-জোঁক-কানখাজুরা আর হাজার জাতের সরীসৃপের মুখ থেকে মানুষগুলো মাটি ছিনিয়ে নিয়েছে। কোদালের ফলায় ফলায় মাটি চৌরস করছে।

মানুষের ঘামে, রক্তে, শ্রমে উপনিবেশ গড়ে উঠছে।

পাল সাহাব বলেছে, জমি চৌরস হয়ে যাবার পর সরকার থেকে বাঁশ, খুঁটি, দড়ি, বেতপাতা, কাঠ—ঘর তৈরির সব রকম সরঞ্জাম পাওয়া যাবে। শুধু কি সরঞ্জামই, বসতের জন্য মাটিও মিলবে।

তখন আর ট্রানজিট ক্যাম্পে একসঙ্গে সবাইকে দলা পাকিয়ে থাকতে হবে না। সবারই নিজের নিজের ঘরবসত হবে।

যে মাটি তারা হারিয়ে এসেছে, হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আবার তা ফিরে পেয়েছে। পায়ের নীচে মাটি পেয়ে সেই মাটিকে তারা বড় ভালবেসে ফেলেছে। প্রাণের সবটুকু উত্তাপ ঢেলে পরম মমতায় সেই মাটিকে তারা তৈরী করে নিচ্ছে।

মাটি! মাটি!

নতুন মাটি!

নোনা জলের মাঝখানে মিঠেন মাটি।

সেই মাটি পেয়ে মানুষগুলো মেতে উঠেছে; বিভোর হয়ে আছে। নতুন মাটি পেয়ে পদ্মা-মেঘনা-পারের পুরানো মাটির কথা তারা ভুলতে বসেছে।

না ভুলে উপায়ই বা কী?

জমি কোপানো হচ্ছে, জঙ্গল সাফ হচ্ছে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই ঘরবসত উঠবে। প্রথম বৃষ্টির জল পেলে বীজদানা পোতা হবে।

দেখতে দেখতে উপনিবেশ জমে উঠবে।

কিন্তু কাপাসীর বাপ নিত্য ঢালীর তাতে কিছুই যায় আসে না। সে জমিও কোপায় না, জঙ্গলও কাটে না। ট্রানজিট ক্যাম্পের কোন কাজেই সে নেই।

এই দ্বীপের সঙ্গে নিত্যর কোন যোগ নেই। এই উপনিবেশের জন্য তার প্রাণের টান নেই, মাথা ব্যথা নেই।

সাত পুরুষের ঘর ভদ্রাসন, ভিটামাটি ছেড়ে আসার শোকটা তার প্রাণে সব চেয়ে বেশি বেজেছে। এই শোকটা তাকে একেবারে অথর্ব করে ফেলেছে।

মুখভরা কাঁচা পাকা নোংরা দাড়ি। মেরুদাঁড়াটা দুটো খাঁজ খেয়ে দুমড়ে আছে। খসখসে কালো চামড়া থেকে খই ওড়ে।

বয়স এখনও পঞ্চাশ পেরোয় নি। এরই মধ্যে চুলগুলো পেকে

কেমন একটা পাঁশুটে রঙ ধরেছে। খাওয়া শোয়ার কিছু ঠিক নেই। ইচ্ছা হ'ল খেল, ইচ্ছা হ'ল ঘুমলো। টিকে থাকতে হ'লে সাধারণ যে জৈবিক নিয়মগুলি মেনে চলতে হয়, তাদের ধার ধারে না নিত্য। নগদ নগদ ফলও সে পাচ্ছে।

শরীরটা দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে। মাংসহীন দেহের চওড়া চওড়া হাড়গুলি বেরিয়ে পড়েছে। নাকের দু পাশে গোলাকার ছুটো বড় গর্ত। সেই গর্তের ভিতর গরুর চোখের মত একজোড়া অবোধ, অসহায় চোখ।

ফুর্তি নেই, হাসি নেই, আনন্দ নেই। বেঁচে থাকতে হ'লে মানসিক যে উপকরণগুলির দরকার, তার ছিটেফোঁটাও নেই নিত্যর মধ্যে।

অকালে সে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। দেশভাগ তাকে একেবারে বিকল করে ফেলেছে।

দিনরাত দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি রেখে ট্রানজিট ক্যাম্পের টিলায় চুপচাপ বসে থাকে নিত্য। কেউ ডাকলে সাড়া দেয় না। নিজের খেয়ালে বিড় বিড় করে কি যে বকে যায়, কে বলবে?

প্রথম প্রথম পাল সাহাব ধমক ধামক দিয়েছে। কিন্তু কিছুই লাভ হয় নি।

কোন কথাই বলে না নিত্য। উদ্‌ভ্রান্তের মত চেয়েই থাকে। পাল সাহাবের কোন কথাই যেন তার কানে ঢোকে না।

ধমক ধামক, চিল্লাচিল্লিতে যখন কিছুই হ'ল না, তখন তার পিঠে একখানা হাত রেখে অনেক বুঝিয়েছে পাল সাহাব, 'ছাখ শালে, দুঃখু করে আর কী করবি? তামাম জিন্দগী এমন করে চলবে না।'

ডাইনে-বাঁয়ে নিত্য মাথা ঝাঁকায়। মাথা ঝাঁকিয়ে কি যে সে বোঝায়, কে বলবে?

পাল সাহাব আবার বলে, 'হাল এমন থাকবে না। জমানা এক রোজ বদলাবেই। জমিন পেয়েছিস, ফসল ফলা। মাটি পেয়েছিস,

কুঠি বানা। এ্যায়সা জমানা এ্যায়সা থাকবে না রে শালে, কভী এ্যায়সা থাকবে না।'

পাল সাহাবের স্বরটা আস্তে আস্তে গাঢ় হয়ে ওঠে।

হাজার বুঝিয়েও নিত্য ঢালীকে বশে আনতে পারে নি পাল সাহাব। যে জিদ ধরেছে বুঝ মানবে না, তাকে বুঝ মানানো কি সহজ কথা!

অবশ্য পাল সাহাব হার মানে নি, হাল ছাড়ে নি।

সকালে ট্রানজিট ক্যাম্পে এসে নিত্যকে নিয়ে পড়ে পাল সাহাব। আবার জমির কাজ সেরে সন্ধ্যার পর আর এক দফা বোঝায়।

আজকাল পাল সাহাব আসার আগেই ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়ে নিত্য ঢালী। বয়স তার পঞ্চাশ পূরতে চলল। জীবনে তো কম দেখে নি, কম শোনে নি, কম বোঝে নি সে। অভিজ্ঞতাও তার কম হয় নি।

পাল সাহাব নতুন কি আর বোঝাবে? এ সব কি আর সে জানে না? সবই সে জানে, সবই বোঝে। কিন্তু আশায় বুক বাঁধতে পারে কই?

পাল সাহাব বলে, জমানা বদলে যাবে, এমন দিন আর এমন থাকবে না। নিত্য জানে, সবই বদলে যাবে, কিছুই এমন থাকবে না।

তবু তার মন বুঝ মানে না।

তার সামনে আশা নেই, পিছনে ভরসা নেই।

জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে এরিয়াল উপসাগরে যাওয়ার পথটা খুঁজে বার করেছে নিত্য ঢালী। সকালে পাল সাহাব ট্রানজিট ক্যাম্পে আসার আগে সে উপসাগরের পারে চলে যায়। সারাটা দিন এবং রাত্রির অনেকখানি কাটিয়ে যখন ক্যাম্পে ফেরে, অন্ধকার আর গাঢ় কুয়াশায় সমস্ত দ্বীপটা তখন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। সে আসার আগেই পাল সাহাব তার ঝুপড়িতে চলে যায়।

আজও এরিয়াল উপসাগরের পারে এসে পড়ল নিত্য ঢালী।

উপসাগরের এক কিনারে বিরাট এক খণ্ড পাথর। লোনা জলে পাথরটার অনেকখানি ক্ষয়ে গিয়েছে। ক্ষয়ে ক্ষয়ে কচ্ছপের আকার পেয়েছে পাথরটা।

রোজ এই পাথরটার উপর এসে বসে নিত্য।

বেশ খানিকটা আগেই সকাল হয়ে গিয়েছে।

সামনের দিকে নাম-না-জানা ছোট্ট একটা দ্বীপ। সকাল হয়েছে তবু কুয়াশা ঘোচে নি, হাল্কা একটা পর্দার মত দ্বীপটাকে জড়িয়ে আছে।

ফিনফিনে রূপালী ডানায় সকালের সোনা মেখে উড়ুক্কু মাছগুলি উড়ছে। সাগরপাখিগুলো ছোঁ মেরে মেরে উপসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সামনে যতদূর তাকানো যায়, ছোট ছোট দ্বীপ। দ্বীপের ফাঁকে ফাঁকে, দ্বীপ পেরিয়ে কালো, অফুরন্ত, অশান্ত সমুদ্র।

সমুদ্র থেকে ঢেউ আসে উপসাগরে। উপসাগরের ঢেউ বিপুল আক্রোশে পারের ভাঙা ভাঙা ক্ষয়িত পাথরে আছাড় খায়। নোনা জল অবিরাম গর্জায়।

উড়ুক্কু মাছ, কুয়াশা, দূরের ছোট ছোট দ্বীপ, সাগরপাখি— কিছুই দেখছিল না নিত্য ঢালী। উদাস চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের কথাই ভাবছিল সে।

কী মানুষ ছিল সে, আর কী হয়ে গেল!

পাল সাহাব যখন বলে, 'জমিন পেয়েছিস, ফসল ফলা। মাটি পেয়েছিস, বসত বানা'; তখন মনে মনে হাসে নিত্য ঢালী।

নিজের মনেই সে বলে, 'জমিনের কি দেখছিস পাল সাহাব! ফসলের কি দেখছিস! আমারে ফসলের কথা শুনায় পাল সাহাব!'

তাজ্জবের কথাই।

যে লোকটা দেশে থাকতে অসুরের মত খাটতে পারত, এক

হাতে পঁচিশ কানি তে-ফসলা জমি চষত ; আউশ, আমন আর রবি শস্য, বছরে তিনবার ফসল তুলত, তাকে চাষের কথা শোনায় পাল সাহাব !

যে লোকের সাতাশের বন্দের আটচালা ঘর ছিল তিনখানা, ডোল ছিল আট খানা, তাকে ঘর বসতের কথা শোনায় পাল সাহাব !

সবই ছিল। কিন্তু আজ আর কিছুই নেই।

ঘর না, ভদ্রাসন না, জমিজিরাত, হাল হালুটি, কিছুই না। এমন যে বংশের ইজ্জত মান, তাও না। শুধু মাত্র প্রাণটুকু ধিকি ধিকি করে টিকে আছে।

ভাবতে ভাবতে মাথাটা গরম হয়ে ওঠে নিত্য ঢালীর।

মানই যখন বাঁচল না, তখন আর প্রাণের মায়া সে করে না।

এক এক সময় নিত্য ভাবে, আবার সে দেশে ফিরে যাবে। শরীর আর মন এমন ভেঙে পড়েছে, যাতে নতুন করে এই দ্বীপে আর জীবন গড়ে তোলা সম্ভব না। সব উদ্যম, সব উৎসাহ, প্রাণ-শক্তির সবটুকু তার ফুরিয়ে গিয়েছে।

একমাত্র ভাবনা কাপাসীকে নিয়ে।

ভাবনা! কাপাসীকে নিয়ে আবার ভাবনা কিসের ? কাপাসী সব ভাবাভাবির বাইরে। বাপ হয়ে সে কাপাসীকে বাঁচাতে পারল কই ? যে বেড়া আগুন থেকে বাঁচবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে এই দ্বীপে পালিয়ে এসেছে, তাকে ঠেকাতে পারল কই ?

কাপাসীকে যখন বাঁচাতেই পারল না, তখন আর এখানে থেকে কি হবে ? কপালে যা আছে, থাক। দেশেই চলে যাবে নিত্য ঢালী।

কাপাসীর কথা মনে আসতেই হাউ হাউ করে অনেকক্ষণ কাঁদল নিত্য, টেনে টেনে চুল ছিঁড়ল। কান্না থামিয়ে একসময় ঝিম মেরে

বসে রইল। কোঁচকানো, তোবড়ানো গালে চোখের নোনা জলের দাগ আস্তে আস্তে শুকিয়ে গেল।

ভট্—ভট্—ভট্—

এরিয়াল উপসাগরে মোটর বোটের শব্দ হ'ল।

নিত্য ঢালী চমকে উঠল। চমকটা বেশিক্ষণ রইল না, আস্তে আস্তে থিতিয়ে গেল।

রোজই ঠিক এই সময়টায় মোটর বোটটা এরিয়াল উপসাগরে আসে। একটা লোক, তার নাকটা থ্যাবড়া, চোখদুটো কুতকুতে, লাফ মেরে জলে নামে। তারপর ডুব মেরে জল থেকে কি যেন তুলে আনে। আর একটা লোক মোটর বোটে বসে থাকে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, যতক্ষণ আলো থাকে, যতক্ষণ উপসাগরের তলাটা অস্পষ্ট হয়ে না যায়, ততক্ষণ জলেই থাকে লোকটা।

এই লোকদুটো, এই মোটর বোটটা, কোথা থেকে আসে, কেনই বা আসে, উপসাগর থেকে কী-ই বা তোলে, কিছুই জানে না নিত্য ঢালী।

প্রথম প্রথম খেয়াল করত না নিত্য। নিজের ধান্দায়, নিজের চিন্তায় সে অস্থির, উন্মাদ। তার ভাবনা কে ভাবে?

ধীরে ধীরে তার কৌতূহল হ'ল।

আজকাল মোটর বোটের শব্দ শুনলেই নিত্য কান খাড়া করে। যতক্ষণ বোটটা উপসাগরে থাকে, একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। থ্যাবড়া-নাক, কুতকুতে-চোখ লোকটা জল থেকে কি তোলে, তা লক্ষ্য করে।

কৌতূহল তার দিন দিন বেড়েই চলে।

এরিয়াল উপসাগরে আজও মোটর বোটটা এসেছে।

যুবতীর সাধের কি শেষ আছে ?

তার সমস্ত মন জুড়ে সর্বাঙ্গ ঘিরে শুধু সাধ আর সাধ। অফুরন্ত, অনন্ত সাধ। সোয়ামীর সাধ, সন্তানের সাধ, ঘরের সাধ।

সাধ তো কত!

তবু একটা সাধও মিটল না তিলির। একটা আশাও তার পুরল না।

একটা সোয়ামী সে পেয়েছে ঠিকই। বাপ-মা গুরু-পুরুত-আগুন সাক্ষী রেখে যার হাতে সঁপে দিয়েছে, সে সোয়ামী বৈ কি ?

সোয়ামী !

আজকাল হরিপদর কথা ভাবলেই ঠোঁট দুটো বিদ্রূপে বেঁকে যায় তিলির। ফিস ফিস করে সে বলে, 'সোয়ামী! সাত জন্মের ভাতার!'

অবজ্ঞায় নাকের ডগাটা তির তির করে কাঁপে তিলির।

সারা জীবন হরিপদ তাকে দিয়েছে কী ?

অরণ্যের তলা থেকে, সাপ-জেঁাকের মুখ থেকে এই দ্বীপের মাটি ছিনিয়ে নিতে নিতে একটা হিসাব বোধ জেগেছে তিলির মধ্যে।

এতকাল মুখ বুঁজে হরিপদর মন যুগিয়ে চলেছে সে। আজকাল সে হিসাব কষে। কি পেল, কতটুকু পেল, তার চুলচেরা হিসাব।

হরিপদ তাকে কিছুই দেয় নি। না বলতে কিছুই না। একটা ছেলে না, মনের মত একটা ঘর না। এমন কি নীরোগ, তাজা একটা পুরুষদেহ পর্যন্ত না।

তিলির যখন বিয়ে হয়েছিল তখন সে কিশোরী।

দেখতে দেখতে সে ভরে উঠল। প্রচুর স্বাস্থ্যে, অফুরন্ত যৌবনে কিশোরী যুবতী হয়ে গেল।

কোন দিন হরিপদ কি তার দিকে তাকিয়ে দেখেছে? দেখবে কি? ব্যারাম, ব্যারাম, বুকে হাঁপির টান। অস্থিসার, রোগা, জিরজিরে দেহ। লিকলিকে হাত-পা। বুকে হাত চেপে হিক্কা আর হাঁপানি সামলাবে, না তিলির ভরন্ত পুরন্ত অফুরন্ত যৌবনের দিকে তাকাবে? সময় কোথায় হরিপদর? সামর্থ্য কোথায়?

অধর্ম বল, অসৎ বল, যুবতীর দেহ তো তার নিজের বশে নয়। রাত্রি যখন গাঢ় হয়েছে, তিলির নিশ্বাস দ্রুত তালে পড়েছে, চোখ দুটো সাপের মত জলেছে। গা অস্বাভাবিক গরম হয়ে উঠেছে। তিলির মনে হয়েছে, রক্তের মধ্যে তার আগুন ধরে গিয়েছে। ভিতরের তাপ চামড়ায় ফুটে বেরিয়েছে। গায়ে জল ঢেলেও সে তাপ জুড়োতে পারে নি তিলি।

উপরে জল ঢেলে চামড়া ঠাণ্ডা করা যায় কিন্তু রক্তের তাপ কি তাতে জুড়োয়? ভিতরের আগুন কি এত সহজে নেবে?

বনের আগুন তো সবাই দেখে, মনের আগুন দেখার চোখ ক' জনের? আর যারই থাক, অন্তত হরিপদর সে চোখ নেই। যদি থাকত?

থাকলেই বা কী হ'ত?

কিছুই না। কিছুই আসান হ'ত না তিলির!

নিত্য দিন ব্যারামে ভোগে যে হরিপদ, দিবারাত্রি হাঁপির টানে যে কাবু হয়ে থাকে, সাধ্য কি তার তিলির মনের আগুন, দেহের আগুন নেবায়? মনে সাধ থাকলেও তার দেহে সামর্থ্য কোথায়?

ভরা দেহ আর ভরা যৌবন নিয়ে সারাটা জীবন শুধু জ্বলছেই তিলি। তবু দেহের জ্বালার কথা সে ভাবে না। মনের পোড়াকে সে মানে না। হরিপদর মন যুগিয়েই সে চলে।

তবু তার মন পায় কই তিলি ?

রোগা, জিরজিরে, অস্থিসার দেহটার মধ্যে হরিপদর মনটা যে কোথায়, দশ বছর এক সঙ্গে ঘর করেও খুঁজে পেল না তিলি।

কিন্তু কত আর সয় ?

এখন কত রাত কে বলবে ?

ট্রানজিট ক্যাম্পটা নিঝুম হয়ে গিয়েছে।

কুয়াশা, অন্ধকার আর গাঢ় একটি ঘুমের মধ্যে উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপটা তলিয়ে গিয়েছে।

টিলার পাশ থেকে কুর্মি ফুলের ঝাঁঝালো গন্ধ আসছে।

থেকে থেকে একটা রাত-অন্ধ বাদক পাখি ককিয়ে উঠছে। এলোপাথাড়ি মৌসুমী হাওয়া ছুটেছে।

পাখির ককানি আর হাওয়ার শনশনানি ছাড়া এই দ্বীপে এখন কোন শব্দ নেই। অদ্ভুত এক স্তব্ধতার মধ্যে দ্বীপটা হারিয়ে গিয়েছে।

টিলার মাথায় একা চুপচাপ বসে রয়েছে তিলি। দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনিটা গেঁথে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটো ধক ধক করছে।

খুন চেপেছে তিলির। শুধু কি খুন, মাথার ভিতর আগুন ধরে গিয়েছে। কিছু একটা সর্বনাশ না ঘটিয়ে সে ছাড়বে না।

উত্তেজনায় অল্প অল্প কাঁপছে তিলি। অসহ্য এক উত্তেজনার বেগ শিরায় শিরায় ছুটে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই তাকে দাবানো যাচ্ছে না। দাবাতে চায়ও না তিলি।

এই কুয়াশা, এই অন্ধকার আর শরীরের এই থরথরানির মধ্যে তিলি ঠিক করে ফেলল, সর্বনাশেই সে গা ভাসাবে।

কুলমানের কথা সে ভাবে না। সোয়ামীর কথা সে ভাবে না।

যে সোয়ামী থেকেও নেই, তার কথা ভেবেই বা কি হবে? লজ্জা-নিন্দা-ভয়—তিলি আজ সব কিছুর বাইরে।

লোকে কি বলবে, সে কথাও তিলি ভাবে না। লোক না পোক! না না, পৃথিবীর কারুকে ডরায় না সে। ভয়-ডর—কিছুই তাকে আজ বেঁধে রাখতে পারবে না।

মাথায় যে খুন চেপেছে, যে আগুন ধরেছে, সেই খুন আর আগুন তিলির সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল।

অনেক সয়েছে তিলি। আর না।

এতকাল হরিপদর খালি সন্দেহই ছিল। সেই সন্দেহের সঙ্গে কোন রকমে আপোষ করে তার ঘর করেছে তিলি। নিজের সুখ সাধ বাদ দিয়ে সব সময় সে মানিয়ে চলেছে।

সন্দেহটা তবু সইত। আজ ঝুপড়ি থেকে লাথি মেরে তাকে বার করে দিয়েছে হরিপদ। এক টুকরা পাথর ছুঁড়ে নাকটা ছেঁচে দিয়েছে। এতক্ষণ দর দর করে রক্ত ঝরছিল।

টিলার মাথায় বসে তিলি আজ প্রথম ভাবল, সোয়ামী! সুখ থাক, শান্তি থাক, সোহাগ থাক, ছু মুঠো ভাত যে বউকে দিতে পারে না, সে আবার কিসের ভাতার? কিসের সোয়ামী?

সারাটা জীবন তাকে সন্দেহ করেছে হরিপদ। আজ মারধোরও শুরু করল। যতই ভাবল, তিলির রাগ, আক্রোশ, দুঃখ ততই বাড়তে লাগল।

কী সে করবে? কী করতে পারে?

কী না পারে সে?

হরিপদর সন্দেহ সত্য করে দিতে পারে। হরিপদর মুখে চুনাকালি লেপে দিতে পারে। নিজের মন, নিজের অঙ্গ লুটিয়ে দিতে পারে, উড়িয়ে দিতে পারে, পুড়িয়ে দিতে পারে। না পারে সে কী?

যতই ভাবল, মাথাটা গরম হয়ে উঠল।

হঠাৎ তিলি উঠে দাঁড়াল। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল, ট্রানজিট ক্যাম্পটা নিঃসাড় হয়ে রয়েছে।

এক পা এক পা করে এগুতে এগুতে ট্রানজিট ক্যাম্পের শেষ মাথায় এসে পড়ল তিলি। এখানে ছোট একটা বেত পাতার ঝুপড়ি।

ঝুপড়িটার সামনে এক মুহূর্ত দাঁড়াল তিলি। এদিক সেদিক একবার দেখে নিল। একটু দ্বিধা, একটু ভয়, একটাই মাত্র মুহূর্ত। তারপরেই ঠিক করে ফেলল। ঝুপড়ির বেড়ায় আস্তে আস্তে টোকা দিতে লাগল।

একটা, দুটো, তিনটে, অনেকগুলো টোকা দিল তিলি।

প্রথমে আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে ঝুপড়ির বেড়া ঝাঁকাতে লাগল।

চাপা, তীব্র গলায় সে ডাকল, 'জামাই, জামাই—'

তিলির গলার আওয়াজটা সাপের হিসানির মত শোনাতে লাগল।

ঝুপড়ির ভিতর মচ মচ শব্দ হ'ল। কেউ যেন বাঁশের মাচানে ধড়মড় করে উঠে বসেছে।

তিলি আবার ডাকল, 'জামাই, জামাই—'

ঝুপড়ির মধ্য থেকে ঘুমজড়ানো, আবছা গলার স্বর এল, 'কে রে?'

'আমি, আমি—'

অসহ্য গলায় তিলি বলল, 'আমি, আমি জামাই। তরাতরি (তাড়াতাড়ি) বাইরে আস। আর যে পারি না—'

একটু পরেই কঁ্যাচা বাঁশের ঝাঁপ খুলে গেল।

ঝুপড়ির ভিতর থেকে একটা লোক গুঁড়ি মেরে বাইরে বেরিয়ে এল।

গাঢ় কুয়াশায় ছুপিয়ে আবছা, অনুজ্জ্বল চাঁদের আলো এসে

পড়েছে। এ এমন একটা আলো, যাতে মানুষের চোখ দেখা যায়, কিন্তু চোখের কথা পড়া যায় না। মাটি দেখা যায় কিন্তু মাটির রং বোঝা যায় না।

এখন সব কিছুই আবছা, ঝাপসা। একটা নিরন্ত, নিঃশব্দ অস্পষ্টতায় উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপটা ডুবে রয়েছে।

লোকটা তিলির মুখোমুখি খাড়া হয়ে দাঁড়াল।

কাঁপা কাঁপা গলায় তিলি বলল, 'জামাই, তুমি আসছ—'

লোকটা যে বেরিয়ে এসেছে, নিজের চোখে দেখেও ঠিকমত বিশ্বাস করতে পারছে না তিলি।

'কি কও! কিছুই যে বুঝতে পারি না—'

ট্রানজিট ক্যাম্পের সবাই তাকে 'জামাই' বলে ডাকে। আসলে তার নাম জামাই না। আর দশ জনের মত বাপ-মায়ের দেওয়া নাম একটা আছে। কিন্তু 'জামাই' কথাটার নীচে সে নামটা হারিয়ে গিয়েছে।

তার আদত নাম যোগেন—যোগেন খরাতি। কিন্তু কি সুবাদে ট্রানজিট ক্যাম্পের সবাই যে তাকে জামাই বলে ডাকে, কে বলবে?

ফিস ফিস করে তিলি বলল, 'আমি আসলাম—'

'ব্যাপারখান কী? কিছুই যে বুঝি না!'

কিছুটা ভয়, কিছুটা উত্তেজনা, কিছুটা বা বিস্ময়ে যোগেনের গলাটা অল্প অল্প কাঁপছে।

তিলি এবার ডুকরে উঠল, 'আমার আর কেউ নাই, কিছু নাই। বাঁচার উপায় নাই।'

তিলির একটা হাত ধরল যোগেন। বলল, 'অমুন কইরো না; অমুন করতে নাই। গলার আওয়াজে কেউ বাইর হইয়া পড়ব। দেখে ফেলব—'

ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল যোগেন।

'দেখুক, দেখুক। আইজ কোন কিছুতে আমার ডর নাই। সরম-ভরমের মাথা খাইয়া আমি পুরীর বাইর হইছি।'

'চুপ কর, চুপ কর, কেও শুনব।'

'শুনুক, শুনাইতেই তো চাই। পিরথিমীর সগলে শুনুক। লাজ-নিন্দা—আমার কিছুই নাই। ক্যান থাকব?'

তিলি যেন রুখে ওঠে।

'অবুঝ হইও না তিলি। বুঝ মান, ধৈয্য ধর—'

তিলির একটা হাত ধরে ছিল যোগেন। এবার অন্য হাতটা ধরল। বলল, 'বুঝি, মনটা তোমার বশে নাই। দুঃখু পাইছ। কিন্তুক অত অবুঝ হইলে কি চলে!'

তিলিকে বোঝাতে থাকে যোগেন। কিন্তু যে জিদ ধরেছে বুঝ মানবে না, তাকে বোঝানো কি এতই সহজ! মুখের কথায় কি সে বুঝ মানে!

তিলি ক্ষেপে উঠল, 'জনমভর খালি বুঝই মানলাম, খালি ধৈয্যই ধরলাম। কিন্তুক পাইলাম কী? কী পাইছি? তুমিই কও পুরুষ—'

'আমি কী কমু (বলব)?'

বিমূঢ় মুখে তিলির দিকে তাকিয়ে রইল যোগেন।

'ভাল ভাল, বড় সুখের কথা শুনাইলা পুরুষ, বড় শান্তি দিলা!'

মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে তিলি বলতে থাকে, 'তমস্ত (সমস্ত) জীবন তোমার কথায় ভরসা কইরা আছি। তুমি যেমন কইছ, সেই মত চলছি। মনেরে বুঝ মানাইছি, ধৈয্য ধরছি। কিন্তুক আর পারি না—'

কথাটা শেষ না করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল তিলি।

'কান্দে (কাঁদে) না, কান্দে না—'

গাঢ় সস্নেহ গলায় যোগেন বলতে থাকে, 'থির হও, থির হও। মাথা ঠিক কর।'

তিলির কান্না তাতে থামে না। ফোঁপানি তার বাড়তেই থাকে। কি বিপাকেই না পড়ল যোগেন!

কেউ যদি এখন ঝুপড়ি থেকে বেরোয়, তা হলে উপায় থাকবে না। দুর্নাম রটে যাবে। পাঁচ মুখে পাঁচ কথা বেরুবে। কেউ তার কথা বুঝবে না। কোন কিছু বিচার করে দেখবে না।

দুর্নাম যখন রটে, বিচার বিবেচনা না করেই রটে। তখন দু হাতে ক'টা মুখ চাপা দেবে যোগেন?

ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে খানিকটা দূরে, টিলার মাথাটা যেখানে সবচেয়ে উঁচু, কুয়াশা ছোপানো চাঁদের আলোতে সেখানটা কেমন যেন রহস্যময় মনে হয়।

তিলিকে নিয়ে সেখানে এল যোগেন। বসল।

সামনের জঙ্গলের মাথায় চাপ চাপ অন্ধকার জমে রয়েছে। অন্ধকারের উপর সাদা কুয়াশা ফেনার মত ভাসছে।

এই টিলার চারপাশ জুড়ে কুয়াশা আর অন্ধকারের যে পর্দাগুলো ঝুলছে, আলোর সুঁচের মত তাদের বিঁধে বিঁধে জোনাকিরা একবার জ্বলছে, একবার নিবছে।

মানুষের চামড়ার স্বাদ পেয়ে বাড়িয়া পোকারা হন্যে হয়ে উঠেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে তারা তিলি আর যোগেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কামড়ে কামড়ে চামড়া ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে।

তিলির হুঁশ নেই। বাড়িয়া পোকার কামড় তার গায়ে যেন বিঁধছে না। অস্থির, অবুঝ গলায় সে বলছে, 'পিছনের সগল কিছু মুছে পুরীর বাইর হইলাম। অখন তুমিই ভরসা—'

'কী কও!'

যোগেন চমকে উঠল।

'ঠিকই কই (বলি)।'

তিলি অদ্ভুত শব্দ করে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বলল, 'মনে আছে সেই কথা?'

'কোন কথা—'

'একদিন তুমি কইছিলা (বলেছিলে) যেইদিন আর সোয়ামীর লগে (সঙ্গে) মানাইতে পারুম না, যেইদিন সে আমারে পুরীর বাইর কইরা দিব, সেইদিন তুমি আমারে আশ্যয় (আশ্রয়) দিবা। মনে আছে ?'

'আছে। কিছুই ভুলি নাই।'

'শোন পুরুষ—'

'কও—'

তিলির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল যোগেন।

'হ, কমু। কওনের লেইগাই (জন্যেই) নিশি রাইতে তোমার ঘুম ভাঙ্গাইছি।'

একটু থামল তিলি। বুকের ভিতর আটকানো বাতাসটা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল। আবার শ্বাস টানল। তারপর বলতে লাগল, 'মায়ের কাছে শুনছি, বাপের মুখে শুনছি, পিরথিমীর সগল মনিষ্যের মুখে শুনছি, সোয়ামী হইল সগল গুরুর গুরু। মাথার মণি। তমস্ত (সমস্ত) জনম তারে মাথাতেই রাখছি, তার মন যুগাইয়া চলছি। ভরা শরীল ভরা যৈবনে পুড়ছি, জ্বলছি, খাক হইছি। তবু নিজের কথা ভাবি নাই। যৈবনের দিকে তাকাইয়া নিজের ভরা শরীলের দিকে তাকাইয়া বুক কাঁপছে। যুবতীর যৈবন কি তার নিজের বশে! ডরে অন্য দিকে মুখ ঘুরাইয়া রাখছি। তবু সোয়ামীর মন পাইলাম না।'

এক মুহূর্ত উদাস হয়ে রইল তিলি। আবার শুরু করল, 'ফিরা ফিরা তোমার কাছে আসছি। তুমি সোয়ামীর কাছে ফিরাইয়া দিয়েছ। সোয়ামীর লেইগা (জন্য) কি করছি আর কি না করছি, তুমি তো সগলই জান!'

'জানি। সগল জানি।'

'কিন্তুক আমি আর পারি না। আর পারুম না—'

তিলি ক্ষেপে উঠল, 'জান সে আইজ (আজ) কী করছে ?'

'কী করছে ?'

'আমারে পুরীর বাইর কইরা দিছে। আমারে নিয়া আর সে ঘর করব না।'

হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল তিলি। যোগেনের হাঁটুর উপর কপাল ঠুকতে ঠুকতে বলতে লাগল, 'আমি আর ফিরুম (ফিরব) না, ফিরুম না, কিছুতেই না। তুমি আমারে নাও জামাই—'

কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে বসে রইল যোগেন। খানিকটা ধাতস্থ হয়ে ছু হাতে তিলির মুখটা তুলে ধরল। বলল, 'অবুঝ হইও না—'

'না না, অনেক সয়েছি। আর পারি না, আর পারি না। হা ভগমান !'

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল তিলি। কান্নার দমকে তার শরীরটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

খানিকটা চুপচাপ।

কান পেতে যোগেন তিলির একটানা কোঁপানি শুনতে লাগল।

এক সময় কোঁপানি থামল। মাঝে মাঝে থেমে থেমে কেমন এক ধরনের হেঁচকির মত শব্দ করতে লাগল তিলি। তার শরীরটা তির তির করে কাঁপতে লাগল।

ছু হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে বসে ছিল তিলি। তার পিঠে একখানা হাত রাখল যোগেন। আস্তে আস্তে বলল, 'চল, তোমারে ঘরে দিয়া আসি—'

সাঁ করে মুখ তুলল তিলি।

রুক্ষ চুল ভেঙে মুখময় ছড়িয়ে রয়েছে। চোখের জলে চুল, ভুরু ভিজে গিয়েছে। অনেকক্ষণ কেঁদেছে তিলি। চোখের পাতা ফুলে উঠেছে।

গাঢ় কুয়াশা চুঁইয়ে যেটুকু চাঁদের আলো এসেছে, তাতে তিলির

মুখটা ঠিকমত বোঝা যায় না। যেটুকু বোঝা যায়, তাতেই চমকে উঠল যোগেন।

তিলির গলা চিরে তীক্ষ্ণ, ধারাল শব্দ বেরুল, 'কী কইলা (বললে) ?'

যোগেন আগের কথাটাই বলল, 'চল, তোমারে ঘরে দিয়া আসি—'

'ঘর !'

আচমকা খিল খিল করে হেসে উঠল তিলি। হাসির দাপটে তার দেহটা ভেঙেচুরে যেন একটা দলা পাকিয়ে যাবে। হাসতে হাসতেই সে বলল, 'ঘর তুমি কারে কও! চার পাশে চার খান বেড়া আর উপুরে একখান চাল থাকলেই ঘর হয়! আ গো পুরুষ—'

বিব্রত গলায় যোগেন বলল, 'তোমার সোংসার—'

'সোংসার! হ, আমারই সোংসার!'

হঠাৎ চুপ করে গেল তিলি।

জঙ্গলের মাথায় সাগরপাখিরা ডানা ঝাপটাচ্ছে। কুয়াশা বিঁধে চোখ চলে না। তবু মনে হ'ল, চাঁদ ডুবে যাচ্ছে। রাত আর বেশি নেই। একটু পরেই ভোর হয়ে যাবে। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রানজিট ক্যাম্পটা জেগে উঠবে। চেইনম্যান, পাটোয়ারী, রাঁচী কুলী, নানা সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে পাল সাহাব এসে পড়বে।

নিজেকে শক্ত করে নিল যোগেন। রুক্ষ, উগ্র গলায় বলল, 'ওঠ—'

'ক্যান ?'

'তরাতরি (তাড়াতাড়ি) ওঠ। লষ্ট মাগী !'

যোগেনের গলার আওয়াজ শুনে তিলি চমকে উঠল। কিন্তু উঠল না।

এবার একটা হাত ধরে টান মেরে তিলিকে দাঁড় করিয়ে দিল

যোগেন। বলল, 'ঘর-সোংসার-সোয়ামী ছাইড়া নিশি রাইতে লাগরের কাছে আসছ! কুচরিত্তির, ডাকাবুকা মাগী!'

তিলি থতমত খেয়ে গিয়েছে।

সেই সুযোগে তাকে টানতে টানতে ট্রানজিট ক্যাম্পটার দিকে নিয়ে চলল যোগেন।

যে মেয়েমানুষ লজ্জা-নিন্দা-ভয় আর শরম-ভরমের মাথা খেয়ে ঘরের বার হয়েছে, তার থতমত ভাব কতক্ষণ থাকে?

যোগেনের হাত থেকে নিজের হাতটা ছুটিয়ে নিয়ে তিলি বলল, 'তোমার মতলবখান কী?'

'কী আবার মতলব?'

যোগেন রুখে উঠল।

'আমারে কোথায় নিয়া চললে?'

যোগেন জবাব দিল না। হাত বাড়িয়ে তিলির হাতটা আবার ধরে ফেলল।

তিলি বলল, 'কথা কও না যে?'

'কী কমু (বলব)?'

'আমারে কোথায় নিয়া চললে?'

'যেইখানে থাকলে তোমারে সব থিকা বেশি মানায় সেইখানে।'

'অ!'

একটু চুপ করে রইল তিলি। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'চল।'

তিলির হাত ছেড়ে দিল যোগেন। দু জনে পাশাপাশি ট্রানজিট ক্যাম্পের ঝুপড়িগুলোর দিকে এগুতে লাগল।

তিলি ডাকল, 'জামাই—'

'কও।'

'আমি আবার আসুম (আসব)। দেখুম, কয়বার তুমি আমারে ফিরাইতে পার। আমি জানি, বেশিদিন তুমি আমারে ঠেকাইয়া রাখতে পারবা না। হ গো পুরুষ—'

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল তিলি। অল্প একটু হাসল। তারপর সামনের একটা ঝুপড়িতে ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল যোগেন। অস্ফুট গলায় বলল, 'মেয়েমানুষ, তোমার মনে কী আছে, তুমিই জান!'

আঠার

চারপাশে সমুদ্র, মাঝখানে দ্বীপ। চারপাশে নোনা জল, মাঝখানে মিঠে মাটি।

একদিন মাটি কোপানো, আগাছা বাছা শেষ হ'ল।

এখন শুধু অঝোর ধারায় কয়েক পশলা বৃষ্টির অপেক্ষা।

এখন অসময়।

বীজদানা বোনার পক্ষে এটা সুদিনও নয়, মরশুমও নয়। কিন্তু সুদিন-মরশুম না হ'লে কি হবে, পাল সাহাবের তর আর সয় না।

পাগলা সেই যে স্বপ্ন দেখেছে, উত্তর আন্দামানের কুমারী মাটি ফসলে ভরে যাবে, তাতেই সে বিভোর হয়ে আছে। চোখ থেকে সেই স্বপ্নটা কিছুতেই মুছে যাচ্ছে না।

শীতের এক মধ্য দুপুরে মানুষগুলো বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে উপনিবেশ গড়তে এসেছিল। এখন চৈত্র মাস যায় যায়। পুরা তিনটে মাস তারা এখানে কাটিয়ে দিল।

আসল বর্ষা শুরু হবে সেই আষাঢ়ে।

কিন্তু এখন, এই চৈত্রে সমস্ত আন্দামান দ্বীপ জুড়ে একটা নকল বর্ষার মহড়া চলে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে আচমকা একটা মৌসুমী বাতাস ওঠে। সেই বাতাসটা পোড়া তামারঙের টুকরো টুকরো অসংখ্য মেঘকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে এই দ্বীপের মাথায় এনে তোলে। এখানে এসে মেঘগুলো জমাট বেঁধে যায়। আকাশটা আড়াআড়ি ফেঁড়ে বিদ্যুৎ চমকায়। আকাশ-জোড়া বিরাট মৃদঙ্গ-টায় যেন গুরু গুরু ঘা পড়ে।

আকাশের সাজা শেষ হ'লে এক সময় বর্ষা শুরু হয়ে যায়। সীসার ফলার মত অজস্র ধারায় বৃষ্টি নামে।

পাল সাহাবের ইচ্ছা, নকল বর্ষার জল পেয়ে মাটি নরম হ'লেই বীজদানা পুঁতবে। ফসল ফলুক আর নাই ফলুক, জঙ্গলের মুখ থেকে যে মাটি পাওয়া গেল তার গর্ভিণী হওয়ার ক্ষমতা কতখানি অন্তত তা পরখ করা যাবে।

নৈঋর্ত কোণের মৌসুমী বাতাস যদিও উঠল, মেঘ আর আসে না। আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে শেষ পর্যন্ত ক্ষেপে উঠল পাল সাহাব। খুব একচোট খিস্তি করল, 'শালে, রেণ্ডির বাচ্চা—'

তবু আন্দামানের আকাশে মেঘ আসে না।

জমি চৌরস হয়ে গিয়েছে। এখন মানুষগুলোর হাতে কোন কাজ নেই। এদিকে বৃষ্টিও নামে না।

অগত্যা বাঁশ, খুঁটি, বেতপাতা, কাঠ, পেরেক—ঘর তৈরির সমস্ত সরঞ্জাম মানুষগুলোকে বাটোয়ারা করে দিল পাল সাহাব। ঘর তোলার জন্য জমি মাপ-জোখ করে দিল। বলল, 'এবার আপনা আপনা কোঠি বানিয়ে নে শালে লোগ। বিশ রোজের অন্দর কোঠি বানানো খতম করা চাই।'

বিশ দিনের মধ্যেই ঘর উঠে গেল। ট্রানজিট ক্যাম্প ছেড়ে সবাই যে যার ঘরে গিয়ে উঠল।

জমি চৌরস হ'ল, ঘর উঠল। তবু মেঘ এল না।

ফেল্ট হ্যাটটা খুলে ভুরু কুঁচকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে পাল সাহাব। বিরক্ত গলায় গজ গজ করে, 'আসমানের মর্জি বোঝা যায় না। শালে আওরাতের দিলের মাফিক বেতর্বিয়ৎ। কোন বার বারিশ (বর্ষা) আগে আসে, কোন বার মাঙলেও আসে না।'

আজ ‘ক্যাশ ডোল’ দেওয়ার তারিখ।

‘ডোল’ অর্থাৎ সরকারী খয়রাত। পূর্ণ বয়স্কদের জন্য মাসিক মাথা পিছু পনের টাকা আর চোদ্দ বছরের নীচের বাচ্চাদের জন্য দশ টাকা হিসাবে ‘ডোল’ বরাদ্দ আছে।

ব্যবস্থা আছে, যতদিন না আন্দামানের মাটিতে ফসল ফলবে, পুনর্বাসন ঠিকমত হবে, যতদিন না উপনিবেশ গড়ে উঠবে, ততদিন এই মানুষগুলো সরকারী খয়রাত পাবে।

পাল সাহাবের ঝুপড়ির সামনে মানুষগুলো দলা পাকিয়ে বসে রয়েছে।

এখন দুপুর।

মাথার উপরে নির্মেঘ নীল আকাশটা ঝকমক করছে। যতদূর যেদিকে খুশি তাকানো যাক, কোথাও এক ফালি মেঘের আঁচড় নেই।

এক ঝাঁক সাগরপাখি অনেক উঁচুতে ডানা ছড়িয়ে ঝিম মেরে আছে। তাদের ডানা নড়ে কি নড়ে না। আকাশ থেকে আগুনের হল্কা উপচে এই দ্বীপের উপর এসে পড়েছে।

বসে বসে মানুষগুলো ঘামছে।

নীচু একটা বাঁশের মাচানে বসে আছে পাল সাহাব। তার সামনে একটা উঁচু বাঁশের টেবিল। টেবিলের উপর থাকে থাকে এক টাকা, দু টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকার নোট আর রেজগি সাজানো।

পাল সাহাব নাম ডাকছে, ‘রসিক শীল—’

মানুষের দলাটার মধ্য থেকে রসিক শীল উঠে এল।

পাল সাহাবের এ পাশে পাটোয়ারী আতমন সিং, আর এক পাশে মা-তিন। মা-তিনও পাল সাহাবের সঙ্গে কাজে নেমে পড়েছে।

পাটোয়ারী আতমন সিং খাতায় রসিক শীলের টিপছাপ নিল। মা-তিন তাকে হিসাব করে গুনে ডোলের টাকা দিল।

পাল সাহাব আবার হাঁকল, 'চন্দর খরাতি—'

ভিড়ের মধ্য থেকে আর একজন উঠে দাঁড়াল।

সবাইকে ক্যাশ ডোল বুঝিয়ে দিতে দিতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

তুলোর মত সাদা, মিহি কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। সমুদ্র থেকে সব পাখি দ্বীপে ফিরে এসেছে।

রাঁচী কুলী ধানোয়ার চারপাশে চারটে পাটের মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছে। মশালগুলো কুয়াশা আর অন্ধকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যুঝছে।

দুপুরে রসিক শীলেরা যখন ক্যাশ ডোল নিতে এসেছিল, তখনই পাল সাহাব বলে রেখেছিল, 'শালে লোগ, ডোলের রুপেয়া পেলেই ভাগবি না। তোদের সাথ বহুত বাত আছে।'

কাজে কাজেই সরকারী খয়রাত বুঝে পেয়েও কেউ উঠে যায় নি। পাল সাহাবের ঝুপড়ির সামনে দলা পাকিয়ে বসে আছে।

ডোল দেওয়ার পর যে টাকা বেঁচেছে সেগুলো একটা বেতের বাক্সে পুরে তালা আঁটল পাল সাহাব। তারপর চিৎকার করে উঠল, 'এ রসিক শীল, এ যুগেন, এ বুড্‌ঢী, এ বুড্‌ঢা, এ জওয়ান, এ জওয়ানী, এ শালে লোগ—'

তিনটে মাস এক সঙ্গে এই দ্বীপে উপনিবেশ গড়তে গড়তে মানুষগুলো বুঝে ফেলেছে, চিল্লাচিল্লি করাটা পাল সাহাবের স্বভাব। কথায় কথায় সে বলে, 'শালে লোগ।' 'শালে লোগ' শব্দটা তার কথার লজ। খিস্তি করাটা তার অভ্যাস।

পাল সাহাবের চিল্লানিতে মানুষগুলো খাড়া হয়ে বসল।

পাল সাহাব বলতে লাগল, 'আর আর বরষ এর আগেই বারিশ (বৃষ্টি) নামে। লেকিন এ বছর আসমান যে কি মতলব করেছে—'

কথাটা পুরা না করেই সে থেমে গেল।

জটলার ভিতর থেকে হারাণ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'একটা কথা কমু পাল সাহাব?'

'কী কথা?'

ফেল্ট হ্যাটটা কপালের উপর তুলে পাল সাহাব খেঁকিয়ে উঠল।

'মাটি তো কুপাইলাম, ঘর বানাইলাম। জল তো নামে না। বীজদানাও রুইতে পারি না। অখন কী করুম? বিষ্টির আশায় কয়দিন বইসা থাকুম?'

'আরে হারামী—ইধর আয়—'

ভয়ে ভয়ে পাল সাহাবের কাছে এসে দাঁড়াল হারাণ।

হারাণের একটা হাত ধরে সস্নেহ গলায় পাল সাহাব বলল, 'আমিও তো একই বাত ভাবছিলাম। তোদের সাথ একটা পরামর্শ করব। আমার মাথায় এক মতলব এসেছে।'

'কী মতলব?'

সামনের দলা পাকানো লোকগুলো বলে উঠল।

'সবুর শালেরা, সবুর—'

পাল সাহাব ধমকে উঠল। একটু পর নরম গলায় শুরু করল, 'তামাম জিন্দগী ডোলের ওপর ভরসা করে বাঁচা যায় না। সিরকারী ভিক্ষের ওপর দু রোজ, দশ রোজ, বড় জোর এক বরষ দো বরষ চলে। কী বলিস তোরা?'

'হাঁ—'

একসঙ্গে সকলে সায় দিল।

'হাত আছে, পা আছে, মগজ আছে, বুদ্ধি আছে, খাটবার তাগদ আছে, তবে ভিক্ষে করে জিন্দগী চালাবি কেন?'

'ঠিক কথা।'

মানুষগুলো মাথা নাড়ে।

'মানুষ হয়ে জন্মেছিস, মানুষের মাফিক বাঁচবি।'

একটুক্ষণ কি যেন ভেবে নিল পাল সাহাব। তারপর বলতে

লাগল, 'কিসমতের দোষেই হোক আর যাতেই হোক, তোরা ঘরবস্তি হারিয়েছিস। এই জাজিরাতে (দ্বীপে) এসে আবার ফিরেও পেয়েছিস। কেমন কিনা ?'

'হ পাল সাহাব—'

'এখানেই তোদের জিন্দগী বানিয়ে নিতে হবে।'

সবার মুখের উপর দিয়ে চোখদুটো একবার ঘুরিয়ে নিয়ে গেল পাল সাহাব। বলতে লাগল, 'শোন শালেরা, আমার মাথায় এক মতলব এসেছে।'

'ক'ন (বলুন)—'

'মাহিনা (মাস) খতম হলেই তোরা ক্যাশ ডোল পাস। পাস কি না ?'

'হ, পাই।'

'আসছে মাহিনা (মাস) থেকে ক্যাশ ডোল আর পাবি না।'

মানুষগুলো আঁতকে উঠল, 'ক্যাশ ডোল না পাইলে খামু কী ? অখনও জল নামল না, বীজ রুইলাম না, ফসল ফলল না। খামু কী তবে ?'

পাল সাহাব জবাব দিল না।

তার চোখ দুটো সামনের মানুষ, দূরের কুয়াশা, আরো দূরের আবছা জঙ্গল পেরিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

পাল সাহাব ভাবছে।

মাস যেই কাবার হয়, কানুন অনুযায়ী এই মানুষগুলো সরকারী ডোল পায়। পাল সাহাব লক্ষ্য করে দেখেছে, সেটেলমেন্টের বেশির ভাগ লোকই এই খয়রাতের উপর নির্ভর করে থাকে। ডোল পাওয়ার নির্ভরতা আছে বলেই, তার মনে হয়, মানুষগুলো যতটা উচিত, ততটা খাটে না।

কিন্তু ভাঙাচোরা, বিকল জীবনকে বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ

দ্বীপে নতুন করে গড়ে তুলতে হ'লে এই মানুষগুলোকে আরো খাটতে হবে।

এই মানুষগুলো মাটি কুপিয়েছে, জমি বানিয়েছে, ঘর তুলছে ঠিকই। কিন্তু এতো সবে শুরু। আরো চাই। আরো ঘাম, আরো শ্রম চাই।

শুধু শ্রম আর ঘামই কী ?

আরো অনেক কিছুই চাই।

পদ্মা-মেঘনা পারের মাটি খুইয়ে এসে মানুষগুলো এই দ্বীপটাকে ভালবাসতে শুরু করেছে। পাল সাহাব তা জানে।

কিন্তু মাটির প্রতি ভালবাসাই তো শেষ কথা নয়।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে এসে পায়ের তলায় যে আশ্রয় তারা পেয়েছে, বাঁচার জন্য সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরতে হবে।

অনেক দুঃখ উজান বেয়ে তারা এই দ্বীপ পেয়েছে। অনেক লোনা জল ঠেলে এসে এই মাটি মিলেছে।

এই মাটির জন্য আরো তাপ, আরো মমতা চাই।

পাল সাহাব ভাবল, এই মানুষগুলোর মন দ্বীপমুখী করে দিতে হবে।

শুধু কি দ্বীপমুখী ?

এদের জীবনমুখী না করা পর্যন্ত যে তার শান্তি নেই, তার থামা চলবে না। তার সব স্বপ্ন, সব আয়োজনই যে তা হ'লে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

পাল সাহাব জানে, এই মানুষগুলো তার ইচ্ছায় চলে, ফেরে, ওঠে, বসে। তার ধমকে খায়, ঘুমোয়। দু চার জন ছাড়া বাকী সকলেই কেমন যেন ঠাণ্ডা, নির্জীব, বিকল। এদের জীবনে তাপ নেই, জ্বালা নেই, কোন ব্যাপারে তেমন উদ্যম নেই।

কিন্তু এমন করে এই পঙ্গু মানুষগুলোকে সম্বল করে তো এই বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ দ্বীপে জীবন গড়া যায় না।

পাল সাহাবের মনের গঠনটা অদ্ভুত। নিজের নিয়মে সে এই মানুষগুলো সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবে, অনেক কথা ভেবেছে।

দেশভাগ এই মানুষগুলোকে সাতপুরুষের ভিটামাটি, জমিজিরাত থেকেই শুধু উৎখাত করে নি; সুস্থ, সহজ, স্বাভাবিক জীবন থেকেও উৎখাত করে ফেলেছে।

দেশভাগের পর ভাসতে ভাসতে তারা সরকারী উদ্বাস্তু ক্যাম্পে এসে মাথা গুঁজেছিল। ন' দশ বছর ক্যাশ ডোল আর সরকারী খয়রাতের উপর তারা বেঁচে ছিল।

দেশভাগ তাদের ঘরছাড়া করেছে। উদ্বাস্তু ক্যাম্পের ন' দশ বছরের জীবনে তারা সব খুইয়েছে। মানুষের মত বেঁচে থাকতে হ'লে মোটামুটি জীবনের যে ধর্মগুলো মেনে চলতে হয়, ক্যাম্পে এসে সেগুলোও তারা হারিয়ে ফেলেছে।

ক্যাম্প তাদের ক্যাশ ডোল, খয়রাত এবং ভিক্ষের উপর নির্ভর করতে শিখিয়েছে।

নিজের খাদ্য যে নিজেকে জুটিয়ে নিতে হয়, নিজের জীবন যে নিজের নিয়মে গড়ে তুলতে হয়, মানুষের মত বেঁচে থাকতে হ'লে সব কিছুই যে নিজেকে অর্জন করতে হয়, জীবনের এই সোজা, মোটা দাগের কথাটা ক্যাম্পে এসে তারা ভুলে গেল।

খয়রাতের উপর নির্ভর করাটা এদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

পাল সাহাব লক্ষ্য করে দেখেছে।

জমি কোপানো, মাটি চৌরস করা, ঘর বানানো হোক আর না হোক, তাতে বিশেষ কিছুই যায় আসে না। মাস কাবার হ'লে ক্যাশ ডোল তো মিলবেই। এমন একটা মনোভাব মানুষগুলোর মধ্যে কাজ করে।

পাল সাহাব ভাবল, এদের ঘা দিতে হবে। সরকারী খয়রাতের উপর এদের নির্ভরতা, নিশ্চিন্ততা ঘুচিয়ে দিতে হবে।

ক্যাশ ডোল বন্ধ করে দেবে পাল সাহাব। (অবশ্য তেমন দরকার হ'লে ডোল দিতেই হবে।)

ভিক্ষের উপর এই মানুষগুলো বেঁচে থাকুক, কিছুতেই তা চায় না পাল সাহাব।

এতক্ষণ যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল পাল সাহাব। হঠাৎ সেটা ছুটে গেল।

চার কিনারের চারটে মশাল ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে জ্বলছে। কুয়াশা আর অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে।

কুয়াশা আর অন্ধকার মাখা আবছা আলোতে মানুষগুলো দলা পাকিয়ে বসে ছিল। অনুচ্চ, ভোঁতা, চাপা গলায় তারা এখন কাঁদছে।

ফেল্ট হ্যাটটা চাঁদির উপর সই করে বসাল পাল সাহাব। মোটা ভুরু দুটো কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। চোখের বাদামী রঙের ঘোলাটে মণি দুটো হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠলো। নাকের মাথাটা ফুলতে লাগল। নাকের ফুটো থেকে পাঁশুটে রঙের রোঁয়া বেরিয়ে পড়েছে। সেগুলো নড়তে লাগল। পাল সাহাব উত্তেজিত হ'লে রোঁয়াগুলো নড়তে থাকে।

রোমশ, চওড়া বুকের উপর বিরাট এক থাপ্পড় মেরে পাল সাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'এ শালে ভেড়ীর বাচ্চারা, কাঁদছিস কেন?'

মুহূর্তে কান্নার শব্দটা থেমে গেল।

পাল সাহাব গজ গজ করতে লাগল, 'শালে লোগদের খালি কান্না আর কান্না। পয়দা হবার পর কুত্তাগুলো খালি কাঁদতেই শিখেছে।'

কান্নাটা থেমে গিয়েছিল।

আবার মানুষগুলো শোর তুলে কাঁদতে শুরু করল।

লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল পাল সাহাব। সামনের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে চিল্লাল, 'আবার, আবার শালেরা! যে রেণ্ডীর বাচ্চা কাঁদবে, তাকে কোতল করে ফেলব।'

ভিড়ের মধ্য থেকে রসিক শীল উঠে দাঁড়াল। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'কান্দুম (কাঁদব) না তো কী করুম? আমাগোর (আমাদের) কপালই হইল কান্দনের (কাঁদার)। হা ভগমান--'

'এ কুত্তা, যা বলবি সিধা করে বল। অত বাত আমি শুনতে চাই না। বল্ শালে—'

লাফাতে লাফাতে রসিক শীলের সামনে এসে দাঁড়াল পাল সাহাব।

পাল সাহাবের মারমুখী চেহারা দেখে রসিক শীল ভয় পেয়ে গেল। যা বলতে চেয়েছিল, তা বলতে পারল না। গোরুর মত অবোধ, ভয়-ভয় চোখে পাল সাহাবের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

এবার আর পাল সাহাব খেঁকিয়ে উঠল না। রসিক শীলের পিঠে একটা হাত রেখে নরম গলায় আস্তে আস্তে বলল, 'ঘাবড়াচ্ছিস কেন? ডর নেই।'

ডাইনে বাঁয়ে দু পাশে মাথাটা ঝাঁকিয়ে সে বলতে লাগল, 'না কোন ডর নেই। যা বলতে চাস বলে ফ্যাল।'

রসিক শীল ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না, সে বলবে কিনা? কথাটা শুনে পাল সাহাব যদি ক্ষেপে ওঠে? বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে এক সঙ্গে এতগুলো দিন কাটিয়েও তারা এই লোকটাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কখন কোন কথায় যে পাল সাহাব ক্ষেপে উঠবে, কোন ব্যাপারে যে তার মেজাজ খোশ থাকবে, আগে থেকে তার হদিশ মেলে না।

রসিক শীলের মনের কথাটা বুঝি পড়েই ফেলল পাল সাহাব।

তার দাঁড়িগোঁফে ভরা মুখে প্রশ্রয়ের হাসি ফুটল। সে বলল, মেজাজটা আমার বহুত বেতর্বিয়ৎ। সে জন্মে ঘাবড়াবি না শালে—দমঝাচ্ছিস ?'

বিড় বিড় করে রসিক শীল কি যেন বলল, ঠিক বোঝা গেল না। তার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল, কাঁপতেই লাগল। কিন্তু কোন শব্দ বেরুল না।

পাল সাহাব বলল, 'বলে ফ্যাল, বলে ফ্যাল—জলদি কর—'

কাঁপা কাঁপা গলায় রসিক শীল শুরু করল, 'সাহাব বাবা, আমি বলি কি ক্যাশ ডোল বন্ধ হইয়া গেলে খামু কী ?'

'খাবি কী !'

পাল সাহাব যতই ভেবেছিল, মেজাজ খারাপ করবে না, কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। ভেংচে ভেংচে সে বলল, 'কী আর খাবি ? আসমানের হাওয়া আর কিলপণ্ড নদীর পানি গিলে জান বাঁচাবি। আর কুছু মিলবে না। শালে লোগদের স্রিফ খানার কথা! দুনিয়ায় খাওয়া ছাড়া আর কোন বাতই যেন নেই। কুত্তা কাঁহাকা, হারামী কাঁহাকা—'

এক দমে বিশ পঁচিশটা খিস্তি আউড়ে যায় পাল সাহাব।

সামনের মানুষগুলো এক একবার শোর তুলে কেঁদে ওঠে। আবার তাদের কান্নাটা ঝিমিয়ে পড়ে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কান্নার শব্দ শুনল পাল সাহাব। বাতাস টেনে টেনে ফুসফুসটা ভরিয়ে তুলল। তারপর বলল, 'কাঁদিস না, কাঁদিস না—বাত শোন্। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। হাঁ হাঁ, তোদের গেলা যাতে বন্ধ না হয়, তার মতলব—'

মানুষগুলো কান খাড়া করে বসল।

পাল সাহাব বলতে লাগল, 'এই জাজিরার (দ্বীপের) জঙ্গলে

হরিণ আর শুয়োর আছে। মেরে মেরে খাবি। খাবার পর যে গোস্ত বাঁচবে, মায়া বন্দরে আমি বেচে দোব। হরিণের ছাল আর শিং পুট বিলাসে (পোর্ট ব্লেয়ার) নিয়ে বেচব। তাতে তোদের রোজগার হবে। হবে কি না ?'

'হাঁ-হাঁ—'

মানুষগুলো ঘাড় কাত করে সায় দেয়।

'আউর মতলব আছে—'

পাল সাহাব রোজগারের অনেক উপায় বাতলে দেয়।

ধানের জমির পাশ দিয়ে সরু একটা খাল এঁকে বেঁকে পাক খেতে খেতে সিধা এরিয়াল উপসাগরে গিয়ে পড়েছে। তার নাম ডিগলিপুরের খাল।

বছরের সব ঋতুতে ডিগলিপুরের খালে মাছ মেলে। নানা জাতের সামুদ্রিক মাছ। পার্শে, সুরমাই, তারিণী, মায়া, লাল ভেটকি, পমফ্রেট—নোনা জলের মিঠে মাছ। বড় বাহারের মাছ।

ব্যবস্থা হ'ল, জঙ্গল থেকে প্যাডক গাছ কেটে তক্তা বানিয়ে নৌকা তৈরি করবে মানুষগুলো। পাল সাহাব মায়া বন্দর থেকে সুতো কিনে আনবে। সেই সুতোয় ক্ষ্যাপলা জাল বুনে তারা ডিগলিপুরের খালে নৌকা ভাসাবে। মাছ মারবে।

খাওয়ার পর যে মাছ বাঁচবে, সে সব মায়া বন্দরে বেচে আসবে পাল সাহাব।

এই দ্বীপের যেখানে যতটুকু পাওয়া যায়, কাঠ, মাছ, হরিণ, শুয়োর—সব কিছুই নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে কাজে লাগাক তারা, পাল সাহাবের এমন ইচ্ছা।

শুধু কি হরিণ, শুয়োর আর মাছ মারা, জীবিকার অন্য ফিকিরও পাল সাহাবের মাথায় এসেছে।

হঠাৎ পাল সাহাব সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকল, 'এ বিন্দ্রাবন (বৃন্দাবন) শীল, মুলুকে থাকতে কোন কাম করতি ?'

'নাপিতের কাম।'

ভিড়ের মধ্য থেকে একটা লোক বলল।

এবার আর একটা লোককে ডাকল পাল সাহাব, 'এ মহিন্দর, তুই কী করতি ?'

'সাহেব বাবা, আমি ছুতারের মিস্তিরি আছিলাম।'

একে একে সকলের খবর জেনে নিল পাল সাহাব। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে আসার আগে কেউ ছিল ছুতার, কেউ সোনারু, কেউ কামার, কেউ নাপিত, কেউ জেলে, কেউ মালাকার। নানান বৃত্তি নানান পেশার সব মানুষ।

পাল সাহাব মনে মনে একবার ভাবল, আপাতত এত পেশার কাজ এই দ্বীপে মিলবে না। কিন্তু যাদের কাজ মিলবে, তাদের কিছুতেই সে বসিয়ে রাখবে না।

পাল সাহাব বলল, 'আসল বারিশ (বর্ষা) আসতে বহুত দেরী। এত রোজ বসে থাকলে চলবে না। তা ছাড়া খালি মিট্টির ওপর ভরসা করলেই তো চলবে না, রুজির দুসরা ফন্দি দেখতে হবে।'

পাল সাহাব সব বন্দোবস্ত করে দিল।

যতদিন এই দ্বীপে বর্ষা না নামে, ততদিন একদল মাছ মারবে, হরিণ-শুয়োর মারবে। আর এক দলকে নিয়ে শহর পোর্ট ব্লেয়ার যাবে পাল সাহাব। সেখানে সুবিধামত কাজে তাদের লাগিয়ে দেবে।

আসল কথা, সকলকে নিজের নিজের রুজি রোজগার করে নিতে হবে।

ক্যাশ ডোল বন্ধের নাম শুনে মানুষগুলো সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়েছিল। পাল সাহাবের দিকে তাকিয়ে এই মুহূর্তে তারা আবার বাঁচার ভরসা পেয়েছে। আশা পেয়ে, ভরসা পেয়ে তাদের চোখ-গুলো চকচক করতে থাকে।

পাল সাহাব বলে, 'কি রে সবাই কাম করবি তো? রাজীবাজী?'

মাথা নেড়ে সবাই সায় দেয়, পাল সাহাবের কথামত তারা কাজ করবে।

উনিশ

এখন আর ট্রানজিট ক্যাম্পের জীবন নয়।

ঘর তুলে মানুষগুলো সংসারী জীবন ফিরে পেয়েছে।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে এখন পুরাদস্তুর সংসারী জীবন শুরু হয়ে গিয়েছে।

হারাণ আর হারাণের ঠাকুরমা উজানী বুড়ী—এই তুজনকে নিয়ে একটা আস্ত সংসার।

তু জনের সংসারের নানান টুকিটাকি কাজ সেরে তু'টি ভাত ফোটাতেই দিন কাবার করে আনে উজানী বুড়ী।

হাত আর তার চলতেই চায় না। চলবেই বা কেমন করে? বয়স কি কম হ'ল? তিন কুড়ি পুরিয়েও তু তিন বছর বুঝি পার হতে চলল। বয়সের সঠিক হিসাব উজানী বুড়ী রাখে না। রাখার জন্য মাথা ব্যথাও নেই।

কাঠ, বাঁশ, পেরেক, দড়ি—সরকারী সরঞ্জাম পেয়ে হারাণ একখানা মাঝারি আকারের দোচালা ঘর তুলেছে।

উপরে বেত পাতার পুরু ছাউনি, চারপাশে কঁ্যাচা বাঁশের বেড়া, নীচে মাটি থেকে হাত তুই উঁচু বাঁশের পাটাতন। পাটাতন না

করে উপায় নেই। রাজ্যের পোকামাকড়, সাপ-বিছে-জোঁক তা হ'লে ঘরে ঢুকে পড়বে।

ঘরটার সামনের দিকে এক টুকরা সমতল জমি। সেখানে বুক সমান উঁচু চেঁচো ঘাস গজিয়ে ছিল।

ঘাস সাফ করে ফেলেছে হারাণ। মাটি নিকিয়ে তকতকে করে তুলেছে উজানী বুড়ী। সামনের ফালতু মাটিটাকে এখন উঠানই বলা চলে।

উঠানের এক কিনারে শুকনা পাতা-ডাল-কাঠ ডাঁই করা। আর এক কিনারে একটা দো-আখা (তু মুখো উনুন) বানানো হয়েছে।

সেই তুপুরে ভাত চাপিয়েছে উজানী বুড়ী! ভাত আর ফোটে না। এদিকে বেলা প্রায় হেলতে চলেছে।

এবার ক্যাশ ডোল পেয়ে লাল লাল মোটা মোটা কি চালই যে এনেছে হারাণ! সহজে আর সিদ্ধ হতে চায় না।

আখার মুখে শুকনা পাতা, সরু সরু ডাল গুঁজে দিচ্ছে উজানী বুড়ী। আর বিড় বিড় করে কি যেন বকছে।

গায়ের ঢিলা চামড়া কুঁচকে কুঁচকে গিয়েছে। গাল ভেঙে তুবড়ে রয়েছে। হনুর হাড় ফুঁড়ে বেরিয়েছে। পাটের ফেঁসোর মত এক মাথা চুল। তু মাড়িতে গুটি সাতেক কালো কালো ভাঙা দাঁত। সব সময় মাথাটা অল্প অল্প কাঁপে। পিঠটা বেঁকে কুঁজের মত দেখায়। যত সে কথা বলে, তার চেয়ে ঠোঁট তুটো অনেক বেশি নড়ে।

এই হ'ল হারাণের ঠাকুরমা উজানী বুড়ী।

ভাত ফুটতে ফুটতেই হারাণ এসে পড়ল।

জল-কাদা মেখে হারাণের মূর্তি যা খুলেছে! গোঁজের খোঁচা খেয়ে গায়ের চামড়া খানে খানে ফেঁসে গিয়েছে। রক্ত জমাট বেঁধে আছে। ঘাড়ের কাছে তুটো জোঁক লেগে আছে। হারাণের ভ্রূক্ষেপ নেই।

উঠানের এক কিনারে জাল আর একটা ছোট সুরমাই মাছ নামিয়ে রাখল হারাণ।

পাল সাহাবের ব্যবস্থা অনুযায়ী জন কয়েক পোর্ট ব্লেয়ারে রোজগারের খোঁজে গিয়েছে। হারাণ এই দ্বীপেই আছে। মাছ মারাই এখন তার কাজ।

সেই সকালে ডিগলিপুরের খালে গিয়েছিল হারাণ। দুপুর পর্যন্ত জাল বেয়ে বেয়ে অজস্র মাছ মেরেছে। খাওয়ার মত ছোট একটা সুরমাই মাছ হারাণকে দিয়ে বাকী সব মাছ নিয়ে মায়া বন্দরে বেচতে চলে গিয়েছে পাল সাহাব।

চোখে মাছের আঁশের মত পুরু ছানি। ভুরুর উপর একটা হাত রেখে চোখ আড়াল করে উজানী বুড়ী বলল, 'কে রে, হারাণ আসলি ?'

'হু, ঠাকুরমা—'

'কি চাউল যে এইবার কিনা (কিনে) আনছিস—সেই কুন দুফারে আখায় (উনুনে) বসাইছি, ফুটতেই আর চায় না।'

হারাণ কিছুই বলল না। বাঁশের খুঁটিতে টাঙিয়ে জাল শুকতে দিতে লাগল।

রোদের তেজ মরে আসছে।

জঙ্গলের দিক থেকে ঠাণ্ডা মৌসুমী বাতাস ছুটেছে।

উজানী বুড়ীর কেমন যেন শীত শীত লাগে। বুড়ো বয়সে গায়ে শীতটা এমনিতেই বেশি বেঁধে।

এই বয়সে রক্তের আগুন জুড়িয়ে যায়। ভিতর থেকে তাপ না পেলে শরীর কি গরম রাখা যায় !

সিঁটানো হাত-পা আখার পাশে রাখে উজানী বুড়ী। গনগনে আগুনের তাপে হাত-পা সেঁকতে সেঁকতে বিড় বিড় করতে থাকে, 'আর পারি না। কোন সময় ভাত ফুটব, কোন সময় মাছ রান্ধুম (রাঁধব) আর কোন সময় যে হারাইণারে (হারাণকে) খাইতে দিমু—'

উঠানের এক কিনারে বসে ডলে ডলে গায়ের কাদা তুলছিল হারাণ।

উজানী বুড়ী ডাকল, 'হারাণ—'

'কী কইস ঠাকুরমা?'

'এইখানে আয় দেখি—'

উজানী বুড়ীর পাশে এসে বসল হারাণ। বলল, 'কী কইস?'

ছানিপড়া ঘোলাটে চোখে কিছুক্ষণ হারাণের দিকে তাকিয়ে রইল উজানী বুড়ী। হারাণের মুখের চেহারাটা দেখে নিল। কথাটা বলবে কি বলবে না, একবার ভাবল।

হারাণ বলল, 'কিছু কইতে চাস ঠাকুরমা?'

'হ।'

মনে মনে কথাটা একবার ভেঁজে নিল উজানী বুড়ী। তারপর শুরু করল, 'বুঝলি সোনা ভাই, এই আন্ধারমান দ্বীপি আইসা আমরা মাটি পাইলাম।'

হারাণ আস্তে একটা শব্দ করল, 'পাইলাম।'

'ঘর পাইলাম।'

'হ। তাতে হইছে কী?'

'আগে শোন্। জমিনে এইবার ধান ফলব। ধান হইলে আর ভাবনা নাই। আমরা না খাইয়া মরুম না।'

হারাণ বিরক্ত হয়ে উঠল, 'এই কথা তো দুই বছরের একটা ছাও (বাচ্চা) জানে।'

'হ-হ, এই কথা সগলে জানে।'

একটু থামল উজানী বুড়ী। শুকনো, ফোগলা মুখে অল্প হাসল। কালচে মাড়ি দুটো বেরিয়ে পড়ল। ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল।

ঠোঁটের কাঁপুনি কমলে উজানী বুড়ী আবার শুরু করল, 'আর একটা কথা আছে রে দাদা—'

'তরাতরি (তাড়াতাড়ি) বল্—'

'হ, কমু।'

উজানী বুড়ী বলল, 'ঘর বসত, জমি জিরাত—সগলই যখন ফিরা পাইলাম, এইবার আমার মনের সাধটা মিটাইয়া দে দাদা। কয়-দিনই আর বাঁচুম! বুড়া হইছি, কোনদিন দেখবি, উজানী বুড়ী চোখ বুজছে।'

'তোর মতলবখান কী ঠাকুরমা?'

চোখ কুঁচকে উজানী বুড়ীর দিকে তাকাল হারাণ।

'একা একা আর কতদিন থাকুম? এইবার আমারে এট্টা সতীন আইনা (এনে) দে। তুই সতীনে মনের সুখে চুলাচুলি করি।'

'কী কইস ঠাকুরমা—তোর মাথাখান কি খারাপ হইল!'

'ক্যান রে দাদা?'

হারাণের পাশে ঘেঁষে বসল উজানী বুড়ী। আবার বলল, 'ক্যান দাদা, আমার মাথা খারাপ হইব ক্যান? মাথা আমার ঠিকই আছে। তুই একটা বিয়া কর হারাণ। বুড়া বয়সের এই সাধটা মিটাইয়া দে।'

হঠাৎ দু হাতে চোখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল উজানী বুড়ী।

হারাণ ভয় পেল। উজানী বুড়ীর কান্না একবার শুরু হ'লে সহজে আর থামতে চায় না। নরম গলায় সে বলল, 'কান্দিস (কাঁদিস) ক্যান ঠাকুরমা? কী হইছে?'

চোখ থেকে হাত সরিয়ে এবার কপাল চাপড়ায় উজানী বুড়ী। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদে আর বলে, 'কী আছে আমার? কে আছে আর? স্বজন নাই, বান্ধব নাই, পুত নাই, পুতের বৌ নাই—সগলেরে খাইয়া বসছি। আমি শুগীতাপী (শোকতাপ পাওয়া) মানুষ। পিরথিমীতে কেউ নাই আমার। থাকার ভিতর তুই

একটা মাত্তর নাতি। তুই যদি আমার সাধটা না মিটাস, কে মিটাইব? আর কে আছে?'

'অবুঝ হইও না ঠাকুরমা, অত উতলা হইও না—'

উজানী বুড়ীর একটা হাত ধরে হারাণ। তারপর উদাস গলায় বলে, 'অখনও ধান ফলল না, খাওয়ার চিন্তা ঘুচল না। পাল সাহাব ক্যাশ ডোল বন্ধ কইরা দিব পরের মাস থিকা। ছুইটা প্যাটই (পেট) ভরাইতে পারি না। এর মধ্যে আর একখান প্যাট (পেট) এসে জুটলে উপাস দিয়া মরতে লাগব।'

হঠাৎই কান্না থামাল উজানী বুড়ী। বলল, 'আ আমার কপাল, তুই প্যাটের চিন্তা করিস না কি! ভগমান যখন প্যাট দিছে, সেই প্যাট ভরানের ব্যাবস্থাও কইরা রাখছে। তোর চিন্তা কিরে ভাই! যে যার কপালে (ভাগ্যে) খায়, কেউ কি কেউরে খাওয়াইতে পারে?'

কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে পড়েছে উজানী বুড়ী। ঘন ঘন বার কয়েক শ্বাস টেনে সে আবার শুরু করল, 'তোরা এই কালের যুয়ানেরা (যুবকেরা) কি হ'লি? বিয়া করতে চাস না! যুবতী মাইয়ার (মেয়ের) গায়ের উম না পাইলে ঘুমাস কেমনে? তোর ঠাকুরদাদায় তো আমারে ছাড়া এক রাইতও ঘুমাইত না—'

কথা আর পুরা করল না উজানী বুড়ী। হারাণের থুতনিটা নেড়ে দিয়ে একটু আদর করল।

হারাণ কিছু বলে না। উদাসীন চোখে দূরের একটা প্যাডক গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে। ছুটো হলদিবনা পাখি প্যাডক পাতার ফাঁক দিয়ে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। একবার তাদের দেখা যায়, আবার তারা পাতার আড়ালে ঢাকা পড়ে।

একটা বুঝি পাখি, অন্যটা পাখিনী। পাখিটা পাখিনীকে সোহাগে সোহাগে জ্বালিয়ে মারছে। অস্থির করে তুলেছে।

নিজের মনেই বকর বকর করছিল উজানী বুড়ী। হঠাৎ তার খেয়াল হ'ল, নাতি একটা কথাও বলছে না; দূরের গাছটার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে।

হারাণকে আস্তে একটা ঠেলা দিল উজানী বুড়ী। বলল, 'কি ভাবিস রে সোনা? কার কথা?'

'কিছুই না, কারো কথা না।'

বলেই চুপ করল হারাণ।

উজানী বুড়ী এবার আসল কথাটা পাড়ল, 'বুঝলি দাদা, আমি তোর কোন কথাই শুনতে চাই না। বৈশাখ মাসে তোর বিয়া লাগাইয়া দিমু। শোন্ ভাই—'

'কও—'

'চন্দর আসছিল।'

'কোন চন্দর?'

'চন্দর জয়ধর। সেই যে গোয়ালন্দ থিকা এক গাড়িতে আমরা কইলকাতায় (কলকাতায়) আসছিলাম। এক লগে (সঙ্গে) কেম্পে (ক্যাম্পে) নয় দশ বচ্ছর কাটাইলাম। এক জাহাজে আন্ধারমান দ্বীপি আসলাম। মনে নাই তোর?'

'আছে।'

'চন্দরের মেয়ে পাখি—'

খাঁকারি দিয়ে ঘড়ঘড়ে গলাটা সাফ করে নিল উজানী বুড়ী। আবার শুরু করল, 'পাখি তো বড়সড়, বিয়ার যুগ্য হইয়া উঠছে। বড় ভাল মেয়ে—সোন্দর মেয়ে—'

'ভাল তো ভাল! সোন্দর তো সোন্দর! আমারে শুনাইয়া কি হইব?'

'তোরে শুনামু না তো শুনামু কারে? তেমুন বান্ধব পামু কোথায়? শোন্, পাখিরে আমি সতীন করুম।'

'থাম্ বুড়ী—'

লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল হারাণ। চেঁচাতে লাগল, 'আমি উই পাখি পুখিরে বিয়া করুম না। সিধা কথা—'

'তবে কারে বিয়া করবি রে শুয়োরের ছাও, উই কাপাসীরে—'

উজানী বুড়ীও উঠে দাঁড়িয়েছে।

খানিকক্ষণ থ মেরে দাঁড়িয়ে রইল হারাণ। কাপাসীর কথাটা কেমন করে জানল ঠাকুরমা! ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে।

উজানী বুড়ী চিলের মত চিল্লাতে লাগল। গলার শিরগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে ফুলে উঠেছে। গলা ফেঁড়ে তীক্ষ্ণ, খ্যাসখ্যাসে আওয়াজ বেরুতে লাগল, 'শুয়োরের ছাও, কথা কইস না ক্যান? মনে করছিস, আমার কান নাই, কিছুই শুনি না। মনে করছিস, আমার চৌখ নাই, কিছুই দেখি না। আমার মন নাই, কিছুই বুঝি না। বয়স হইছে, তাই মনে করলি, আমি সগল খুয়াইছি। কিছুই খুয়াই নাই। হ রে বান্দর (বাঁদর), কিছুই খুয়াই নাই। আমার সগল ঠিক আছে।'

পাটের ফেঁসোর মত আঠা আঠা রুক্ষ চুল। সেই চুল উড়ে এসে মুখটা ঢেকে ফেলেছে। ছানিপড়া ঘোলাটে চোখ দুটো ধক ধক করছে। বুক থেকে কাপড় খসে পড়েছে। শুকনা, ঢিলা স্তন দুটো দুলছে। উত্তেজনায় বাঁকা, দুমড়ানো, ছোট শরীরটা থর থর কাঁপছে।

উজানী বুড়ীর উগ্র, ভয়ানক মূর্তির দিকে তাকিয়ে হারাণ তিন পা পিছিয়ে গেল। কাঁপা গলায় বলল, 'কী জানিস তুই? কী বুঝিস? কী লো মাগী?'

'সগল জানি, সগল বুঝি—'

একটু থামে উজানী বুড়ী। একটানা অনেকক্ষণ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হয়রান হয়ে পড়েছে। টেনে টেনে সে হাঁপায়। হাঁপানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার বুকটা তোলপাড় হতে থাকে।

খানিকটা ধাতস্থ হয়ে উজানী বুড়ী আবার শুরু করে, 'আমি

ক্যান, এই আন্ধারমান দ্বীপির সগলে জানে। উই লষ্ট, কুচরিত্তির মাগীটার লগে তোর ঢলাঢলি—'

উজানী বুড়ীর কথা পুরা হবার আগেই হারাণ রুখে উঠল, 'চুপ মার মাগী। না হইলে তোরে শ্যাষ কইরা ফেলুম। লষ্ট, কুচরিত্তির তুই কারে কইস (বলিস) ?'

'কারে আবার রে ড্যাকরা! তোর পরাণের বন্ধুরে। উই নিত্য ঢালীর মেয়ে কাপাসীরে। নাম তো কইলাম (বললাম), এইবার জোঁকের মুখে লবণ পড়ল। কথা কইস না ক্যান রে যমের অরুচি ? মাথায় কি ঠাটা (বাজ) পড়ল !'

'তুই তারে লষ্ট কইস (বলিস) ঠাকুরমা, কুচরিত্তির কইস !'

বিস্ময়ে কিছুক্ষণ বোবা হয়ে থাকে হারাণ। উজানী বুড়ী যে কাপাসীকে নষ্ট, কুচরিত্তির বলবে—শুনেও ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না সে।

'যার শরীল (শরীর) লষ্ট হইয়া গেছে, তারে কুচরিত্তির কমু (বলব) না ? এক শত বার কমু। কী করবি তুই ? আমার মুখ আছে, সগলের আছে। পিরথিমীর সগলে আমরা এক কথা কই (বলি)। ঐ মাগী লষ্ট, দুষ্ট, কুচরিত্তির—'

একটু কি যেন ভেবে নিল উজানী বুড়ী। হঠাৎ ছুটে হারাণের কাছে এল সে। দু হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল, 'আমার সোনা দাদা, লক্ষ্মী ভাই, তুই উই রাক্ষসীর কথা ভুইলা (ভুলে) যা। ও তোর মাথা খাইছে। আমার সব্বনাশ করছে। সব্বনাশী. ডাকাবুকা মাগী।'

উজানী বুড়ীর কান্না কি ককানির শব্দ হারাণের কানে ঢুকছিল না। সে ভেবে ভেবে দিশা পায় না, সব জেনেশুনেও ঠাকুরমা কেমন করে কাপাসীকে নষ্ট বলে, কুচরিত্র বলে !

আগের কথাটাই আবার বলল হারাণ, 'বুড়ী, সগল জেনেশুনে

তুই তারে লষ্ট কইস (বলিস) ? কুচরিত্তির কইস ? শরীল তার লষ্ট হইছে ঠিকই। কিন্তুক তাতে তার দোষ কই ?'

হঠাৎই ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করেছিল উজনী বুড়ী, হঠাৎই আবার কান্নাটা থামিয়ে দিল। একদৃষ্টে হারাণের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝে নিল। তারপর টেনে টেনে বলতে লাগল, 'পরাণের বন্ধুরে লষ্ট কইলে কুচরিত্তির কইলে বড় লাগে, বুকে জ্বালা ধইরা (ধরে) যায় ! না রে যমের অরুচি ?'

হারাণ কিছু বলল না।

উজানী বুড়ী চিল্লাতে লাগল, 'কিন্তুক তা হইব না। কিছুতে তা আমি হইতে দিমু না। তোর মনে যা আছে, তা করতে দিমু না।'

চিৎকার করে উঠল হারাণ, 'হইব, হইব, এক শত বার হইব। আমার মনে যা আছে, তা করুম। পারলে তুই আমারে ঠেকাইস মাগী—'

'করবি ? করবি ? তা হইলে তোর মনের সাধই মিটাবি ? উই লষ্ট, পাগল মাগীটারে ঘরে আনবি ?'

উজানী বুড়ীর চোখ দুটো ধক ধক করতে লাগল।

হারাণ সমানে চেঁচায়, 'হ—হ, কাপাসীরেই আমি বিয়া করুম। তারে এট্টু ভাল হইতে দে—'

হারাণের কথা শেষ হবার আগেই ধড়াস করে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল উজানী বুড়ী। উপুড় হয়ে শুয়ে দু হাতে চুল ছিঁড়তে, মাটিতে মুখ ঘষতে আর কপাল ঠুকতে লাগল। বলতে লাগল, 'তোর মনে যা আছে তাই কর। তোর সাধই মিটা রে শুয়োরের ছাও। তার আগে আমারে মার, আমারে শ্যাষ কর। তার পর তোর বান্ধবের কাছে যা। ভগমান গো, তোমার মনে এই আছিল ! সব্বনাশী আমার সব্বনাশ কইরা ছাড়ল !'

ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল উজানী বুড়ী।

বিশ

বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ দ্বীপে উপনিবেশ গড়তে গড়তে পাল সাহাব যেন জীবন রসিক হয়ে উঠেছে।

এখন দুপুর।

এতদিনে আন্দামানের আকাশে মেঘ আসতে শুরু করেছে।

নৈঋত কোণ থেকে মৌসুমী বাতাসের তাড়া খেয়ে পোড়া তামা রঙের টুকরা টুকরা মেঘ এই দ্বীপের দিকে ছুটে আসছে।

সেটেলমেন্টের মধ্যে দিয়ে অলস, লক্ষ্যহীন গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল পাল সাহাব। মনটা আজ পাখির মত হাল্কা হয়ে রয়েছে। এই দুপুর, তীব্র ধারাল রোদ, চারপাশের ছোট ছোট পাহাড়, জঙ্গল—আজ সব কিছুই ভাল লাগছে।

অকারণে, নিতান্ত তুচ্ছ বিষয় নিয়েও এক এক সময় মনটা বড় খুশি হয়ে ওঠে।

চলতে চলতে মুখ তুলে একবার আকাশের মেঘ দেখে নিল পাল সাহাব। বেশ বোঝা যাচ্ছে, কয়েকদিনের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে।

অন্য সময় হলে বৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে মেতে উঠত পাল সাহাব। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে মেঘের ভাবনাটা মনের মধ্যে বেশিক্ষণ স্থায়ী

হ'ল না। আর একটা ভাবনা পাল সাহাবের মনটাকে পুরাপুরি দখল করে বসল।

মা-তিনকে নিয়ে সেই যে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে লং আইল্যাণ্ড এসেছিল পাল সাহাব, তার পর পনেরটা বছর পার হয়ে গিয়েছে।

এই পনের বছরের মধ্যে মাত্র বার কয়েক পোর্ট ব্লেয়ার গিয়েছে পাল সাহাব। জঙ্গলে থেকে থেকে শহর-বন্দরের সঙ্গে তার যোগা-যোগটা ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে।

পয়লা পয়লা ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে কুলীর কাজ করেছে পাল সাহাব। পারমোশ (প্রমোশন) পেয়ে সে হয়েছিল জবাবদার। তারপর ফরেস্ট গার্ড। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে, চুগলুম-দিদু-প্যাডক-গর্জন-টমপিঙ—হাজার জাতের গাছের তদারক করে করেই জীবনের অনেকগুলো বছর কাটিয়ে দিয়েছে সে।

আন্দামানের অরণ্য পাল সাহাবকে এতকাল আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

এই অরণ্যের বাইরে সভ্য মানুষের জগতে কোথায় কি ঘটছে, সে সব সম্বন্ধে আদৌ মাথা ব্যথা ছিল না পাল সাহাবের। শহর বন্দরের কোন খবরই রাখত না সে। আসলে অরণ্যের বাইরের কোন ব্যাপারে এতটুকু কৌতূহল ছিল না তার।

পাল সাহাবের স্বভাবে অমার্জিত হলেও প্রচুর নিরাসক্তি মিশে আছে। এই নিরাসক্তি আর জঙ্গলের আদিম, জৈবিক নিয়মের খাত বেয়ে জীবনটাকে সে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

বাইরে ছিল আন্দামানের আদিম অরণ্য। ঝুপড়িতে ছিল মা-তিন। অরণ্য তাকে দিয়েছে আদিমতা, মা-তিন দিয়েছে স্থূল আর জৈবিক জীবনের আস্বাদ।

মা-তিন আর এই দ্বীপের অরণ্যকে নিয়ে এক ফুঁয়ে জীবনের এতগুলি বছর উড়িয়ে দিয়েছে পাল সাহাব।

একটি আদিম মেয়ে মানুষ আর একটি আদিম অরণ্য পাল সাহাবকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল।

হয়ত মা-তিন আর অরণ্যকে নিয়ে মসৃণ নিয়মেই পুরা জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারত পাল সাহাব।

কিন্তু একদিন তাল কাটল।

বছর কয়েক আগে পোর্ট ব্লেয়ারে গিয়েছিল পাল সাহাব।

পুরানো আমলের দোস্ত, ইদ্রিস-রোশনলাল-সাহা-হামিদ, যাদের সঙ্গে সেলুলার জেলে কয়েদ খেটেছে, তাদের জনকতকের সঙ্গে জাহাজ ঘাটাতেই দেখা হয়ে গিয়েছিল।

তাদের দেখেই পাল সাহাবের কেমন যেন ধন্দ লেগেছিল। বাতচিত করে মনে হ'ল, ইদ্রিসরা কেমন যেন বদলে গিয়েছে। তাদের হালচালের সঙ্গে তার যেন খাপ খায় না।

শহর ঘুরে এসে পাল সাহাব বুঝল, সেই আগের শহরটা আর আগের মত নেই। একেবারে নতুন, আনকোরা, বিচিত্র হয়ে গিয়েছে।

পুরানো শহরে এখানে ওখানে জঙ্গল ছিল। জঙ্গল সাফ হয়ে গিয়েছে। পাহাড়ে পাহাড়ে পাক খেয়ে আঁকা বাঁকা নয়া নয়া সড়ক হাজার দিকে ছুটেছে। নয়া নয়া কুঠিবাড়ি উঠেছে। এবার-ডীন বাজারে, ফুঙ্গি চাউঙে, ডিলানিপুরে, হ্যাডো আর চৌলদাইতে জমজমাট বস্তি বসেছে।

একটা জটিল ধাঁধার মধ্যে যেন গিয়ে পড়েছিল পাল সাহাব।

পুরানো শহরটা কেমন যেন আজব আজব ঠেকছে। শুধু কি শহরটাই, এখানকার হাল চাল, জমানা, কেতা, মানুষ, সবই বদলে গিয়েছে।

হঠাৎই পাল সাহাবের মনে হ'ল, এই শহরের জমানা আর মা-তিন এবং জঙ্গলকে নিয়ে তার যে জমানা—এই দুয়ের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। দুয়ের মধ্যে কোন মিল নেই।

পাল সাহাব ভাবল, এই শহরটা কারসাজি করে তাকে অনেক পিছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।

এই শহরটা যেমন আজব, দুর্বোধ্য, এখানকার খবরগুলোও ঠিক তেমনি।

অন্য অন্য ইয়াররা, যারা একদিন তাকে দেখলে মেতে উঠত, প্রচুর কথা কইত, প্রচুর খিস্তি করত, তামাশা আর হল্লায় মশগুল, বেহুঁশ হয়ে থাকত, তারা পাল সাহাবের সঙ্গে দু চারটে কথা বলেই সরে পড়ল। তাদের নাকি হরেক কাজ, হরেক হুজ্জুত, বহুত ঝামেলা। পুরানো দিনের সেই তাপ আর নেই। যে যার ঝামেলায় ব্যস্ত।

শুধু ইদ্রিসই পুরানো দোস্তের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছিল। তার হাল হকিকতের খবর নিয়েছিল। নয়া, আজব খবর দিয়েছিল, 'বুঝলি ইয়ার, তুই তো জঙ্গলে জিন্দগী খতম করছিস—ইধারে কী হচ্ছে শুনেছিস?'

'কী?'

কোন খবরই জানে না পাল সাহাব। কেউ প্রশ্ন করলে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'আজাদী আসছে।'

'আজাদী কৌন চীজ? কোন জাহাজে আসছে?'

'আ রে নালায়েক, বুদ্ধু। তুই কুছু জানিস না। বাতাচ্ছিস, আজাদী কৌন চীজ্? আ রে হারামী—'

পাল সাহাবের অজ্ঞতায় খ্যা খ্যা করে কর্কশ, খ্যাসখ্যাসে গলায় হেসে উঠেছিল ইদ্রিস।

ইদ্রিস কেন যে হাসছে, এই কথাটা সঠিক বুঝতে না পেরে মুখ কাঁচুমাচু করে বসে ছিল পাল সাহাব।

সেই যে তাল কাটল, তার পর থেকেই আজব শহরটা তার দুর্জ্ঞেয় হালচাল, জমানা, কেতা নিয়ে বার বার পাল সাহাবকে হাতছানি দিতে লাগল।

শহর যেন জাদু করল।

জঙ্গলে আর মন বসতে চায় না। ন মাসে ছ মাসে কি বছরে এক আধ বার যখনই ফুরসত পায়, পোর্ট ব্লেয়ার আসতে লাগল পাল সাহাব।

শহরে এসেই সরাসরি এবারডীন বস্তিতে যায় পাল সাহাব। ইদ্রিসের কুঠিতে ওঠে।

অনেক খবর রাখে ইদ্রিস।

শহর বন্দরের মানুষ ইদ্রিস। তার খবরের স্বাদ, জাত, মহিমাই আলাদা।

একবার পোর্ট ব্লেয়ার এসে পাল সাহাব শুনল, ইণ্ডিয়া মুলুক নাকি আজাদ হয়ে গিয়েছে।

মোপলা ইদ্রিস পাল সাহাবের পিঠে এক থাপ্পড় মেরে বলেছিল, 'বুঝলি নালায়েক, মুলুক তো আজাদ হয়ে গেল। এবার থেকে খুদ আপনা রাজ।'

মুলুক কোথা দিয়ে কেমন করে আজাদ হয়ে গেল, ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি পাল সাহাব। না বুঝেই খুব একচোট মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলেছিল, 'হাঁ—'

আর একবার পোর্ট ব্লেয়ার এসে পাল সাহাব মজাদার এক খবর শুনল।

ইদ্রিস বলেছিল, 'জানিস শালে, এংরাজবালারা ইণ্ডিয়া মুল্লুক ছেড়ে ভেগে যাচ্ছে।'

'কোথায় যাচ্ছে ?'

'তাদের মুল্লুকে। এবার থেকে আমরাই আপনা মুল্লুকের রাজা বনলাম। হাঁ-হাঁ, একদম আপনা রাজ।'

ইংরেজ সম্বন্ধে পাল সাহাবের অদ্ভুত এক মনোভাব আছে।

ইংরেজ বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে সেলুলার কয়েদখানা বানিয়েছে। হাজার মাইল কালাপানি পাড়ি দিয়ে এখানে তাকে

কয়েদ খাটাতে এনেছে। রম্বাস ছেঁচা, হুইল ঘানি টানা, সড়ক বানানো, পাথর পেষা—এমনি সব কাজে সামান্য গাফিলতি হ'লেই পেটি অফিসার টিণ্ডালদের দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে জান লাবজান করে ফেলেছে।

শুধু কি তাই?

সেই ধূ-ধূ গ্রামটা! সেই মুগ্ধ কৃষাণী বউ, সেই তকতকে করে নিকানো আঙিনা, সেই ঘুঘুর ডাক, কৃষাণী বউর কোলে নাদুস নুদুস একটি ছেলে, বসুধারা আঁকা ঘরের দেওয়াল—হাজার মাইল দূরের সেই স্বপ্নময় ছবিটিকে ইংরেজবালারা একটু একটু করে পাল সাহাবের জীবন থেকে অনেক, অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

ইংরেজ সম্পর্কে পাল সাহাবের মনে অদ্ভুত এক আক্রোশ ছিল। ইদ্রিস যখন বলল, ইংরেজরা ইণ্ডিয়া মুলুক ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তখন খুশিতে মনটা ভরে গিয়েছে পাল সাহাবের।

সেটা কোন তারিখ কোন সাল, আদৌ মনে করতে পারে না পাল সাহাব। অবশ্য মনে করার দায়ও নেই তার।

সেদিন ইদ্রিস বলেছিল, 'শুনেছিস ইয়ার, এই জাজিরাতে (দ্বীপে) নয়া নয়া মানুষ আসছে।'

'কোথা থেকে আসছে?'

'মেরিন ডিপাটমেণ্টের মুন্সীজীর কাছে শুনলাম, বঙ্গাল (বাংলা) মুলুক থেকেই নাকি নয়া আদমীরা আসছে। বহুত বহুত আদমী—'

'কী মতলব?'

'এখানে নয়া সেটেলমেণ্ট হবে। রিফুজী সেটেলমেণ্ট।'

একটু থেমে কি যেন ভেবে নিয়েছিল ইদ্রিস। আবার শুরু করেছিল, 'এই জাজিরাতে (দ্বীপে) রিফুজীরা নয়া বসত গড়বে।'

'রিফুজী কৌন চীজ রে ইয়ার ?'

যে পাল সাহাবের কোন ব্যাপারেই মাথা ব্যথা নেই, হঠাৎ রিফুজী সম্পর্কে তার আগ্রহ দেখা দিল।

রিফুজী যে ঠিক কী, ইদ্রিসও জানে না। ভাসা ভাসা, আবছা আবছা, যেটুকু সে শুনেছে, তাতে রিফুজী সম্পর্কে তার ধারণা স্পষ্ট নয়। শুধু এটুকুই সে জানে, একদল নয়া মানুষ বাঙলা মুলুক থেকে খুব শিগ্‌গিরই এখানে এসে পড়বে। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে নতুন সেটেলমেণ্ট গড়বে।

ইদ্রিস বলেছিল, 'তুই আর এক দফে যখন আসবি, তখন বলব রিফুজী কী চীজ্‌? সমঝালি ?'

'আচ্ছা।'

এর পরের বার পোর্ট ব্লেয়ার এসে রিফুজীদের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিল পাল সাহাব।

ইণ্ডিয়া মুলুক নাকি দু ভাগ হয়ে গিয়েছে। হিন্দুস্তান আর পাকিস্তান। বাঙলা মুলুক দু টুকরা হয়েছে। পুব দিক পাকিস্তানে, পশ্চিম দিক হিন্দুস্তানে। পুব বাঙলার হিন্দুরা ভিটামাটি থেকে উৎখাত হয়ে এই আন্দামান দ্বীপে আসছে। তাদের কুঠি নেই, ডেরা নেই, মাটি নেই। বাঁচার আশায়, ঘরের আশায়, মাটির আশায় কালা পানি পাড়ি দিয়ে সেটেলমেণ্ট গড়তে আসছে তারা।

গাঢ় গলায় ইদ্রিস বলেছিল, 'আদমীগুলো ইণ্ডিয়ার আজাদীর জন্যে বহুত কীম্মৎ (দাম) দিল। বাপ-নানার কোঠি ছাড়ল, মিট্টি (মাটি) ছাড়ল। ইণ্ডিয়ার আজাদীর জন্যে তাদের জান তুড়ল, জমানা তুড়ল, জিন্দগী তুড়ল।'

দীর্ঘ, মন্থর একটা শ্বাস ফেলল ইদ্রিস।

ইদ্রিসের পরের কথাগুলো কানে ঢুকছিল না পাল সাহাবের। আগের কথাগুলোই সে ভাবছিল। পুব বাঙলার মানুষরা সাত পুরুষের ভিটামাটি থেকে উৎখাত হয়ে এই দ্বীপে আসছে। তাদের

জান তুড়েছে, জমানা তুড়েছে, জিন্দগী তুড়েছে। এই মানুষগুলোর নাম নাকি রিফুজী।

রিফুজীদের কথা ভাবতে ভাবতে সেই ছবিটাই বার বার মনে পড়ছিল পাল সাহাবের। সেই কৃষাণ বউ, তার কোলে নাদুস নুদুস ছেলে, তকতকে নিকানো আঙিনা, জাম গাছের ছায়া—একদিন সেই খুবসুরৎ স্বপ্নের দুনিয়া থেকে পাল সাহাবও উৎখাত হয়ে এই দ্বীপে কয়েদ খাটতে এসেছিল।

এই দ্বীপে সাতপুরুষের ভিটামাটি থেকে উৎখাত হয়ে যারা নতুন সেটেলমেণ্ট গড়তে আসছে, তাদের সঙ্গে তার নিজের কোথায় যেন একটা বিচিত্র মিল খুঁজে পেল পাল সাহাব। রিফুজীদের জন্য সহানুভূতিতে তার মনটা ভরে গেল।

তারপর থেকে তো নিজের চোখেই সব দেখছে পাল সাহাব।

কয়েক বছর ধরে জাহাজ ভরে ভরে উদ্বাস্তুরা বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে আসছে। প্রথমে তারা দক্ষিণ আন্দামান পোর্ট ব্লেয়ারের আশে পাশে সেটেলমেণ্ট গড়ল। তারপর হ্যাভলক দ্বীপ এবং মধ্য আন্দামানে জীবনের সীমানাকে বাড়াল। এখন যারা আসছে, তাদের বসতি হচ্ছে উত্তর আন্দামানে।

উত্তর আন্দামানের উপনিবেশ গড়তে গড়তে পাল সাহাব যেন জীবন রসিক হয়ে উঠেছে।

লক্ষ লক্ষ মানুষ ইণ্ডিয়া মুলুকের আজাদীর জন্য বাপ-নানার ভিটামাটি থেকে উৎখাত হয়ে আসছে। আজাদীর জন্য অনেক কীম্মৎ দিয়েছে তারা। উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ধুঁকে ধুঁকে, এ ঘাটে ও ঘাটে ঘুরে ঘুরে, বাজারে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, ফুটপাতে, গাছতলায় কত মানুষ যে খতম হয়ে গেল, কে তার হিসাব রাখে? কতখানি মনুষ্যত্ব যে অপচয় হ'ল, কে তার হদিস দেবে?

প্রাণ বাঁচাবার অন্ধ তাগিদে কত যুবতী মেয়ে যে নষ্ট হয়ে গেল, কত যুবতী মেয়ের দেহ যে বিকিয়ে গেল, কত ঘরের বউ যে ঘর-সংসার-সোয়ামী-পুত ছেড়ে শহর বাজারের খাপরা ছাওয়া রংমহলে গিয়ে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, চোখে সুর্মা টেনে দাঁড়াল, তার লেখা-জোখা নেই। পুব বাঙলার কত কুমারী মেয়ে আড়কাঠির কার-সাজিতে রাত্রির অন্ধকারে কোথায় কোথায় যে পাচার হয়ে গেল, কে তা বলে দেবে?

রিফুজীদের মুখে অনেক, অনেক কথাই শুনেছে পাল সাহাব।

দেশভাগের পর মানুষগুলো ভাসতে ভাসতে এখানে সেখানে এসে উঠল। বাছল না, বিচার করল না, বাছা বা বিচার করার মত সময়ই বা কোথায়? যে হাত তারা সামনে পেল, সেটা ধরেই উঠতে চাইল, বাঁচতে চাইল। কিন্তু সেই হাতটা ধাক্কা মেরে কোথায় কত দূরে নামিয়ে দিল, সেটা যখন তারা বুঝল, ভয়ে-আতঙ্কে-বিস্ময়ে বোবা হয়ে রইল।

হাজার হাজার বছর লেগেছিল পদ্মা-মেঘনা পারের সেই জীবন-টাকে মানুষের প্রাণের তাপে সুন্দর, স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে। কিন্তু দেশভাগ এক ফুঁয়ে তাকে লক্ষ লক্ষ বছর পিছনে হটিয়ে দিয়েছে। এ জীবন এখন পেটের তাড়নায় বর্বর, হিংসায় হিংস্র এবং স্বার্থে আদিম হয়ে উঠেছে।

দেশভাগ একটা জাতিকে পঙ্গু, বিকল, অথর্ব করে দিল।

এ দেশে মনুষ্যত্বের এত বড় অপমান, এত বিরাট অপচয় কোনদিন আর হয় নি।

লক্ষ লক্ষ মানুষ কিংবা অপচিত একটা জাতির কথা পাল সাহাব ভাবে না। অত বড় ভাবনার মত মনের তাগদও তার নেই।

তবে যে ক'টি ভাঙাচোরা, পঙ্গু মানুষ পেয়েছে, তাদের নিয়েই উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপে নতুন করে নিজের নিয়মে জীবন গড়তে শুরু করেছে পাল সাহাব।

আহা, পাগলা পাল সাহাব জীবন রসিক হয়ে গেল।

সেটেলমেণ্টের মধ্য দিয়ে ভাবতে ভাবতে ঢুলতে ঢুলতে এগিয়ে চলেছে পাল সাহাব।

হঠাৎ সেই তীব্র, অবুঝ, অস্বাভাবিক হাসির শব্দ উঠল। হাসিটা মেতে মেতে উঠতে লাগল।

পাল সাহাব চমকে উঠল। ঘুরে ঘুরে এদিক সেদিক তাকাতে লাগল।

এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতেই তার নজর পড়ল, বাঁ দিকের ছোট একটা টিলার মাথায় নিত্য ঢালীর ঘর। সেখান থেকেই শব্দটা আসছে।

হাসির তীব্র, অবুঝ শব্দটা বুঝিয়ে দিল, কে হাসছে।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল পাল সাহাব। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে টিলা বাইতে শুরু করল।

একুশ

ঘরটার সামনে খানিকটা ঘাসের জমি।

জমিটার এক কিনারে দুই হাঁটুর ফাঁকে ঘাড় গুঁজে চুপচাপ বসে আছে নিত্য ঢালী। আজ আর সে এরিয়াল উপসাগরে যায় নি।

পাল সাহাব সেটেলমেণ্টে আসার আগেই সে এরিয়াল উপসাগরে পালিয়ে যায়। পাল সাহাব চলে যাবার পর অনেক রাত্রে ফিরে আসে।

আজ কিন্তু নিত্য ঢালী ধরা পড়ে গেল।

ঘরের ভিতর থেকে তীব্র, অবুঝ হাসির শব্দটা আসছে। কাপাসী হাসছে।

আস্তে আস্তে নিত্য ঢালীর পিছনে এসে দাঁড়াল পাল সাহাব। নরম গলায় ডাকল, 'এ নিত্য—'

নিত্য ঢালী বুঝি পাল সাহাবের ডাকটা শুনতে পায় নি। স্থির, অনড় হয়ে যেমন ছিল, ঠিক তেমনি বসে রইল।

পাল সাহাব আবার ডাকল, 'এ নিত্য—'

এবার হাঁটুর ফাঁক থেকে ঘাড় তুলল নিত্য ঢালী। ঈষৎ রক্তাভ, ঘোলা ঘোলা চোখ। ঘোর ঘোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে।

অন্য সময় হ'লে পাল সাহাবকে দেখে নিত্য ঢালী চমকে উঠত। কিন্তু আজ কিছুই করল না। আচ্ছন্নের মত তাকিয়েই রইল।

আশ্চর্য!

যে পাল সাহাবের মুখ থেকে খেঁকানি আর খিস্তি ছাড়া কিছুই বার হয় না, তার আজ হ'ল কি ? নিত্য ঢালীর পাশে ঘন হয়ে বসল সে। পিঠে একটা হাত রেখে খুব মুলাইম স্বরে বলল, 'এ নিত্য, হয়েছে কী ? এমন করে বসে আছিস ?'

নিত্য ঢালী এতক্ষণে কথা বলল, নিজের কপালটা দেখিয়ে ভাঙা ভাঙা, ফ্যাসফ্যাসে শব্দ করে ফুঁপিয়ে উঠল, 'কী আর হইব সাহাব বাবা, হইছে আমার কপাল ! হা ভগমান—'

ভাঙা তোবড়ানো মুখ, কাঁচা পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ঘোর ঘোর চোখ, দোমড়ানো কুঁজো পিঠ। নিত্য ঢালীকে দেখতে দেখতে কেমন যেন দুঃখ হয় পাল সাহাবের। বুকের মধ্যটা মোচড় দিয়ে ওঠে। বলে, 'কী হয়েছে বলবি তো। অমন করে বসে থাকলে সব দুখ তোর ঘুচবে ?'

পাল সাহাবের কথার মধ্যে প্রাণের তাপ রয়েছে।

নিত্য ঢালী বলল, 'কান পাতেন সাহেব বাবা, সগল শুনতে পাইবেন।'

'শুনেছি, কাপাসীর হাসি তো ?'

'হ সাহেব বাবা—'

গরম, দীর্ঘ, মন্থর একটা শ্বাস ফেলল নিত্য ঢালী। বলল, 'এই হাসিটা শুনলেই পরাণটা আমার খাক হইয়া যায়। এ আমি সইতে পারি না, কিছুতেই যে সইতে পারি না। হা ভগমান—'

দু হাতে সমানে বুক থাপড়ায় নিত্য ঢালী।

মৌসুমী বাতাস নৈঋত কোণ থেকে টুকরা টুকরা তামারঙের মেঘকে আন্দামানের আকাশে নিয়ে আসছে। এতক্ষণ তীব্র, ধারাল রোদ ছিল। মেঘ সেই রোদকে ম্যাড়মেড়ে, নিবু নিবু এবং কাবু করে ফেলেছে।

আন্দামানের আকাশে মেঘ আসছে। বৃষ্টি নামার আয়োজন শুরু হয়েছে।

ঘরের মধ্যে কাপাসীর তীব্র, অবুঝ হাসিটা কলকল করে মাতছে। আজ যেন একটু বাড়াবাড়িই করছে সে। থেকে থেকে দমকে দমকে, কখনও বা ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে হেসে উঠছে কাপাসী।

পাল সাহাব বলল, 'আজ এ্যায়সা হাসছে কেন কাপাসী?'

'জানি না বাবা, বুঝি না। পাগলের মাথায় কোনদিন কি হয়, কেমনে কমু সাহেব বাবা!'

অন্য সময় হলে পাল সাহাব খেঁকিয়ে উঠত। আজ গাঢ় গলায় বলল, 'আচ্ছা নিত্য, একটা কথার জবাব দিবি?'

'কী কথা বাবা?'

'লেড়কী কি সচ্ই (সত্যিই) পাগল হয়েছে?'

'হ সাহেব বাবা—'

নিত্য ঢালী এক্কেবারে ভেঙে পড়ল।

কি একটু যেন ভেবে নিল পাল সাহাব। তারপর বলল, 'ইয়াদ আছে, একরোজ বলেছিলি, লেড়কীর কথা বলবি। মনে পড়ছে?'

'হ সাহেব বাবা, সত্যই আপনে শুনবেন?'

'হাঁ রে শালে, শুনবার জন্যেই তো এলাম। এই কলোনির সব আদমীর সুখ দুখ—সব কথাই তো আমার শুনতে হবে, বুঝতে হবে। আমি তোদের কথা না শুনলে কে শুনবে? কে আছে তোদের?'

গলাটা কেমন যেন অদ্ভুত শোনাচ্ছে পাল সাহাবের। সামনের টিলা-পাহাড়-জঙ্গল এবং অনেক দূরের আকাশ পেরিয়ে দৃষ্টিটাকে কোথায় যেন পৌঁছে দিল সে। এই মুহূর্তে নিজেকে একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে পাল সাহাব।

একবার পাল সাহাবের মুখের দিকে তাকাল নিত্য ঢালী। কেন যেন তার মনে হ'ল, এই মানুষটার মধ্যে অফুরন্ত শান্তি আছে। মনে হ'ল সব কথা, সব দুঃখ, দশ বছর ধরে যে অসহ্য, আকণ্ঠ যন্ত্রণায় সে বিকল হয়ে আছে, তার কথা বলে সে একটু জুড়োতে পারবে, একটু শান্তি পাবে। একটু হাল্কা হবে।

এই মানুষটাকে বুঝি বিশ্বাস করা চলে। হয়ত বা নিজের দুঃখ যন্ত্রণার শরিক করে নেওয়া যায়।

নিত্য ঢালী শুরু করল।

পুব বাঙলার আর দশটা কৃষাণ গ্রামের মতই নিত্য ঢালীদের গ্রামটি। সামনে ছোট একটি নদী।

শান্ত, স্নিগ্ধ, ছোট একটি গ্রাম। গ্রামের নাম সোনারঙ। নদীর নাম মাতানি।

পৃথিবীর হট্টগোল থেকে অনেক, অনেক দূরে এই গ্রাম পড়ে আছে। এই গ্রামের বাইরে কোথায় কি ঘটছে, এখানকার মানুষেরা তার খবর রাখে না। কোন ব্যাপারের কড়িই তারা ধারে না। হাজার হাজার বছরের অতল ঘুমে সোনারঙ গ্রামটা তলিয়ে ছিল।

মাস গিয়েছে, বছর ঘুরেছে। ঋতুচক্রে সময় পাক খেয়ে ফিরেছে। পৃথিবীতে কত বিবর্তন হ'ল, কত ওলট পালট হ'ল, কত পরিবর্তন হ'ল। রাজপাট থেকে কত রাজা গেল, কত রাজা এল। কোথায় বিপ্লব হ'ল, কোথায় গণবাসুকী ফণা তুলল। মাটির নীচের ভার-কেন্দ্রে কোথায় আলোড়ন শুরু হ'ল।

কিন্তু এই সোনারঙ গ্রামটা সেই যে অতল, অখণ্ড ঘুমে তলিয়ে ছিল, সে ঘুম আর ভাঙল না।

এখানে সময়ের ওঠাপড়ার কোন ইতিহাস নেই। সময় এই গ্রামটাকে অতি সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছে।

জোয়ার আর ভাটির ঠিক মাঝামাঝি সময় নদী যেমন স্থির, অনড়; এখানকার জীবনও ঠিক তেমনি। এখানে উজানের মাতা-মাতি নেই, ভাটির টান নেই।

নিজেদের চারপাশে লম্বা লম্বা দেওয়াল খাড়া করে মানুষগুলো

পরম নিশ্চিন্তে খায়, দায়, ঘুমায় আর উর্বরা নারীর গর্ভে জন্ম দেয়। পৃথিবীর কাছে জীবনের কাছে এমন করেই তারা দায় সারে, জন্মের ঋণ শোধ করে। পৃথিবীর সব ঢেউ চারপাশের দেওয়ালে ঘা খেয়ে ফিরে যায়।

এখানে উৎসব নেই, উত্তেজনা নেই।

মিঠা নদী মাতানির পারে নিতান্তই ঘুমন্ত, শান্ত, নিরুদ্বেগ, নিরুৎসব একটি গ্রাম।

সোনারঙ গ্রামে ঢালীদের বাস।

রাজা বাদশার আমলে ঢালীরা ছিল পাইক, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল। কিন্তু সে আমল আর নেই। থাকবেই বা কেমন করে? রাজা বাদশাই যখন নেই, তাদের কাল আর থাকে কেমন করে?

ঢালী পাড়ার সব চেয়ে প্রাচীন মানুষ কুঞ্জ ঢালী। সে বলত, 'ঢালীরা কি যে সে জাত, পাইক-লাইঠাল (লাঠিয়াল)—বীরের জাত।'

কিন্তু রাজা-বাদশাদের সঙ্গে সঙ্গে ঢালীদের বীরত্ব গেল, হাতের লাঠি গেল।

লাঠি হারিয়ে ঢালীদের কেউ কেউ মৎস্যজীবী হ'ল, কেউ কৃষাণ হ'ল, কেউ মাঝিগিরি ধরল। আবার কেউ কেউ নানান উঞ্ছবৃত্তিতে দিন কাটাতে লাগল।

নিত্য ঢালী পঁচিশ কানি তে-ফসলা জমি রাখত। আউশ ফলত, আমন ফলত, রবি ফসল ফলত।

তিন জনের সংসার নিত্য ঢালীর। বউ দামিনী, মেয়ে কাপাসী আর সে নিজে।

ছোট ছোট সুখ, ছোট ছোট দুঃখ, অফুরন্ত শান্তি আর অপরিমেয় সুখে বিভোর হয়ে ছিল নিত্য ঢালীরা।

কিন্তু মাতানি নদীর পারে সেই ঘুমন্ত সোনারঙ গ্রামটা একটা ঝাঁকানি খেয়ে হঠাৎ জেগে উঠল।

নিত্য ঢালী হাউ হাউ করে কাঁদে আর বলে, 'সব্বনাশ আসল সাহেব বাবা, চাইর পাশ থিকা বেড়া আগুন গেরামটারে ঘিরে ধরল।'

একটু থামল নিত্য ঢালী। খুব একচোট হাঁপাল। টেনে টেনে দম নিল। বুকটা হাফরের মত হাঁস হাঁস শব্দ করতে লাগল। আবার সে শুরু করল, 'বাবা পারলাম না, কিছুতেই পারলাম না সেই আগুনেরে ঠেকাইতে। আমার সব্বস্ব পুড়াইয়া, জ্বালাইয়া, খাক কইরা দিয়া গেল। কপালে যা লিখা ছিল, তাই হইল।'

মাঝে মাঝে থেমে, কেঁদে, হাঁপিয়ে, বুক আর কপাল থাপড়ে, চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে অনেক কথাই বলে যায় নিত্য ঢালী।

দামিনী বউ তাকে বার বার বলেছিল, এইখানে আর বেশি দিন থাকলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ঘরে সোনাদানা না থাক, বিত্ত-ব্যাসাদ না থাক, পরাণটা তো আছে। বিয়ের যোগ্য মেয়ে আছে।

পঁচিশ কানি তে-ফসলা জমি, সাতপুরুষের ভিটামাটি, বাগ-বাগিচা, ভদ্রাসন—বিষয়ী মানুষের মনে এসবের জন্য বড় কঠিন মায়া। এ সব ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে মন ঠিক সায় দেয় না। নিত্য ঢালী বলে, আর ক'টা দিন দেখাই যাক।

দামিনী বউ চেঁচাত, চুল ছিঁড়ত, দু হাতে নিত্য ঢালীকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলত, 'ড্যাকরা, যমের অরুচি—তুই আমার সব্বনাশ করবি। মেয়ের যদি কিছু হয়—হে ভগমান—'

মাটিতে আছড়ে পড়ে জোরে জোরে কপাল ঠুকত দামিনী বউ।

সোনারঙ গ্রামে ভাঙন ধরল একদিন। কুঞ্জ ঢালী, মাধব ঢালী, রাজেন ঢালীরা আসাম চলে গেল। একদল কুচবিহার রওনা হ'ল। একদল গেল কলকাতা। একে একে সবাই গ্রাম ছাড়ল।

দামিনী বউ বলত, 'সগলে গেরাম ছাড়ল, ভিটামাটি ছাড়ল। তোমারই খালি বিষয়ের লেইগা (জন্য) যত মায়া। অখনও বাঁচনের পথ আছে। চল, সগলের লগে (সঙ্গে) আমরাও যাই।'

'যাবি তো, খাবি কী? এই গেরামের বাইরে কে আমাগোর (আমাদের) লেইগা ভোগ সাজাইয়া রাখছে? এই গেরামের বাইরে আমরা চিনি কী? জানি কী? সেখানে গিয়া কী করুম?'

'সগলের যা হইব, আমাগোরও (আমাদেরও) তাই হইব। চল, এই গেরামে আমার বুক কাঁপে। কেউ নাই, সগলে গেছে। গেরামটা যেন শ্মশান। চল, চল—কপালে যা আছে তাই হইব।'

নির্জীব স্বরে নিত্য ঢালী বলত, 'দেখি আর কয়টা দিন—'

আর ক'টা দিন দেখতে গিয়েই যা হবার তা হয়ে গেল।

সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামটা যেন নিশুতিপুর।

সোনারঙ গ্রামে সাড়া নেই, শব্দ নেই। একেবারে নিশ্চুপ, নিঝুম।

যে দু চার ঘর এখনও গ্রাম ছাড়ে নি, তারা ফিস ফিস করে কথা বলে। দিন থাকতে থাকতেই দু চার গরাস গিলে দুয়ারে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ে।

সোনারঙ গ্রাম থেকে জীবনের অস্তিত্ব মুছে গিয়েছে। কে বলবে, এটা ঢালীদের গ্রাম; যে ঢালীরা একদিন রাজা-বাদশার পাইক-বরকন্দাজ ছিল।

সেটা কোন তারিখ, কি বার, হুবহু মনে আছে নিত্য ঢালীর। সর্বনাশের দিনের কথা কেউ কি ভোলে!

সেটা কৃষ্ণপক্ষের রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

সেই অন্ধকারকে ফেঁড়ে ফেঁড়ে মাতানি নদীতে অনেকগুলো মশাল জ্বলে উঠল। সোনারঙ গ্রামের অন্তরাত্মাটাকে ভয়ানক ভাবে চমকে দিয়ে হল্লা উঠল, 'হো-ও-ও-ও—'

'হো-ও-ও-ও—'

হল্লা আর মশাল এক সময় সোনারঙ গ্রামে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ঘরে ঘরে আগুন লাগল। ঘরপোড়া আগুন কৃষ্ণপক্ষের গাঢ় অন্ধকার ফুঁড়ে ফুঁড়ে কি যে বোঝাতে চাইল, কে জানে?

রাত্রিটাকে বিঁধে বিঁধে প্রাণফাটা কাতরানি, চিৎকার, হল্লা উঠছে।

শেষ পর্যন্ত আগুন আর হল্লা নিত্য ঢালীর ঘরের সামনে এসে পড়ল।

চালে আগুন জ্বলছে, কপাট ভাঙা হয়ে গিয়েছে।

গরীব ঢালীর ঘরে সোনাদানা নেই, বিত্ত-ব্যাসাদ নেই, একমাত্র বিয়ের যোগ্য যুবতী মেয়ে ছাড়া লুঠ করার মত কিছুই নেই।

এখনও সেই সর্বনাশা দুর্ভাগ্যের রাতটা নিত্য ঢালীর চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

নিত্য ঢালী শব্দ করে ফুলে ফুলে কাঁদে। কান্নাভরা ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, 'চোখের উপুর যা দেখলাম, পারি না, কোন দিন ভুলতে পারি না। হা ঈশ্বর, এমন সোন্দর পিরথিমী বানাইছ, এমুন সোন্দর মানুষ বানাইছ, কিন্তুক তার মনে এত পাপ দিলে ক্যান?'

হাতের পিঠে চোখ মুছতে মুছতে নিত্য ঢালী আবার বলে, 'শয়তানেরা কাপাসীর দিকে আগাইয়া আসল। ঠেকাইতে গেলাম, লাঠির একখান ঘাই খাইয়া পড়লাম। পারলাম না, আমি পারলাম না। বাপ হইয়া যা পারলাম না, মা হইয়া তাই করতে গেল দামিনী বউ। শয়তানগো মুখামুখি রুইখা (রুখে) খাড়াইল (দাঁড়াল)। মেয়ের মান বাঁচানের লেইগা কি না করল সে! সে কইল, 'আমারে আগে মার, মেরে ফেল। তবে মেয়ের গায়ে হাত দিতে পারবি। তার আগে না রে শয়তানেরা।'

'দুই হাতে কাপাসীরে সে আবডাল কইরা রাখল। মা-পঙ্খী

যেমুন তার ছাওরে আবডাল করে। বার বার সে লাঠির ঘাই খায়, বার বার পড়ে। পড়ে আর ওঠে। শ্যাষে তারা সড়কি মারল, এক হাত ফলাটা কাপাসীর মায়ের বুকে বিঁধে গেল। সেই যে সে পড়ল, আর উঠল না।'

এবার আর নিত্য ঢালী কাঁদল না। অদ্ভুত চোখে সামনের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রইল। এ সেই চোখ, নিরন্তু ব্যথায় যা উদাস, সীমাহীন দুঃখে যা ঝাপসা।

চুপচাপ পাশে বসে রয়েছে পাল সাহাব। আবছা গলায় সে বলল, 'তারপর কি হ'ল?'

'দামিনী বউ মরল। কাপাসীরে ছিনাইয়া নিয়া মাতানি নদী পার হইয়া তারা চলে গেল সাহেব বাবা। সাত দিন পর তারে আবার ফিরে পাইলাম। কিন্তুক এ কোন কাপাসী! হা ভগমান—'

একটু সময় চুপ করে রইল নিত্য ঢালী। তারপর বলল, 'সাহেব বাবা, বাপ হইয়া বলি, কাপাসী যদি মরত, আর যদি সে না ফিরত তা হইলে আমি বাঁচতাম। মনেরে বুঝাইতে পারতাম। কিন্তুক কাপাসী ফিরল। তারে নিয়া কইলকাতায় আসলাম। সেইখান থিকা এই আন্ধারমান (আন্দামান) দ্বীপি আসছি। কিন্তুক সাহেব বাবা—'

'বল্—'

'কাপাসী ফিরল। তার মাথাটা খারাপ হইয়া গেল। দিন রাইত সে খালি হাসে। হাসন আর থামে না। তার হাসন শুনলে বুকটা আমার কাঁপে। সাহেব বাবা, এর থিকা যদি কাপাসী মরত—'

ধরা ধরা ভারী গলায় পাল সাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'থাম্—'

এমন যে দুর্দান্ত পাল সাহাব, দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে যে এখানে কয়েদ খাটতে এসেছিল, নিত্য ঢালীর দুঃখের কথা শুনতে শুনতে সে যেন তার দুর্ভাগ্যের শরিক হয়ে গিয়েছে। বুকের ভিতরটা জ্বালা জ্বালা করছে, কণ্ঠার কাছে বিচিত্র এক কান্না পাকিয়ে পাকিয়ে

উঠছে। চোখ দুটো লোনা জলে বুঝি ভরেই গিয়েছে। চোখ ঢাকবার জন্য ফেল্ট হ্যাটটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিল পাল সাহাব। তারপর উঠে দাঁড়াল।

অদ্ভুত একটু হাসল নিত্য ঢালী। বলল, 'খালি দুঃখুর কথা শুনেই আপনের মনটা খারাপ হইয়া গেল সাহেব বাবা?'

'হাঁ রে কুত্তা—'

'আমি যে দশ বছর ধরে এই দুঃখুরে বুকের ভিতর পুষতে আছি! এই দুঃখু যে আমারে জ্বালাইয়া, পুড়াইয়া, খাক করে ফেলল! আমার কথাটা এট্টু ভাবেন সাহেব বাবা, এট্টু ভাবেন। এই দুঃখু বুকে নিয়া কিছুই যে করতে পারি না। কোন কামেই যে মন বশ খায় না। এই দ্বীপি এসে সগলে মাটি কুপায়, ঘর বানায়, মাছ মারে—আমিই খালি পলাইয়া থাকি।'

পাল সাহাব কিছুই বলল না। টলতে টলতে টিলা বেয়ে নীচে নামতে লাগল।

আর পিছনে নিত্য ঢালীর ঘরে কাপাসীর হাসি কল কল করে বাজতে লাগল, মাততে লাগল।

বাইশ

যে মেঘের জন্য পাল সাহাব উন্মুখ হয়ে ছিল, তা অনেক আগেই এসে পড়েছিল। এবার বৃষ্টি শুরু হ'ল।

সীসার রঙের মত দীর্ঘ, ধারাল ফলায় বৃষ্টি নামছে। উত্তর আন্দামানের আকাশ, পাহাড়, জঙ্গল—সব কিছু বৃষ্টির রঙে আবছা হয়ে গিয়েছে।

পোর্ট ব্লেয়ারে নিয়ে বিনোদ ভূঁইমালীকে ছুতারের কাজে, অনন্ত শীলকে নাপিতের কাজে, রাখুকে গুরুস্বামীর দোকানের কাজে—এমনি প্রায় জন পনেরকে নানান কাজে লাগিয়ে দিয়ে এসেছিল পাল সাহাব। আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখেই তাদের আবার ডিগলিপুর ফিরিয়ে এনেছে।

বৃষ্টি পড়ছে।

এই দ্বীপের নতুন মানুষগুলোকে নিয়ে যে মাটি কুপিয়ে চৌরস করে রেখেছিল পাল সাহাব, বৃষ্টিতে তা নরম, সরস হয়ে যাচ্ছে।

আবাদের পক্ষে এখন সুদিনও না, মরশুমও না।

তবু নোনা জলের মাঝখানে যে মিঠে মাটি পাওয়া গেল, তার গর্ভ ধারণের ক্ষমতা কতখানি, তা দেখবার জন্য বীজ ছড়াবে পাল সাহাব।

দিন তিনেক অঝোর ধারায় বৃষ্টি হ'ল।

তিন দিনের বৃষ্টিতে বীজ বোনা চলে না।

সবাইকে নিয়ে জমিতে এল পাল সাহাব। মাটি বেশ নরম হয়েছে ; জলে ভিজে মাখন হয়ে গিয়েছে।

পাল সাহাব বলল, 'কি রে, এই জলে বীজ ফেলা যাবে ?'

বুড়ো রসিক শীল সারাটা জীবন আবাদ করে করে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছে। মাটির মেজাজ সে বোঝে। মাটি কতখানি জল পেলে গর্ভিণী হয়ে ফসলের জন্ম দিতে পারে, তা তার জানা। মাটি আর জল সম্বন্ধে তার অনেক কালের অভিজ্ঞতা। পাল সাহাব তাকেই আবার বলল, 'কি রে বুড্ঢা, তোর কি মনে হয় ?'

এক ডেলা মাটি হাতে তুলে ছেনে ছেনে পরখ করল রসিক শীল। মাথা নেড়ে বলল, 'না সাহেব বাবা—'

'কী না ?'

'জমিন অখন বীজ রোয়ার যুগ্য হয় নাই। মাটি আর কয়টা দিন বিষ্টি খাউক। তারপরে দেখা যাইব।'

'আচ্ছা।'

এর পর দিন সাতেক আকাশ বিমুখ হয়ে রইল। তার কৃপণ মুঠি বেয়ে এক ফোঁটা জলও ঝরল না।

মাটি সরস হয়েছিল, তেজী রোদে আবার শুকিয়ে যেতে লাগল।

আকাশের দিকে তাকিয়ে মানুষগুলো বলল, 'হায় ভগমান, তুমি এমুন বৈমুখ (বাম) হইলা !'

সাত দিনের পর আরো দশ দিন গেল।

আকাশে টুকরা টুকরা তামারঙের অসংখ্য মেঘ। সেই মেঘ নিঙড়ে এক ফোঁটাও জল ঝরল না।

আন্দামানের মেঘ এবারের মত আর কোন বার এত বিমুখ থাকে নি। এত কৃপণতা করে নি।

অনেক দিন পর মানুষগুলোকে নিয়ে আবার জমিতে এল পাল

সাহাব। জমির দিকে তাকিয়ে তার চোখ স্থির হয়ে গেল। অন্তরাত্মাটা কেঁপে উঠল।

এই ক'দিনের তেজী রোদে মাটি শুকিয়ে রয়েছে। আর সেই শুকনা মাটি ফুঁড়ে অসংখ্য সবুজ অঙ্কুর মাথা তুলেছে। যতদূর তাকানো যায়, সবুজে সবুজে জমিন ছেয়ে আছে।

বুড়ো রসিক শীল বলল, 'বীজ রুইলাম না, তবু জমিন এ কোন ফসলে ভরে গেল সাহেব বাবা ?'

পাল সাহাব চিৎকার করে উঠল, 'সব্বনাশ হয়ে গেছে, বিলকুল সব্বনাশ—'

পাল সাহাবের চিৎকারে রসিক শীলেরা ভয় পেয়ে গেল। ফিস ফিস করে তারা বলল, 'কী হইছে সাহেব বাবা ?'

'জঙ্গল, জঙ্গল—হুই দ্যাখ, মুথিয়া লতা, জলডেঙ্গুয়া আর হাওয়াই বুটি গজিয়ে রয়েছে।'

চিল্লাতে চিল্লাতে আরো অনেক কথা বলল পাল সাহাব।

অরণ্য কি এত সহজে নির্মূল করা যায় ? এই দ্বীপের মাটিতে হাজার হাজার বছর ধরে জঙ্গলের বীজ মিশে আছে। মুথিয়া লতার বীজ, জলডেঙ্গুয়া আর হাওয়াই বুটির বীজ, প্যাডক আর চুগলুম গাছের বীজ। নানান জাতের গাছ আর আগাছার বীজ।

মাটির উপরের জঙ্গল হয়ত সাফ করা যায়। কিন্তু তার অস্তিত্বের সঙ্গে, তিন পরল নীচে তার গর্ভকোষে যে জঙ্গল রয়েছে, তাকে কেমন করে নিশ্চিহ্ন করা যাবে ?

যেই জল পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে মাটি ফুঁড়ে জঙ্গল মাথা তুলেছে।

পাল সাহাব হতভম্ব হয়ে গিয়েছে।

জঙ্গলকে নির্মূল করতে না পারলে ফসল কিছুতেই ফলানো যাবে না। মাটিতে জল পড়লেই যদি জঙ্গল গজায়, তা হ'লে বীজ-দানা কেমন করে রুইবে ?

পাল সাহাব বিড় বিড় করতে লাগল, 'সব্বনাশ, বিলকুল সব্বনাশ। এ মিট্টিতে (মাটিতে) তো ফসল ফলানো যাবে না।'

এই মাটির আশায় হাজার মাইল নোনা জল ঠেলে এই দ্বীপে এসেছে মানুষগুলো। কিন্তু মাটিতে জল পড়লেই যদি জঙ্গল মাথা তোলে তা হ'লে ফসল কেমন করে ফলবে? আর ফসল না ফললে তারা কিসের আশায় কিসের ভরসায় এই দ্বীপে থাকবে?

আন্দামানের এই মাটিই ছিল তাদের বাঁচার শেষ উপায়। কিন্তু জঙ্গল তার দখল ছাড়তে রাজী নয়।

বাঁচার আর আশা নেই। নির্ঘাত তারা মরে যাবে।

আচমকা উত্তর আন্দামানের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপটাকে চমকে দিয়ে মানুষগুলো শোর তুলে কান্না জুড়ে দিল।

হতাশায়, দুঃখে তারা একেবারেই ভেঙে পড়েছে।

অন্য সময় হ'লে এক ধমকে তাদের কান্না থামিয়ে দিত পাল সাহাব। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে কি যে সে বলবে, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারল না। তার গলায় ধমকও যেমন ফুটল না, একটা সান্ত্বনার কথাও তেমনি জোগাল না।

বিব্রত, বিমূঢ় পাল সাহাব দাঁড়িয়ে রইল।

সকলের সঙ্গে বুড়ী বাসিনীও এসেছিল। সে কাঁদছিল না। এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষগুলোর কান্না শুনছিল।

পুরুষ মানুষের কান্না অসহ্য লাগে বুড়ী বাসিনীর। সে সামনে এগিয়ে এল। বলল, 'কাঁদিস ক্যান? কান্দনের (কাঁদার) হইল কী?'

বুড়ো রসিক শীল বলল, 'কান্দুম না, কও কী তুমি খুড়ী! যে মাটির ভরসায় কালাপানি পাড়ি দিয়া এত দূরে আসলাম, সেই মাটি এমুন বিশ্বাসঘাতী হইল! হা ঈশ্বর, বাঁচুম ক্যামনে? বাঁচার আর যে পথ নাই—'

'ভাসুর পুত, তোরা কী সগল ভুললি! আট দশ বচ্ছর আমরা

রিফুজী হইছি, কিন্তুক তার আগে তো ঘরবসত, জমিন-জমা—বেবাকই (সব) আছিল। আছিল কিনা ?'

বুড়ী বাসিনী রসিক শীলকে ভাসুর পুত ডাকে। কখনও কখনও নাম ধরেও ডাকে। রসিক শীল তার ডাকের ভাসুর পুত। নইলে এমনি কোন সম্পর্ক নেই।

তিন কুলে কেউ নেই বাসিনীর। বাপ না, ভাই না, সোয়ামী না, পুত না, না বলতে কেউ না। তিন কুলের সবাইকে খেয়ে বসে আছে সে।

দেশভাগের পর ফরিদপুর জেলার ছোট্ট গ্রাম ছিপতিপুর থেকে ভাসতে ভাসতে কলকাতায় এসেছিল বাসিনী। শিয়ালদা স্টেশনে রসিক শীলের সঙ্গে তার আলাপ। প্রথম আলাপেই সে তার সঙ্গে খুড়ী ভাসুর পুত সম্পর্ক পাতিয়ে নিল। সম্পর্কই শুধু পাতানো হ'ল না। রসিকের সংসারে গিয়ে উঠল বাসিনী।

শিয়ালদা স্টেশন থেকে ধুবুলিয়া ক্যাম্প। ধুবুলিয়া ক্যাম্প থেকে উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপ। ন' দশ বছর রসিকদের সঙ্গে কাটিয়ে দিল বাসিনী।

বাসিনী আগের কথাটা আবার বসল, 'তোরা কী সগল ভুললি ভাসুর পুত ?'

'কী ভুললাম খুড়ী ?'

'চাষ, আবাদ, ক্ষেতি—সগল ?'

'ভুলুম ক্যান ? চাষ আবাদের কথা কেও নি ভোলে ?'

'হ, ভুলছিস। তা না হইলে শুধাশুধি কাঁদিস ?'

একটু থামে বাসিনী। এক ডেলা মাটি হাতে নিয়ে বলে, 'এই মাটি সোনার মাটি, বাহারের মাটি। এই মাটিতে সোনা ফলব। কিন্তুক কোদাল দিয়া মাটি চষলে হইব না রসিক।'

'তবে ক্যায়সা ?'

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল পাল সাহাব। বুড়ী বাসিনীর কথাগুলো

খুব মন দিয়ে শুনছিল। এবার সে বলল, 'তবে ক্যায়সা রে বুড্‌ঢী? মাটি চষা হবে কেমন করে?'

'খালি কোদালের কাম না সহেব বাবা। লাঙ্গল লাগব। হাল-হালুটি আর বলদ লাগব। পরল পরল মাটি তুলে জঙ্গলেরে সাফ করে ফেলতে হইব। তবে না মাটি ফসল ফলাইব। সগল কি এমনে এমনে?'

'ঠিক বাত বুড্‌ঢী, হাল-বলদের বন্দোবস্ত্‌ করছি। আজ সোমবার, পরশু বুধবার। বুধবার তো জাহাজ আসবে, তাই না রে শালে লোগ?'

মানুষগুলো সায় দিল, 'হ।'

প্রতি বুধবার অর্থাৎ সপ্তাহে এক বার মাত্র পোর্ট ব্লেয়ার থেকে জাহাজ আসে উত্তর আন্দামানের এই উপনিবেশে। এই উপনিবেশ, যার নাম ডিগলিপুর। যে জাহাজ নিয়ম করে সপ্তাহে এক দিন মাত্র আসে, তার নাম 'চলুঙ্গা'।

অনেক, অনেক দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে ডিগলিপুর। 'চলুঙ্গা' জাহাজই বাইরের পৃথিবী আর এই দ্বীপের মধ্যে একমাত্র যোগাযোগ।

ঠিক হ'ল, বুধবার পোর্ট ব্লেয়ার যাবে পাল সাহাব।

পাল সাহাব বলল, 'চীফ্‌ কমিশনারের সাথ মুলাকাত করে হাল-বলদের বন্দোবস্ত্‌ করে আসব। জরুর করব।'

তেইশ

উদ্ধব বৈরাগীর প্রাণটা বড় সরস, সজীব। খুশির রসে সব সময় তার মুখখানা টসটস করে।

দেশভাগের পর আট দশটা বছর উদ্ধবের জীবন থেকে সব সুর, সব গান, সব আনন্দ মুছে গিয়েছিল। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে এসে পায়ের নীচে মাটি পেয়ে আবার সব ফিরে পেয়েছে সে। সেই সুর, সেই গান, সেই আনন্দ।

এখন বিকাল।

এখনও উপসাগরের দিক থেকে সাগরপাখিরা দ্বীপে ফিরে আসে নি। জঙ্গলের মাথায় এখন হলদে রঙের উজ্জ্বল, ঝলমলে রোদ ছড়িয়ে রয়েছে।

উদ্ধব বৈরাগী এই দ্বীপে এসে একটা দোতারা বানিয়ে নিয়েছে। দোতারার তারে আঙুলের গুঁতো মেরে সুর তোলে সে। তিড়িং-টুঙ, টাঙ-টুঙ—দোতারা বাজায় আর গান গায় উদ্ধব। রসের গান—

সোনাদিদি লো,
পরাণে লাগাইয়া দিলি ভাবনা।
তোর সোনার অঙ্গ জরজর,
তোর বুকের ভিতর থরথর,
তুই কি করিতে কি যে কর,
মরলাম ভেবে সেই ভাবনা।
সোনাদিদি লো,
পরাণে লাগাইয়া দিলি ভাবনা।

উদ্ধবের প্রাণটা আজ অকারণ খুশিতে ভরে আছে। না হ'লে কি সে এই রসের গান ধরত!

গাইতে গাইতে কিলপণ্ড নদীর পারে এসে পড়েছে উদ্ধব।

সোনার বল্লমের মত কয়েকটা রোদের রেখা কিলপণ্ড নদীটাকে বিঁধছে।

কয়েকটি যুবতী মেয়ে জল নিতে এসেছিল। উদ্ধবকে দেখে তারা চঞ্চল হ'ল।

কিলপণ্ড নদীর পারে গুঞ্জন উঠল, 'খাইছে লো, বৈরাগী ভাই আসছে। মুখখান তার যা আলগা, কিছুই বাধে না।'

বাউল বৈরাগী মানুষ উদ্ধব। মাপজোখ করে কথা বলা তার স্বভাবেই নেই। যা তার প্রাণে আসে, তাই সে বলে ফেলে। তার রাখ রাখ ঢাক ঢাক নেই। বাছ-বিচার নেই। মনের কথা সে বেঁধে রাখতে জানে না। জিভের আগায় যে কথা আসে, তাই খসে পড়ে।

কি বলতে কি যে বলবে উদ্ধব, আগে ভাগে তার হদিস মেলে না।

যুবতীরা শুধু এটুকু জানে, উদ্ধবের মুখে কিছুই আটকায় না। এটুকু জেনেই তারা কাঁটা হয়ে আছে।

কিলপণ্ড নদীর পারে দাঁড়িয়ে রঙ্গ শুরু করল উদ্ধব। রসের গানের প্রথম পদ ছুটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টেনে টেনে গাইতে লাগল।

সোনাদিদি লো,
পরাণে লাগাইয়া দিলি ভাবনা—

গায় আর নাচে উদ্ধব।

একসময় গান থামিয়ে সে বলল, 'সোনাদিদিরা, জল নিতে আসছ বুঝি?'

'হু।'

যুবতীরা সংক্ষেপে জবাব সারে।

এত যে দুঃখ, এত যে ধান্দা, বাঁচার জন্য এই যে নিরন্তু লড়াই, তবু মানুষের প্রাণটা তো মরে না। প্রাণের সেই আনন্দ মরে না।

উদ্ধব বৈরাগীদের মত মানুষ প্রাণের সেই আনন্দটাকে বঙ্গোপ-সাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে এসেও মরতে দেয় না। তাজা, সজীব, সরস রাখে।

উদ্ধবদের জন্যই মানুষ বার বার মরেও বার বার বাঁচে। তারা যে দুঃখ এবং যন্ত্রণাকে নিঙড়ে নিঙড়ে ফোঁটা ফোঁটা আনন্দ বার করতে জানে।

উদ্ধব বলে, 'জল নিতে আসছ না জল সইতে আসছ ?'

একটি মেয়ে বলে, 'বিয়া লাগল কার যে জল সইতে আসুম ?'

'ক্যান তোমাগো (তোমাদের) সগলের।'

মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে ফিক করে একটু হাসে মেয়েটি। অন্য মেয়েদের মুখ লজ্জার রঙে মাখামাখি হয়ে যায়।

মেয়েটি বড় মুখরা। সে বলে, 'কার লগে (সঙ্গে) বিয়া ?'

'আমার লগে।'

বলেই গেয়েই ওঠে উদ্ধব—

সোনাদিদিরা,

পরাণে লাগাইয়া দিলি ভাবনা।

সঙ্গে সঙ্গে হুড়াহুড়ি পড়ে যায়। খিল খিল ফিকির ফিকির হাসি। জলের টিন নিয়ে তর তর করে টিলা বেয়ে বেয়ে যুবতীরা চলে যায়।

যুবতীদের কাণ্ড দেখে ফোগলা মুখে হাসে উদ্ধব বৈরাগী। প্রাণখোলা উদার হাসি।

যুবতীদের পিছন পিছন উদ্ধবও চলে যেত; কিন্তু হঠাৎ তার চোখে পড়ে গেল। কিলপণ্ড নদীর পারে তিলি বসে আছে। কোন দিকে তার লক্ষ্য নেই। চুপচাপ, উদাস চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কি যেন ভাবছে।

কী ভাবছে তিলি ?

উদ্ধব নিজের মনেই বলল, 'আমি তো আর অন্তরযামী না, তিলি কি ভাবে, কেমনে জানুম (জানব) ?'

টিলা থেকে নীচে নেমে এল উদ্ধব। তিলির মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল। তিলি কিছুই বলল না।

এক একদিন বয়সটা অনেক কমে যায় উদ্ধবের। অদ্ভুত এক ছেলেমানুষিতে তাকে পেয়ে বসে।

আস্তে আস্তে উদ্ধব ডাকল, 'তিলি—'

তিলি জবাব দিল না। যেমন বসে ছিল, তেমনি রইল।

একদৃষ্টে তিলির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল উদ্ধব। তিলির কপালে মেটে সিঁদুরের মস্ত এক টিপ। টিপ দেখতে দেখতে গান শুরু করল সে—

তুমি কি দিয়া ভুলাইলে
শ্যামচান্দের মন রে—
দেখিয়া, দেখিয়া আচম্বিত (অবাক) আমি।
তোমার কপালের সিন্দুরে
ঝলমল ঝলমল করতেছে,
দেখিয়া, দেখিয়া আচম্বিত আমি।
তুমি কি দিয়া—

তিলি হঠাৎ ক্ষেপে উঠল, 'তুমি থাম দেখি বৈরাগী দাদা—'

'ক্যান, থামুম ক্যান ? থামনের হইল কী ?'

'রসের কথা কি সব্বক্ষণ ভাল লাগে ?'

'আমার তো লাগে।'

'তোমার কথা ছাড়ান দাও।'

'ক্যান, আমার কথা ছাড়ান দিমু ক্যান ? আমি কি পিরথিমী ছাড়া ?'

অল্প একটু হাসল তিলি। বলল, 'হ গো, তাই। তুমি বাউল

বৈরাগী মানুষ। তোমার কথাই ভিন্ন। তোমার সব্ব অঙ্গে রস, তোমার পরাণভরা রস। হ'তে যদি সোংসারী মানুষ, বুঝতে জ্বালা কারে কয়! বুঝতে সোংসারের তাপে রস কেমনে শুকাইয়া যায়!'

উদ্ধব কিছুই বুঝতে চায় না। অবুঝ গলায় গেয়ে ওঠে।

তোমার কপালের সিন্দুরে

ঝলমল ঝলমল করতেছে,

দেখিয়া, দেখিয়া আচম্বিত আমি—

তিলি এবার ক্ষেপে উঠল, 'খুব তো সিন্দুরের বাখান কর। কিন্তুক এই সিন্দুরের যে কি জ্বালা, তা তো কোন কালে বুঝলা না বৈরাগী ভাই। হ'তে মেয়েমানুষ, পিরথিমীতে আমার লাখান (মত) আর এক তিলি হইয়া জন্ম নিতে, বুঝতে সিন্দুরের জ্বালা কারে কয়! বুঝতে সোংসার কারে কয়!'

আর রঙ্গ করল না উদ্ধব। তিলির পাশে বসে পড়ল। তার থম থম উদাস মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে বলল, 'কী হইছে রে দিদি?'

তিলি জবাব দিল না।

তিলির কাঁধে অল্প একটু ঠেলা মেরে উদ্ধব আবার বলল, 'হরিপদর লগে (সঙ্গে) কিছু হইছে?'

উদ্ধবের গলায় উদ্বেগ ফোটে।

বড় দুঃখে হাসে তিলি। বলে, 'এই কি আর নয়া কথা বৈরাগী ভাই! জনমভর কোন দিনটা বাদ গেছে, যেইদিন তার লগে (সঙ্গে) আমার লাগে নাই! একটা দিনও চুলাচুলি ছাড়া নাই গো ভাই। একটা দিনও নাই।'

তিলি এমনিতেই ঘোমটা দেয় না। আজ কি মনে করে দিয়েছিল। ঘোমটাটা খসে পড়েছে।

ঘোমটা-খসা, উদাসিনী তিলি নদীর স্রোতটার দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

হরিপদকে নিয়ে তিলির যে জীবন, সে জীবনে সুখ নেই, শান্তি নেই। দু জনের মধ্যে বনিবনা নেই, আপোষ নেই, রফা নেই। ব্যাপারটা এত স্পষ্ট এত প্রকাশ্য যে তার আর কিছুই গোপন নেই, ঢাকাঢাকির চেষ্টাও নেই।

আর কিছু রটুক আর নাই রটুক, তাদের সোয়ামী আর স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না থাকার খবরটা ঠিকই জানাজানি হয়ে যায়।

কথায় কথায় বুড়ী বাসিনী বলে, 'সু তো রটে না, কু-টাই রটে।'

হরিপদ আর তিলির ব্যাপারটা এই উপনিবেশের সবাই জেনে ফেলেছে।

গভীর গলায় উদ্ধব বলে, 'মানাইয়া নে দিদি, মানাইয়া নে। হাজার হউক সোয়ামী তো।'

উদ্ধব আন্দাজ করে নিয়েছে, হরিপদর সঙ্গে আজও তিলির কিছু একটা হয়েছে। তিলির মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলায় সে। বলে, 'মেয়েমানুষের জন্ম নিয়া এই পিরথিমীতে আসছিস। মেয়ে মানুষের অনেক কিছু সইতে হয় দিদি, অনেক সইতে হয়—'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

কেউ কিছুই বলে না। উদ্ধব বৈরাগীও না, তিলিও না।

হঠাৎ একসময় তিলি ডাকল, 'বৈরাগী ভাই—'

ডেকেই থেমে গেল।

উদ্ধব বলল, 'কী কও?'

কি একটু যেন ভাবল তিলি। একটু ইতি উতি করল। তারপর বলেই ফেলল, 'আচ্ছা বৈরাগী ভাই, আমি তো একজনের বউ।'

'হ, তা হইছে কী?'

'আমার এই শরীল, এই মন যখন সোয়ামীর কোন কামে লাগল না, তখন এগুলিরে আমি উড়াইয়া দিমু, বিলাইয়া দিমু—'

'কী কইস তিলি?'

উদ্ধব বৈরাগী শিউরে উঠল।

তিলি তার কথার জবাব দিল না। নিজের খেয়ালেই বলতে লাগল, 'নিন্দা রটব। পিরথিমীর সগল মানুষ আমার গায়ে থুথু দিব, মুখে চুনকালি দিব। জানি, সগল জানি। তবু এ ছাড়া আমার আর উপায় নাই বৈরাগী ভাই।'

উদ্বিগ্ন স্বরে উদ্ধব বলল, 'তিলি, তোর মনে কী আছে?'

'আমার মনে যা আছে, সময় আসলেই জানতে পারবা। মনে যা আছে, তা আমি করুম, করুম, করুম। নিচ্চয় করুম। এই কথা তোমারে বলে রাখলাম।'

তীক্ষ্ণ, রিনরিনে গলায় হেসে উঠল তিলি।

তার বিড়ালীর মত কটা চোখ দুটো জ্বলতে লাগল।

তিলির চোখে সর্বনাশ দেখতে পেল যেন উদ্ধব। দেখে ভয় পেয়ে গেল।

তিলির মনে কি আছে, কে জানে?

চব্বিশ

এখন দুপুর।

সেই সকালে উপসাগরে নেমেছিল লা তে। নটিলাস, টার্বো, ট্রোকাস, সান ডায়াল—নানা জাতের সামুদ্রিক কড়ি তুলে খানিকটা আগে জল থেকে উঠেছে।

এরিয়াল উপসাগরটা ঘোড়ার খুরের আকারে বেঁকে ডান দিকে যেখানে সমুদ্রে মিশেছে, সেখানে এক টুকরা কালো পাথরে চুপচাপ বসে আছে লা তে।

বাঁ দিকে খানিকটা দূরে একটা প্যাডক গাছের নীচে তিন টুকরা ইঁট সাজিয়ে উন্নুন বানিয়ে নিয়েছে পানিকর। উন্নুনের মাথায় ভাত ফুটছে।

আকাশে পেঁজা তুলোর মত টুকরা টুকরা ছন্নছাড়া মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাতে রোদের তেজ এতটুকু মরে নি।

তীব্র, ধারাল, উত্তেজক রোদে নোনা জল গেঁজে গেঁজে উঠছে।

দুই হাঁটুর মাথায় থুতনি রেখে এক দৃষ্টে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে লা তে। জল শুকিয়ে চামড়ায় কণা কণা নুন ফুটে বেরিয়েছে।

আন্দামানের দরিয়ার সঙ্গে কত কালের জানাশোনা লা তে'র। বার চোদ্দ বছর বয়স থেকে শেল ডাইভারের কাজ করে আসছে সে।

কোন উপসাগরে ঝাঁকে ঝাঁকে টার্বো আসে, কোন উপকূলে

হাঙর আর অক্টোপাসের আস্তানা, কোথায় পার্ল শেল, কোথায় ফ্রগ শেল, কোথায় নটিলাস আর কোথায় নী-ক্লাম মেলে—সব, সব খবর লা তে'র জানা।

রেমোরা মাছ, হাঙর আর কামটের সঙ্গে লড়ে লড়ে সে সিপি তোলে। দরিয়ার কর আদায় করে।

পনের বিশ বছর ধরে সিপি তুলতে তুলতে দরিয়ার সঙ্গে অদ্ভুত এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে লা তে'র।

সঙ্গে যখন আর কেউ থাকে না, যখন একেবারেই একা হয়ে পড়ে, কিংবা যখনই একটু ফুরসত পায়, নিরিবিলি সমুদ্রের মুখোমুখি গিয়ে বসে লা তে। ফিস ফিস করে সমুদ্রের সঙ্গে কথা বলে।

দরিয়ার সঙ্গে লা তে'র কত কালের দোস্তি, কত মহব্বতি।

এখন ঝিম দুপুর।

শীতের অনেক আগেই মানস সরোবর থেকে হাজার হাজার পাখি বাতাসে ভাসতে ভাসতে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ডিম পাড়তে আসে। শীত যেই শেষ হয়, ডিম পাড়া যেই সারা হয়, পাখিরা আবার ফিরে যায়।

ছোট ছোট ডানায় দিগন্ত মাপতে মাপতে পাখিরা মানস সরোবরে ফিরে যাচ্ছে।

লা তে পাখি দেখছিল না। সমুদ্রের দিক থেকে চোখ ফেরাতে মন তার সায় দিচ্ছিল না।

জন্মের পর থেকেই দরিয়া দেখছে লা তে। দিনের অন্তত অর্ধেকটাই নোনা জলে কাটিয়ে দেয় সে।

সমুদ্রের সঙ্গেই তার মাতামাতি, লুটোপুটি চলে।

লা তে'র সত্তার সঙ্গে, অস্তিত্বের সঙ্গে, স্বভাবের সঙ্গে সমুদ্র মিশে আছে।

উপসাগরটা অগভীর। তার জল সবুজ। কিন্তু দূরে, আরো দূরে জল গভীর, গম্ভীর, গহীন কালো। অনেক, অনেক দূরে যার

পর আর দৃষ্টি চলে না, যেখানে আকাশের নীল আর সমুদ্রের কালো একাকার; ঠিক সেইখানটা ধূসর হয়ে রয়েছে। সাদা কুয়াশার মত কি যেন জমে রয়েছে সেখানে। কেমন যেন দুর্বোধ্য, দুজ্ঞের্য় দেখায়।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গাঢ়, মন্থর একটা নিশ্বাস ফেলল লা তে। অগভীর উপসাগরের মেজাজ সে কিছুটা জানে, নানা জাতের সিপির খবরও তার জানা। কিন্তু অনেক দূরে সমুদ্র যেখানে অথৈ, অতল, সেখানকার কথা সে জানে না।

এতকাল নোনা জলে ডুবে ডুবেও সমুদ্রকে পুরাপুরি বুঝে উঠতে পারল না লা তে। সমুদ্র দুর্বোধ্য, দুজ্ঞের্য়, রহস্যময় হয়েই রইল। সমুদ্র শুধু জল, ঢেউ আর গর্জনই নয়। সে আরো কিছু। অন্য কিছু। সমুদ্র যে ঠিক কি, অল্পই বুঝতে পারে লা তে। বেশির ভাগই তার অবোঝা।

দূরের দিকে তাকিয়ে লা তে ভাবল, আর উপসাগরের অগভীরে না, যেখান থেকে সিপিরা উপকূলের দিকে আসে, সমুদ্রের সেই গভীরে একবার সে যাবে।

ফিস ফিস করে লা তে বলতে লাগল, 'যাব, জরুর একরোজ দরিয়ার অন্দরে ডুব মারব। দেখব, তোর অন্দর কী আছে?'

'শালে কি পাগলা বনলি? বিজির বিজির করে কি বকছিস?'

লা তে চমকে উঠল। কখন যে পানিকর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, বুঝতে পারে নি।

পানিকরকে দেখে লাল লাল দাঁত বার করে খুব একচোট খ্যা খ্যা করে হাসল লা তে। তারপর বলল, 'কী মতলব মালেক?'

পানিকর খেঁকিয়ে উঠল, 'কি আবার মতলব! নালায়েক হারামীটা দরিয়া দেখলে বাওরা বনে যায়। খাবি না? কখন খানা পাকানো হয়ে গেছে!'

'হাঁ মালেক—'

লা তে উঠে পড়ল।

খেতে খেতেই পানিকরের চোখে পড়ল। শুধু আজই না, দিন কয়েক ধরেই লোকটাকে দেখছে তারা।

পানিকর ডাকল, 'লা তে—'

'হাঁ মালেক—'

'হুই ত্থাখ্—দেখেছিস? লোকটা আজও এসেছে।'

'হাঁ।'

সংক্ষেপে জবাব সেরে মাছের সুরুয়া দিয়ে ভাত মাখতে লাগল লা তে।

পানিকর বলল, 'মনে হচ্ছে, লোকটা রিফুজী সেটেলমেণ্টের কেউ হবে।'

লা তে জবাব দিল না।

পানিকর বলল, 'তোকে এক রোজ বলেছিলুম, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। ইয়াদ আছে?'

'আছে।'

একটু কি যেন ভেবে নিল লা তে। ফস্ করে বলে ফেলল, 'লেকিন আপকো মতলবটা তো জানি না।'

ফিস ফিস করে পানিকর বলল, 'জানবি জানবি। সময় যখন হবে, তখন আপসে জানতে পারবি। থোড়া সবুর কর।'

পানিকরের চোখে অদ্ভুত একটু হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল।

খাওয়ার পালা চুকিয়ে পিতলের বর্তনগুলো উপসাগরের জলে ধুয়ে মোটর বোটে রাখল পানিকর। তারপর বলল, 'চল লা তে—'

'কোথায়?'

'হুই লোকটার সঙ্গে খাতির জমিয়ে আসি। ওর মারফতই রিফুজী সেটেলমেণ্টে যাব। সমঝালি?'

লা তে মাথা ঝাঁকাল

আর আর দিনের মত আজও এরিয়াল উপসাগরে এসেছে নিত্য ঢালী। লোনা জলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যে পাথরটা কচ্ছপের আকার পেয়েছে, তার উপর চুপচাপ বসে রয়েছে। উদাস চোখে সামনের দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে সেই পুরানো ভাবনাটা ভাবছে সে।

কি মানুষ ছিল, আর কি হয়ে গেল!

ঘরে সোনাদানা, মণিমাণিক্য না থাক, তবু দেশে থাকতে নিত্যর হাত ভরা পয়সা ছিল। পাটবেচা, ধানবেচা কাঁচা পয়সা। পঁচিশ কানি তেফসলা জমি রাখত সে। অভাব তার কোন কালেই ছিল না। হোক গরীব, তবু সচ্ছলতা ছিল।

দেশ ভাগের পর রিফুজী ক্যাম্পে ঢুকল নিত্য। ইদানীং এই দ্বীপে এসেছে। যে মানুষ দেশে থাকতে এত পয়সা নাড়াচাড়া করেছে, সরকারী খয়রাতের সামান্য ক'টি টাকা ছাড়া এখন তার হাতে আর কিছুই পড়ে না।

তা ছাড়া কাপাসী পাগল হয়ে গেল।

কাপাসী যে আবার কোনদিন ভাল হবে, সুস্থ হবে, মনের দিক থেকে এমন আশা এমন ভরসা আর পায় না নিত্য।

দেশ ভাগের ফলে তার সব গেল।

দামিনী বউ মরল, কাপাসী পাগল হ'ল। মনের জোর গেল। যে উদ্যম, যে উৎসাহ থাকলে জীবনকে নতুন করে গড়া যায়, তা-ও খোয়া গেল।

পৃথিবীতে তার মত দুঃখী আর কে?

দূরের সমুদ্র, দ্বীপ, আকাশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

প্রথম প্রথম নিত্যর মনে হয়েছিল, দিন বুঝি ফুরিয়ে যাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গেই তার ভুল ভাঙল। নিজের জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন চোখ দুটো ভিজে গিয়েছে। চোখের জলই সামনের দ্বীপ, সমুদ্র আর আকাশকে আবছা করে ফেলেছে।

হাতের পিঠে চোখ মুছতে মুছতে নিত্য ডাকটা শুনতে পেল।

'এ বুড্‌ঢা—'

'কে ?'

মুখ ঘুরিয়ে নিত্য ঢালী দেখল, সেই লোক দুটো পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কুচকুচে কালো, কোঁকড়ানো-চুল একটা লোক, যে মোটর বোট চালায়। আর কুতকুতে-চোখ, থ্যাবড়া-নাক একটা লোক, যে উপসাগরের জলে ডুব মেরে মেরে কি যেন তোলে। অর্থাৎ পানিকর আর লা তে।

পানিকর বলল, 'তোমাকে রোজ এখানে দেখি।'

'হ বাবা—'

নিত্য ঢালী হাউ হাউ করে উঠল, 'কী আর করি বাবা, কোলোনিতে মন বসে না। খালি দুঃখু আর দুঃখু। ঘরভরা দুঃখু, পরাণ ভরা দুঃখু। দুঃখুর আর পারকূল নাই। তাই এইখানে এসে যতক্ষণ পারি একা একা থাকি। যাউক ঐ সব কথা।'

একটু থামল নিত্য। খানিকটা পর খুব শান্ত গলায় শুরু করল, 'বাবা, আপনেরাও তো রোজ এইখানে আসেন।'

'হাঁ, আমাদের রোজই আসতে হয়।'

'তাই তো দেখি। আচ্ছা বাবা, একটা কথা জিগামু (জিজ্ঞাসা করব) ?'

'কী কথা ?'

'রোজই দেখি ঐ উনি—'

লা তে'কে দেখিয়ে নিত্য ঢালী বলল, 'জলে ডুব দিয়া দিয়া কি যেন তোলে। কী তোলে বাবা ?'

'সিপি (শেল)।'

'সিপি দিয়া কী হয় ?'

'ব্যবসা হয়। বিক্রী হয়।'

'ও।'

নিত্য ঢালী চুপ করে গেল।

পানিকর আর লা তে নিত্যর পাশে ঘন হয়ে বসল।

পানিকর বলল, 'আমার নাম পানিকর। আমি প্রোপ্রাইটার, মালেক। আর এই বর্মীটা হ'ল লা তে। ডাইভার। বুঝলে বুড্‌ঢা ?'

নিত্য ঢালী সামান্যই বুঝল। বেশিটা বুঝল না। লা তে এবং পানিকর নামধারী ছুটি আজব মানুষের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

পানিকর আবার বলল, 'তোমার নাম কী ?'

'নিত্য ঢালী।'

'তোমরা তো রিফুজী ?'

'হ বাবা।'

'তোমরাই তা হ'লে কলোনি বানাচ্ছ ?'

'হ বাবা।'

খানিকটা চুপচাপ।

এরিয়াল উপসাগর সমানে গর্জায়। বিরাট বিরাট ঢেউগুলো বিপুল আক্রোশে পারের ম্যানগ্রোভ বনে আছাড় খায়।

হঠাৎ এক সময় পানিকর বলে, 'আচ্ছা বুড্‌ঢা, তুমি কাম করবে ?'

বুঝতে না পেরে হাঁ করে চেয়ে থাকে নিত্য ঢালী।

পানিকর বোঝাতে থাকে, 'তামাম দিন এই পাথরটার ওপর তো চুপ চাপ বসেই থাক। তার চেয়ে কাম কর না, টাকা মিলবে। মজুরী মিলবে।'

'টাকা পামু ?'

নিত্য ঢালীর ঘোলাটে চোখ ছুটো চক চক করে।

'কাম করবে আর টাকা পাবে না!'

অদ্ভুত শব্দ করে পানিকর হাসে।

নিত্য ঢালী মনে মনে কি যেন ভাবে। বিড় বিড় করে কি যেন বকে।

বুঝি বা সে ভাবে, যতক্ষণ সেটেলমেণ্টে থাকবে ততক্ষণ কাপাসীর অবুঝ, তীব্র হাসি শুনতে হবে। কাপাসীর হাসি তাকে অস্থির, উন্মাদ করে তোলে। কাপাসীর মুখের দিকে তাকালে বিচিত্র এক যন্ত্রণা তাকে বিকল করে দেয়।

একরকম কাপাসীর ভয়েই এই নির্জন উপসাগরের পারে এসে চুপচাপ বসে থাকে নিত্য ঢালী। কিন্তু এখানে এসেও কি রেহাই মেলে! দামিনী বউ, কাপাসী, দেশভাগ, মাতানি নদীর পারে সেই ছোট সোনারঙ গ্রামটা, জমিজিরাত, সাত পুরুষের ভিটামাটি—হাজারটা চিন্তা হাজার দিক থেকে তার মাথায় নখ বেঁধায়। তাকে কাবু করে ফেলে।

এই চিন্তা, এই অসহ্য দুঃখ আর যন্ত্রণাকে কিছুক্ষণের জন্যও অন্তত ভুলে থাকতে চায় নিত্য ঢালী। কিন্তু কেমন করে?

নিত্য ঢালী ভাবল, পানিকরের কাজই সে করবে। কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে আর যাই হোক, কাপাসীর কথা কিছু সময়ের জন্য ভুলতে পারবে। হা ঈশ্বর, এই কাজটা যেন তার হয়। হা ঈশ্বর।

দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি রেখে নিত্য ঢালী ভাবছিল। এবার সে মুখ তুলল। বলল, 'কিন্তুক পানিকর বাবা, আমি কি আপনের কাম পারুম?'

'পারবে, পারবে। জরুর পারবে। লা তে তোমাকে সব শিখিয়ে দেবে।'

নিত্য ঢালীর সঙ্গে এ কথা সে কথা বলে এক সময় উঠে পড়ল দু জনে। লা তে আর পানিকর পাশাপাশি চলেছে।

একটা কাজ হাসিল হয়েছে, সেই খুশিতেই মশগুল হয়ে আছে পানিকর। এবারকার মরশুমে লা তে ছাড়া অন্য ডাইভার পায় নি সে। একজন মাত্র ডাইভারের ভরসায় মরশুম চালানো দুরূহ ব্যাপার। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ধানুককে ভাগিয়ে এনেছিল পানিকর। কিন্তু হাঙর আর কামটের ভয়ে ধানুক তো জলেই নামল না।

পানিকর ভাবছিল, নিত্য ঢালীকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে কিছুটা অন্তত কাজ চলবে। তা ছাড়া মাথায় অন্য একটা মতলব আছে। মতলবটার কথা ভাবতে ভাবতে উত্তেজিত হয়ে উঠল পানিকর।

উত্তেজিত হতে হতে ভাবল, নিত্য ঢালীর মারফত সে রিফুজী সেটলমেন্টে ঢুকবে।

পঁচিশ

দিন সাতেক পর পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ফিরে এল পাল সাহাব।

এরিয়াল উপসাগর থেকে জঙ্গল ফুঁড়ে সেটেলমেণ্টে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

পয়লাই নিজের ঝুপড়িতে গেল না পাল সাহাব। সবাইকে উদ্ধব বৈরাগীর ঝুপড়িতে ডেকে আনল।

চারপাশে চারটে মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছে উদ্ধব।

সবাই ভয়ে ভয়ে পাল সাহাবের মুখের দিকে তাকাল।

ফেল্ট হ্যাটটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে পাল সাহাব। কপাল আর ভুরু ঢাকা পড়েছে। মশাল থেকে যেটুকু আলো পাওয়া গিয়েছে, তাতে মুখের চামড়া পোড়া তামার মত দেখাচ্ছে। বাদামী চোখদুটো ধক ধক করছে।

ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাল সাহাব।

ভিড়ের মধ্য থেকে বুড়ী বাসিনী উঠে দাঁড়াল। বলল, 'কী হইল সাহেব বাবা, কিছু সুরাহা হইল?'

পাল সাহাব জবাব দিল না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি রইল।

বাসিনী আবার বলল, 'হাল বলদের কী হইব সাহেব বাবা?'

'কুছু না, কুছু না—'

দু হাতে মুখ ঢাকল পাল সাহাব। ভাঙা ভাঙা গলায় বলতে লাগল, 'তোদের জন্যে কুছু করতে পারলাম না। এত চেষ্টা করলাম। লেকিন—'

ফুসফুসটা খালি করে বড় একটা শ্বাস ফেলল পাল সাহাব। হতাশ গলায় বলল, 'লেকিন কিছুই হ'ল না।'

সামনের মানুষগুলো আঁতকে উঠল, 'হাল বলদ পাওয়া যাইব না সাহেব বাবা?'

মাথাটা ঝুলে পড়েছে। আস্তে আস্তে ডাইনে বাঁয়ে সেটা নেড়ে পাল সাহাব বলল, 'না। চীফ্ কমিশনার সাহাবকে এত বললাম! কিছুই হ'ল না! এক বরষের আগে বলদ কি ভইস আসার কোন উপায় নেই। ইণ্ডিয়া মুলুকের মেনল্যাণ্ড থেকে বলদ ভইস আসবে। লেকিন জাহাজই পাওয়া যাচ্ছে না। কী যে করব!'

যে মানুষের আশায় ভরসায় তারা বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে উপনিবেশ গড়ছে, যার প্রাণশক্তি হাজার অপচয় করেও ফুরায় না, সেই পাল সাহাবকে এমন হতাশ হতে এমন ভেঙে পড়তে আর কোনদিনই দেখে নি মানুষগুলো।

'সব্বনাশ! কী হইব?'

অনুচ্চ, ফ্যাসফ্যাসে গলায় কান্না জুড়ে দিল মানুষগুলো।

'হাল বলদ না পাইলে চাষ হইব ক্যামনে? কত আশা নিয়া এই দ্বীপি আসছি। মাটি পাইছি। কিন্তুক ভগমান বাদ সাধল। এইবার কী করুম? কোথায় যামু? ক্যামনে বাঁচুম? হা ঈশ্বর!'

জীবনে যখন কোন সমস্যা আসে, তার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস পর্যন্ত এই মানুষগুলো হারিয়ে ফেলেছে। দেশভাগ তাদের একেবারেই বিকল করে দিয়েছে। সমস্যাটা যখনই সামনে এসে পড়ে, তারা সহজ কোন উপায় খুঁজে পায় না। আর পায় না বলেই বিব্রত, বিমূঢ় মানুষগুলো সমস্বরে কান্না জুড়ে দেয়।

আজও তারা কাঁদছে।

হাল বলদ দিয়ে চষে পরল পরল মাটি তুলে ফেলতে না পারলে এই দ্বীপে ফসল ফলাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। অথচ পাল সাহাব বলছে, বছর খানেকের আগে বলদ কি ভইস মিলবে না।

এ রকম একটা সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে মানুষগুলো কাঁদা ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারে?

মানুষগুলো কাঁদছে।

অন্য দিন হ'লে পাল সাহাব খিস্তি করত, খেঁকিয়ে উঠত। কিন্তু আজ সে নিজেই হতাশ হয়ে পড়েছে।

বুড়ী বাসিনী এক কিনারে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে পাল সাহাবের কাছে এল। ডাকল, 'সাহেব বাবা—'

'হাঁ—'

অস্ফুট একটা শব্দ করল পাল সাহাব।

'আর কোন উপায়ই কী নাই? অন্য কুনো জায়গা থিকা হালের বলদ আনা যায় না?'

'যায়। লেকিন—'

'লেকিন কী সাহেব বাবা?'

'অনেক রুপেয়ার দরকার।'

একটু থামল পাল সাহাব। আবার শুরু করল, 'পুট বিলাস (পোর্ট ব্লেয়ার) থেকে আসার সময় এক বার লং আইল্যাণ্ড নেমেছিলাম। লং আইল্যাণ্ড থেকে রঙ্গত গেলাম। রঙ্গতে রিফুজী সেটেলমেণ্ট বসেছে। সেখানেই খোঁজ করলাম। হালের জন্যে যদি বলদ কি ভইস মেলে!'

'মিলল বাবা?'

আগ্রহে বুড়ী বাসিনীর মুখটা ঝকমক করে।

'মিলেছে। ওখানকার রিফুজীরা চোদ্দটা বলদ বেচতে চায়। লেকিন এক একটার দাম তিন শ রুপেয়া। চোদ্দটার দাম পুরা চার হাজার আউর দো শ' রুপেয়া। অত রুপেয়া কোথায় পাব?'

খানিকটা চুপচাপ।

মানুষগুলো কান্না থামিয়ে ঝিম মেরে বসে আছে।

হঠাৎ কি যেন মনে পড়ল পাল সাহাবের। সে বলল, 'একটা উপায় হতে পারে।'

'কী উপায় সাহেব বাবা ?'

'সব রুপেয়া এক সাথ না দিলেও চলবে। পয়লা দফে এক হাজার রুপেয়া দিতে হবে। তারপর মাহিনায় মাহিনায় (মাসে মাসে) টাকা দিতে হবে। ভাবছি ক্ষেতির সময় তোরা তো ক্যাশ ডোল পাবি। এক এক আদমীর ডোল থেকে মাহিনায় এক এক টাকা কেটে বলদের দাম দেব।'

'তাই ছ্যান, তাই ছ্যান—'

এতক্ষণ মানুষগুলো দম বন্ধ করে যেন বসে ছিল। এবার সুরাহার একটা উপায় খুঁজে পেয়ে চিল্লাচিল্লি শুরু করে দিল।

এতক্ষণে পাল সাহাবের গলায় ধমক ফুটেছে, 'চুপ, চুপ শালে লোগেরা। একদম হল্লাগুল্লা লাগিয়ে দিয়েছে ! আগে সব শোন্। পয়লা দফের হাজার রুপেয়ার কি হবে ?'

উৎসাহ চুপসে গিয়েছে। মানুষগুলো আগের মতই ঝিম মেরে গেল।

অনেকটা সময় কাটল।

প্রথম দিকে প্রবল উদ্যমে জ্বলে জ্বলে মশালগুলো এখন ঝিমিয়ে পড়েছে। ঠাণ্ডা, ঝিরঝিরে হাওয়া দিয়েছে।

হঠাৎ বাসিনী বলল, 'আপনেরা এট্টু খাড়ন (দাঁড়ান)। আমি আসতে আছি।'

বলতে বলতেই পুব দিকের টিলাটার দিকে ছুটল।

একটু পর হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল বুড়ী বাসিনী। বলল, 'এইটা ছ্যাখেন দেখি সাহেব বাবা—'

পুরানো গড়নের একটা সোনার বিছা হার পাল সাহাবের হাতে তুলে দিল সে। পাল সাহাব তাজ্জব বনে গিয়েছে। সে বলল, 'সোনার হার কোথায় পেলি রে বুড্‌টী ?'

'সে অনেক কথা সাহেব বাবা। ঐ হার আমার শাউড়ী আমার বিয়ার সময় দিছে। আমার শাউড়ী বিয়ার সময় তার শাউড়ীর কাছ থিকা পাইছিল। যাউক সে সব—'

একটু থামল বুড়ী বাসিনী। আবার উদাস গলায় শুরু করল, 'ছ্যাশখান দুই ভাগ হওয়ার পর কিছুই তো আনতে পারি নাই। খালি শ্বউর কুলের ঐ চিহ্নটুক ছাড়া। কত বিপদ আপদ গেছে, কতদিন না খাইয়া থাকছি। তবু ঐটুক সোনা বেচতে পারি নাই।'

আবার থামে বাসিনী। অল্প অল্প হাঁপায়। ঘোলা ঘোলা, আবছা আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'সাহেব বাবা, আমার তিনকুলে কেউ নাই। সোয়ামী না, পুত না, বাপ না, ভাই না, বান্ধব না। খালি ঐ রসিকই যা আছে। আমারে খুড়ী ডাকছে। ও ছাড়া আর কেউ নাই। নিজের বিপদ আপদের কথা ভাবি না। তিন কাল গেছে। কয়দিন আর বাঁচুম। তাই ভাবলাম, এই হারখান যদি সগলের কামে লাগে, উপকারে লাগে।'

একদৃষ্টে বাসিনীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে পাল সাহাব। কিছু একটা সে বলতে চাইল, কিন্তু পারল না। অদ্ভুত এক আবেগে তার গলাটা বুঁজে আছে।

একটু আগে মানুষগুলো শোর তুলে কাঁদছিল। কান্না থামিয়ে এখন তারা পাল সাহাবের মতই বাসিনীর দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখে যত আনন্দ তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময়।

সমস্যাটার যে এমন একটা আসান হয়ে যাবে, আগে ভাগে কেউ কি তা জানত ?

বাসিনী বলল, 'হারটার ওজন আছিল পনের ভরি। ঐটা বেচলে হাজার টাকা হইব না সাহেব বাবা ?'

'হবে হবে, জরুর হবে।'

এবার এক কাণ্ডই করে বসল পাল সাহাব। পাগলা দু হাতে

বুড়ী বাসিনীকে উপরে তুলে ধরল। তারপর কয়েক পাক ঘুরিয়ে বলল, 'তুই মানুষ না, এই সেটেলমেণ্টের সব শালে লোগের মা।'

পাক খেতে খেতে বুড়ী বাসিনী চেঁচাতে লাগল, 'ছাড়েন সাহেব বাবা, ছাড়েন। পড়লে নিঘ্‌ঘাত মরে যামু, মরে যামু।'

যতই চেঁচাক বাসিনী, পাল সাহাব তাকে ছাড়ে না।

ছাব্বিশ

উজানী বুড়ীর হয়েছে যত জ্বালা !

সেই যে সেদিন বিয়ের ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া হ'ল, তার পর থেকে হারাণ আর ঘরমুখী হয় না। সকাল-দুপুর-রাত, সারাটা দিনের মধ্যে একবার এসে উজানী বুড়ীর খোঁজও নেয় না। কোথায় কোথায় যে সে কাটায় !

পৃথিবীতে আপন বলতে কেউ নেই উজানী বুড়ীর। এক ঐ হারাণ। একটা মাত্র নাতি।

নাতির হাত ধরে বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে এসেছে উজানী বুড়ী। ঘর তুলেছে হারাণ। কিন্তু সেই ঘর শূন্য, খা খা।

হারাণই যদি ঘরে না থাকে, তবে সেই ঘর দিয়ে কি হবে ! সেই ঘরে একা একা কেমন করে দিন কাটায় উজানী বুড়ী !

এখন সকাল।

উঠানের এক কিনারে দুই হাঁটু আর এক মাথা জোড়া করে চুপচাপ বসে রয়েছে উজানী বুড়ী। আবছা, উদাস চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।

উজানী বুড়ীর চোখ দুটো ফোলা ফোলা, টকটকে লাল। বোঝা যায়, কয়েকদিন ধরে সে সমানে কাঁদছে।

পুব দিকের কুয়াশা ছিঁড়ে ছিঁড়ে সূর্য দেখা দিয়েছে। সূর্যটাকে এক পিণ্ড নরম, রক্তিম মাখনের মত দেখায়।

উঠানের আর এক কিনারে একটা ছোট প্যাডক গাছ। গাছটা

পাতার জিভ মেলে রোদের আসব শুষছে। মগডালে একটা হলদি-বনা পাখি আর তার পাখিনী বাসা বুনেছে।

পাখিটা নেই। পাখিনীটা চেঁচামেচি শুরু করেছে।

উজানী বুড়ী নানান কথা ভাবছিল।

নানান জনে নানান কথা তাকে বলে যাচ্ছে।

কাল রাত্রে কুমী এসেছিল। সে বলেছিল, 'বুঝলা মাউই, তোমার হারাণ রাক্ষসীর মায়ায় পড়ছে। ঐ যে হাসনী, ঢলানী কাপাসী—পাগল না ছাই, সে-ই তোমার নাতির মাথাখান খাইতে আছে। নাতিরে বান্ধো (বাঁধো), তার মন বান্ধো। না হইলে কেঁদে কূল পাইবা না মাউই।'

উজানী বুড়ী ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলেছিল, 'কেমনে তারে বান্ধুম (বাঁধব) কুমী? সে কি দুধের শিশু, যে হাতে পায়ে দড়ি দিয়া রাখুম!'

'বিয়া দাও, বিয়া দাও মাউই। তা হইলেই ঠিক হইয়া যাইব।'

'দিমু, তাই দিমু। কিন্তুক শয়তানটা যে ঘরেই আসে না। কী করি? হা ভগমান, হারাইণার (হারাণের) মতিগতি ভাল কইরা দাও।'

কেঁদে, চুল ছিঁড়ে, গড়াগড়ি খেয়ে নিজেকে অস্থির করে তুলেছিল উজানী বুড়ী।

উজানী বুড়ী হারাণের কথাই ভাবছিল।

কেমন করে তার মতিগতি ভাল হবে, তার মন কাপাসীর দিক থেকে ফিরবে, ভেবে ভেবে দিশা পাচ্ছিল না উজানী বুড়ী।

মেয়েমানুষের দেহই হ'ল সব। ধর্ম বল, কর্ম বল—দেহ ছাড়া মেয়েমানুষের আছে কী?

দেহই যদি নষ্ট হয়ে যায়, তা হ'লে বাকী থাকে কী? কিছুই না। মেয়েমানুষ তখন শুধুই ফক্কিকার।

কাপাসীর শরীর নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সে কোন কাজে আসবে? তাকে নিয়ে ধর্ম চলবে না, কর্ম চলবে না, সমাজ সংসার অচল হয়ে যাবে।

এই সোজা, সহজ কথাটা কেন বোঝে না হারাণ!

হলদিবনা পাখিনীটা বড় ক্যাচর ক্যাচর লাগিয়েছে। দু দণ্ড সুস্থির হয়ে বসে একটা কথা যে ভাববে, তার কি জো আছে!

হাঁটুর ফাঁক থেকে মাথা তুলল উজানী বুড়ী।

পাখিনীটা পাতার ভিতর দিয়ে নেচে নেচে বেড়ায়। আর ডাকে, 'চিকির-চিকির-চিক-চিক—'

উজানী বুড়ী বলে, 'মাগীর আহ্লাদ ছাখ। আমি মরি আমার জ্বালায়। আমি জ্বলি আমার দুঃখুতে। যা যা, এইখান থিকা যা। চোখের আবডালে যা।'

পাখিনীটা ডাকে, 'চিকির-চিকির-চিক-চিক—'

'পুরী আমার শূন্য, বুক খা খা করে। ঘরে আমার কেউ নাই। আর তোরা, যত রাজ্যের পাখপাখালি আপদ এসে জুটছিস। যা যা—হুস্—'

পাখিনী যায় না। ঘাড়টা বাঁকিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর ডেকে ওঠে, 'চিকির-চিকির-চিক-চিক—'

'তোর কি, তোর পরানে কত সোহাগ, কত আহ্লাদ। উজানী বুড়ী হইয়া পিরথিমীতে জন্ম নিতি, তা হইলে বুঝতি। এইবার থাম —থাম লো মাগী। হারাণ নাই, তোদের নিয়া আমি কী করুম? পারলে তারে এনে দে।'

পাখিনীটা কি বুঝল, সে-ই জানে। আগের মতই নাচল, লাফাল, ডাকল, 'চিকির-চিকির-চিক-চিক—'

অনেকক্ষণ পাখিনীটার সঙ্গে ঝগড়া করল উজানী বুড়ী।

একসময় পুরুষ পাখিটা ফিরে এল। খুব একচোট চেঁচামেচি করে তাকে নিয়ে বাসায় ঢুকল পাখিনীটা।

একটু থিতিয়ে নিয়ে আবার হারাণের ভাবনা শুরু করল উজানী বুড়ী।

না, এই শেষ বয়সে হারাণ বুঝি তাকে আর জুড়োতেই দেবে না।

এই তো দেশভাগ হ'ল। দেশভাগের পর ন' দশটা বছর ক্যাম্পে ক্যাম্পে, স্টেশনের প্ল্যাটফরমে কি ভাবে যে কেটেছে! দিন কেটেছে তো রাত কাটে নি। রাত যদি বা ফুরিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত, অফুরন্ত দুঃখের দিন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

দুঃখ, দুঃখ। দুঃখের যেন শেষ নেই, পার নেই, কূল নেই। সুখ, শান্তি, সোহাগ, আহ্লাদ বলে পৃথিবীতে আরো কিছু কিছু যে বস্তু আছে, সে সবের স্বাদ একেবারেই ভুলে গিয়েছিল উজানী বুড়ী।

অনেক দুঃখ, অশেষ যন্ত্রণা পার হয়ে একদিন এই দ্বীপে এসেছিল তারা। পায়ের নীচে মাটি পেয়ে উজানী বুড়ী স্বপ্ন দেখেছিল। হারাণের বউ আসবে। নাতির বউকে নিয়ে জীবনের শেষ সাধটা সে মিটিয়ে নেবে।

কিন্তু সবই কপাল! সবই অদৃষ্ট!

জীবনে কোন সাধই মিটল না উজানী বুড়ীর। সতের বছর বয়সে যখন তার ভরা যৌবন, তখন সোয়ামী মরল। রাঢ়ী হ'ল সে। তারপরে একে একে সবাইকে খেল। পুতকে খেল, পুতের বউকে খেল।

আপন বলতে একটা মাত্র নাতি।

উজানী বুড়ী শোকাতাপা মানুষ। কোথায় তাকে একটু শান্তি দেবে হারাণ, তা না, নিত্য ঢালীর নষ্ট, পাগল মেয়েটাকে বিয়ে করতে চায়!

উজানী বুড়ী বিড় বিড় করে বকতে লাগল, 'কিন্তুক সোনা, তুমি যা ভাবছ, তা হইব না। আমি যদ্দিন বেঁচে আছি, তদ্দিন আমার মতেই চলতে হইব।'

একটু থামল। আবার শুরু করল, 'বজ্জাতের ছাও, সাত দিন তুই ঘরে ফিরিস না। মরতে মরতে সারা গেরাম তোরে খুঁজছি, কিন্তুক পাই নাই। তুই যে কোথায় থাকিস, সগল আমি জানি। আমি আজ সেইখানেই যামু।'

সাতটা দিন ধরে সমানে হারাণকে খুঁজছে উজানী বুড়ী। কিন্তু বজ্জাতটা যে কোথায় রয়েছে, কে জানে?

উজানী বুড়ীর কি সেই দিন আছে। সেই গতরও কি আছে। না গতরে সেই সামর্থ্য আছে।

এ কি পদ্মা-মেঘনা পারের সেই সমতলের দেশ। এ হ'ল আন্দামান দ্বীপ। চড়াই-উতরাই, টিলা-জঙ্গল। যতদূর যে দিকে তাকানো যায় শুধু পাহাড়ের ঢেউ।

একটু টিলা বাইতেই হাঁপ ধরে যায় উজানী বুড়ীর।

একে বয়স হয়েছে। তার উপর বাতের ব্যথা, শূলের ব্যথা, বায়ুর দোষ। হাজার জাতের ব্যারাম উজানী বুড়ীর জীর্ণ, কুঁজো, অস্থিসার শরীরে বাসা বেঁধেছে।

এই ক'দিন হারাণকে খুঁজতে বেরিয়ে একটু পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসেছে উজানী বুড়ী। তাকে না পেয়ে হতাশায়, দুঃখে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়েছে।

কাঁদতে কাঁদতে নিজের উপর, হারাণের উপর, চোখের সামনে যে পড়েছে, তার উপর ক্ষেপে উঠেছে উজানী বুড়ী। মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে সে কেঁদেছে আর বলেছে, 'হারাণ রে, এই বয়সে বড় দুঃখু দিলি। তোর মুখের দিকে তাকাইয়া বুক বাঁধছি। সেই বুকখান আমার ভেঙ্গে দিলি রে—'

হারাণের কথা ভাবতে ভাবতে উঠে পড়ল উজানী বুড়ী।

হারাণ যে কোথায় আছে, কাল রাত্রে কুমী সে খবর দিয়ে গিয়েছে। উজানী বুড়ী ঠিক করে ফেলল, যেমন করে পারুক হারাণকে সে আজ ধরবেই

সাতাশ

অনেক, অজস্র মানুষ।

শুধু মানুষ হিসাবেই তাদের পরিচয় না। তাদের মধ্যে ছোট ছোট অসংখ্য ভাগ আছে, ভেদ আছে, সীমারেখা আছে। পেশা বা বৃত্তি অনুযায়ী জাতও তৈরী হয়েছে। কেউ জেলে, কেউ জোলা, কেউ মালো, কেউ যুগী, কেউ সোনারু, কেউ বারুজীবী, কেউ বা ভূমিজীবী।

দেশভাগ সব ভাগ, সব ভেদ, সব সীমারেখা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। এদের একটা মাত্র পরিচয় হয়েছিল। কেউ আর জেলে, যুগী কি সোনারু না। এমন কি মানুষও না।

তখন তারা উদ্বাস্তু, সরকারী ভাষ্যে রিফুজী।

এতদিন তাদের জাত ছিল না। রিফুজী ক্যাম্পে, স্টেশনের প্ল্যাটফরমে কি খোলা আকাশের নীচে মানুষগুলো এক, অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে আবার তারা মাটি পেয়েছে। ঘর পেয়েছে। সংসার পেয়েছে।

পায়ের নীচে মাটি পেয়ে, মাথার উপর ছাউনি পেয়ে, সংসার পেয়ে আবার তারা সমাজ গড়ে তুলেছে।

মাটি আর ঘর, সমাজ আর সংসারই শুধু নয়, দেশভাগের পর যে জাত তারা হারিয়ে ফেলেছিল, যে ভাগ, যে ভেদ এবং যে সীমারেখা-গুলো ভেঙে গিয়েছিল, সে সব আবার ফিরে পেয়েছে।

উত্তর আন্দামানের এই বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ দ্বীপে মানুষ এসেছে। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে জাত এসেছে। জাতের সঙ্গে তার বিচার এসেছে। বাছাবাছি, মানামানি, সব এসে পড়েছে।

পদ্মা-মেঘনাপারের যে জীবন, পুরাপুরি, হুবহু তা এই দ্বীপে এসে গেল।

আজ বেরুতে একটু দেরী করে ফেলেছে নিত্য ঢালী।

লা তে তাকে সিপি তোলার কায়দা কানুন শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে।

উপসাগরে ডুব দিয়ে দিয়ে সিপি তুলতে হয়। কোনটা কোন জাতের সিপি, কোনটার নাম টার্বো, কোনটার নাম নটিলাস, কোন-টার নাম সান ডায়াল, কোনটা ফ্রগ শেল—সব, সব চিনে ফেলেছে নিত্য ঢালী। লা তে'ই তাকে চিনিয়ে দিয়েছে।

জলের সঙ্গে যুঝে যুঝে সিপি কুড়োতে হয়। সিপি তোলার অভ্যাস না থাক, জলের সঙ্গে যোঝার অভ্যাস আছে নিত্য ঢালীর। সে জল-বাঙলার—সেই পদ্মা-মেঘনাপারের মানুষ।

নতুন কাজে প্রচুর উৎসাহ পাচ্ছে নিত্য ঢালী। ভোর হতে না হতে সে এরিয়াল উপসাগরে চলে যায়। সারা দিন সিপি তুলে সেটেলমেণ্টে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়।

এ কাজে ভয় যে নেই, তা নয়। হাঙর-কামট-রেমোরা মাছ আছে। অক্টোপাস আছে। যে কোন মুহূর্তে চোরা ঘূর্ণির ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা আছে। তবু উৎসাহ পাচ্ছে নিত্য ঢালী। তার প্রথম কারণ, কিছুক্ষণের জন্য হ'লেও কাপাসীর কথা, জীবনের হাজারটা চিন্তার কথা সে ভুলে থাকতে পারে। আরো একটা কারণ আছে। রোজ কাজের শেষে তিন টাকা হিসাবে মজুরী দেয় পানিকর।

কাজের কথা পাল সাহাবকে বলেছে নিত্য ঢালী। সে যে একটা কিছু নিয়ে আছে, হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে দু পয়সা রোজগার করছে, এতেই পাল সাহাব খুব খুশি।

তার পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে পাল সাহাব বলেছিল, 'সাবাস, শালে নিত্য। এই তো আমি চাই।'

আজ অনেকটা দেরী হয়ে গিয়েছে।

জঙ্গলের মাথায় আর কুয়াশা নেই। পুব দিকের আকাশ থেকে ঝকঝকে রোদের ঢল এসে পড়েছে। সাগরপাখিরা সমুদ্রে চলে গিয়েছে।

চড়াই-উতরাই বেয়ে, জঙ্গল ফুঁড়ে অন্তত মাইল ছয়েক যেতে পারলে এরিয়াল উপসাগরে পৌঁছান যাবে। পৌঁছতে পৌঁছতে দুপুর হয়ে যাবে।

রোদের চেহারা দেখে অস্থির হয়ে উঠল নিত্য ঢালী।

ঘর থেকে বাইরে পা দিয়েই চমকে উঠল সে।

হারাণের ঠাকুরমা উজানী বুড়ী টিলা বেয়ে উপরে উঠে আসছে। ঘরটার সামনে এসে খুব একচোট হাঁপাল সে। বড় বড় শ্বাস টানতে লাগল।

পাটের ফেঁসোর মত রুক্ষ, আঠা আঠা চুল উড়ছে। ঘোলাটে চোখ দুটো জ্বলছে। বুক থেকে কাপড় খসে পড়েছে। দেখেই বোঝা যায়, উজানী বুড়ী ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে এসেছে।

উজানী বুড়ী বলল, 'এই যে ঢালীর পুত—'

'কী কও মাসি?'

নিত্য ঢালী উজানী বুড়ীকে মাসি ডাকে। ডাকেরই মাসি সে। এমনি কোন সুবাদ নেই। দু জনের জাত গোত্র ভিন্ন। এক জায়গায় থাকতে হলে যেটুকু সম্পর্ক পাতিয়ে নিতে হয়, তার চেয়ে বেশি কিছু না।

নিত্য ঢালী আবার বলল, 'কী কও মাসি ?'

উজানী বুড়ী ক্ষেপে উঠল, 'মাসি! আমি তোর কুন জন্মের মাসি রে শয়তানের ছাও!'

মাথা ঠাণ্ডা রেখে নিত্য ঢালী বলে, 'সকালে উঠে কি কাজিয়ার মন নিয়া আসছ মাসি ?'

'হ, তাই রে ঢালীর ছাও। যদি এক বাপের পুত হইস, তা হইলে সত্য ক'বি (বলবি)।'

মেজাজ কতক্ষণ আর ঠিক রাখা যায়। নিত্য ঢালীও তেতে উঠল, 'দেখ বুড়ী, আর যাই কর, বাপ তুইলো (তুলো) না। ভাল হইব না কইলাম।'

'বাপ তুলুম, জাত তুলুম, তোর চোদ্দ গুষ্টি তুলুম। কী করবি ? কী করবি ? আমার মাথা কাটবি ?'

'চুপ মার বুড়ী—'

নিত্য ঢালী রুখে উঠল, 'না হইলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন। সকাল বেলা ভগমানের নাম করব, না মাগী আসছে আমার লগে (সঙ্গে) কাজিয়া মারতে! যা যা, চোখের সুমুখ থিকা যা—'

'যামু যামু—'

হঠাৎ ডুকরে উঠল উজানী বুড়ী, 'যামু, সত্যই যামু। হারাণেরে বাইর কইরা দে। তারে নিয়া আমি অখনই চলে যামু।'

'হারাণ!'

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিত্য ঢালী।

'হ-হ, হারাণ—আমার নাতি। সাত দিন সে ঘরে ফিরে না। সাত দিন তারে দেখি না। দে নিত্যা, তারে বাইর কইরা দে।'

'কী কও তুমি মাসি! হারাণ তো এইখানে আসে নাই।'

'মিছা কইস না নিত্য। এই দ্বীপির সগলে জানে, হারাণ তোর ঘরে আছে। সগলে জানে।'

নিত্য ঢালীর একটা হাত ধরল উজানী বুড়ী। তার বুকে কপাল ঠুকতে ঠুকতে বলতে লাগল, 'তোর ভাল হইব নিত্য, হারাণরে তুই ফিরাইয়া দে। ভগমান তোর ভাল করব।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হইয়া গেল মাসি! কে তোমারে লাগাইছে, তুমিই জান। ভগমানের কিরে (দিব্যি) কেটে কই, হারাণরে আমি এক মাসের মধ্যে দেখি নাই।'

একটু থেমে নিত্য ঢালী বলল, 'আমি কামে যামু, এইবার তুমি ঘরে যাও মাসি।'

নিত্য ঢালীর হাতটা ধরে ছিল উজানী বুড়ী। হঠাৎ সেটা ছেড়ে সে ফুঁসে উঠল, 'ঢালীর পুত তোর মনে কি আছে, আমি জানি। কিন্তুক তুই যা ভাবছিস, তা হইব না।'

নিত্য ঢালী তাজ্জব হয়ে গিয়েছে। আস্তে আস্তে সে বলল, 'আমি মরি আমার ধান্দায়, আমার জ্বালায়। আমার কি এক জ্বালা, এক ধান্দা! যাউক সেই কথা। মনটা খোলসা করে কও দেখি, তোমার মনে কি আছে?'

'আমার মনে যা আছে, কমু। কিন্তুক তুই যদি সত্য না কইস তো তোর মেয়ের মাথা খাবি।'

শান্ত গলায় নিত্য ঢালী বলল, 'খামু। এইবারে কও।'

'তোর মেয়ের লগে হারাণের বিয়া দিতে চাইস না?'

'কী কও তুমি?'

'আমি একা কমু ক্যান? পিরথিমীর সগলে কয়, এই দ্বীপির সগলে কয়। তোর মতলব জানতে কারো বাকি নাই।'

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে নিত্য ঢালী। তারপর বলে, 'যদি হারাণের লগে কাপাসীর বিয়া দিই, ক্ষেতিটা কি হয়!'

'হা ভগমান, তুমি অখনও আছ। অখনও আকাশে চন্দর সুরুয আছে। ভগমান, পোড়া কপাইলার মাথায় ঠাটা (বাজ) ফেল।'

কেঁদে, ককিয়ে, চিল্লিয়ে অস্থির হয়ে উঠল উজানী বুড়ী, 'নিত্যা,

তুই কি ভুইলা (ভুলে) গেলি, তোরা ঢালীর জাত। নীচা জাত। আমরা কাপালীর জাত, যে সে কাপালী না, শিউলি কাপালী। পাগলচাঁদ আমাগোর (আমাদের) গুরু। আমরা উচা (উঁচু) জাত। তোদের লগে কি আমাগোর বিয়া হয়, না হইতে পারে! তা ছাড়া—'

উজানী বুড়ীর কথা শেষ হবার আগেই ঘরের ভিতর থেকে সেই তীব্র, অবুঝ হাসির শব্দটা এল। কাপাসী হাসছে। হাসি তার থামে না, একটু একটু করে মাততেই থাকে।

কাপাসীর হাসির মধ্যেই উজানী বুড়ী চেঁচিয়ে উঠল, 'একে নীচা জাত, তার উপুর ঐ পাগল লষ্ট মেয়ে—'

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল নিত্য ঢালী, 'বাইর হ, অখনই বাইর হ। না হইলে তোরে খুন করুম।'

নিত্য চেঁচায় আর হাঁপায়। হাঁপায় আর বলে, 'বাপ তুললি, কিছু কইলাম না। গুষ্টি তুললি, চোদ্দ পুরুষ তুললি, তবু মুখখান বুঁজে রইলাম। জাত গোত ধোয়ালি, তাও সইলাম। কিন্তুক আর না। মেয়ের নামে একটা মোন্দ কথা কইলে তোর দাঁত আমি ছুটাইয়া দিমু। যা যা, বাইর হ মাগী—'

নিত্য ঢালীর মারমুখী চেহারা দেখে এক পা এক পা করে পিছু হটে উজানী বুড়ী। একটা কথাও আর বলে না। পিছু হটে হটে টিলা বেয়ে সে নামতে থাকে।

মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে।

উঠানের এক কিনারে মাথায় হাত দিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে নিত্য ঢালী। বেলার মনে বেলা বাড়ে। রোদের তাপ বাড়তে থাকে। নোনাজলের মাঝখানে এই মিঠে মাটির দ্বীপ তেতে ওঠে।

চুপচাপ বসেই থাকে নিত্য ঢালী।

আজ আর তার এরিয়াল উপসাগরে যাওয়া হয় না।

আঠাশ

বুড়ী বাসিনীর হারটা বেচে এগার শ টাকা পেয়েছিল পাল সাহাব। সেই টাকা দিয়ে পয়লা কিস্তির দাম মিটিয়ে মিডল্ আন্দামানের রিফুজী সেটেলমেণ্ট থেকে চোদ্দটা বলদ নিয়ে এসেছে সে।

চোদ্দ বলদে সাতটা হাল নেমেছে।

দিন রাত জমি চষা চলছে।

সাতটা মাত্র হাল। সাতটা হালে কি আর এত জনের জমি চষা যায়! তাই পাল সাহাবের ব্যবস্থা অনুযায়ী দিন এবং রাত মাটি চষার কাজ চলছে।

দিনের আলোতে হাল চালাবার অসুবিধা নেই। রাত্রিতে মশাল জ্বালিয়ে কাজ চলছে।

চারপাশে নোনা জল, মাঝখানে মিঠে মাটি।

লাঙলের ফলায় ফলায় সেই মাটি উথল পাথল হয়ে যাচ্ছে; পরল পরল উঠে যাচ্ছে।

পাল সাহাব ঠিক করে ফেলেছে, নতুন বর্ষা নামার আগেই এই দ্বীপকে সে পুরাপুরি চৌরস করে ফেলবে।

সেটেলমেণ্টের একটি মানুষেরও জিরান নেই, বিশ্রাম নেই। খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া তারা জমিতেই কাটাচ্ছে।

পাল সাহাব নিজের ঝুপড়িতেই ফেরে না। দু বেলা মা-তিন তার জন্য ভাত নিয়ে আসে জমিতে।

জমি চষার মধ্যেই ঘুরতে ঘুরতে একদিন খিলাফৎ খান রিফুজী সেটেলমেণ্টে এল।

জঙ্গল সাফ হয়ে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। টিলায় টিলায় বেত পাতার চাল মাথায় নিয়ে ঘর উঠেছে। দ্বীপের কি হাল ছিল! আর এই নতুন মানুষগুলো এসে কি হালই না করেছে!

সরাসরি জমিতে এসেই উঠল খিলাফৎ। হাতের সামনে পাল সাহাবকে পেয়ে চিৎকার করে উঠল, 'এ শালে পাল সাহাব—'

'আরে আও আও খিলাফৎ দোস্ত—'

লম্বা, রোমশ একটা হাত বাড়িয়ে খিলাফৎকে টেনে নিল পাল সাহাব। বলল, 'তার পর, কী মনে করে ইয়ার?'

'নিজের আঁখে সব কুছ সচমুচ দেখতে এলাম।'

লাল লাল, নোংরা দু পাটি দাঁত মেলে খুব একচোট হাসল পাল সাহাব। বলল, 'ক্যায়সা দেখলে?'

'বহুত খারাপ।'

একটু থামল খিলাফৎ খান। আবার শুরু করল, 'এই জঙ্গল বহুত বদনসীব।'

'কেন?'

'আরে হারামী, তা না হ'লে কি তোর হাতে পড়ত! এত রোজ জঙ্গলে কাম করলি, তবু জঙ্গলকে ভালবাসতে পারলি না। জঙ্গলের সাথ উলফতি মহব্বতি, কিছুই হ'ল না। জঙ্গলের এ কী হাল করেছিস, পাল সাহাব!'

খিলাফৎ পাঠানের গলায় দুঃখ, আক্ষেপ এবং বেদনা মেশা অদ্ভুত এক স্বর ফোটে।

'কী হাল করেছি?'

'জঙ্গলের জান তুড়েছিস। কেটে কুটে তাকে লবেজান করে ফেলেছিস।'

'ভালই তো হয়েছে।'

পাল সাহাব হাসল। বলল, 'এখানে গাঁও বসছে, ক্ষেতিবাড়ি হচ্ছে, খামার হচ্ছে, কুঠিবাড়ি উঠছে। মানুষ এসেছে।'

'আ রে থাম থাম। মানুষ হ'ল পুরা দুশমন, পুরা হারামী। না, তোরা আমাকে এখানে আর টিকতে দিবি না। উত্তরে, সেই ল্যাণ্ডফল জাজিরাতে (দ্বীপে) চলে যাব। জরুর যাব। সেখানে বিলকুল জঙ্গল আর জঙ্গল। মানুষ কোন দিন সেখানে যেতে পারবে না।'

এর পর থেকে প্রায়ই আসতে লাগল খিলাফৎ খান। পাল সাহাবের সঙ্গে গল্প করে। নতুন বাসিন্দাদের অনেকের সঙ্গেই তার আলাপ হয়েছে। তাদের সঙ্গে গল্প করে। গল্প আর কি ? শুধু জঙ্গলের কথা। উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য আন্দামান, হ্যাভলক দ্বীপ, সেন্টিনেল দ্বীপ—আন্দামানের দ্বীপমালা জুড়ে যে অরণ্য মাথা তুলে আছে, তার কথা বলে।

প্যাডক, পাপিতা, চুগলুম, দিদু—এক এক কিসিমের গাছের নাকি এক এক কিসিমের মেজাজ। জঙ্গলে ঢুকলে গাছেরা নাকি তার সঙ্গে কথা কয়। জঙ্গলের সঙ্গে তার অনেক দিনের দোস্তি মহব্বতি। এই জঙ্গল তাকে মানুষের দুশমনি বেইমানির হাত থেকে বাঁচিয়েছে। তাকে শান্তি দিয়েছে, স্বস্তি দিয়েছে। এমন একটা সময় এসেছিল, যখন বার বার দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে মরতে চেয়েছে খিলাফৎ। বার বার গলায় রশি দিতে চেয়েছে। কিন্তু আন্দামানের জঙ্গল তাকে আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়েছে।

এমনি সব আজব আজব কথা বলে খিলাফৎ খান।

খিলাফৎ খান ফরেস্ট গার্ড।

কত কাল যে আন্দামানের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সঠিক হিসাব কি সে নিজেই জানে ?

জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরে, নানা জাতের গাছ ছাখে আর নিজের দিকে তাকায় খিলাফৎ খান। গায়ের খসখসে কোঁচকানো চামড়া যেন গাছের ছাল। লোমগুলি যেন গাছের শ্যাওলা। হাত-পা যেন ডালপালা। মাথার চুল যেন গাছের রাশি রাশি পাতা। গায়ে সোঁদা সোঁদা বনজ গন্ধ।

খিলাফৎ খান যেন নিজেই একটা গাছ। জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে সে গাছ হয়ে গিয়েছে।

খিলাফতের যা মনের গঠন, তাতে নিজের সঙ্গে গাছের উপমা দেবার মত সূক্ষ্মতা নেই। কিন্তু অনেক কাল জঙ্গলে কাটিয়ে সহজ এবং স্বাভাবিক নিয়মেই এই উপমাটা তার মনে এসেছে।

জঙ্গল তাকে বাঁচিয়েছে।

খিলাফতের জীবনে এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই।

মানুষের উপর বিশ্বাস, প্রেম, ভালবাসা হারিয়ে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে কয়েদ খাটতে এসেছিল খিলাফৎ।

পাল সাহাব যে সালে আন্দামান আসে, তারও দশ পনের সাল আগে খিলাফৎ খান এখানে এসেছিল। সে সময় সেলুলার জেল তৈরির কাজ চলছে। ভাইপার দ্বীপের কয়েদখানায় ছু মাস বিশ রোজ কয়েদ খেটে জঙ্গলে কুলী খাটতে যায় সে। তার পর পঞ্চাশ না ষাট বছর পার হ'ল, অত হিসাব খিলাফৎ রাখে না।

অনেক হিসাব গোলমাল হয়ে গিয়েছে। স্মৃতি থেকে অনেক কথা অনেক ঘটনা হারিয়ে গিয়েছে। কত কিছু যে আবছা, ঝাপসা হয়ে গিয়েছে! তবু আজও অবিকল সেই ঘটনাটার কথা মনে করতে পারে খিলাফৎ।

চাচাতো ভাই হায়দার যেদিন তাকে মিথ্যা খুনের মামলায় ফাঁসিয়ে তামাম জিন্দগীর সাজা খাটাতে আন্দামান পাঠাল, সেদিন বিস্ময়ে, দুঃখে, যন্ত্রণায় বোবা হয়ে গিয়েছিল খিলাফৎ। আল্লাহ্‌র কাছে, দিনছুনিয়ার মালেকের কাছে সে শুধু কেঁদেছিল,

'খুদা, তুমি তো জান, আমি সাচ্চা মানুষ, একদম বেকসুর, বেগুণাহ্—'

তখনও মানুষের উপর কিছু কিছু বিশ্বাস ছিল খিলাফতের। আশা ছিল, সাজার মেয়াদ ফুরালে সে এক রোজ মুলুকে ফিরবে। মুলুকে তার শাদি করা বিবি আছে। বিবির কাছে ফিরে যাবে সে। চোদ্দ বছর পর বিবিকে ফিরে পাবে—এই বিশ্বাসের জোরে মুখ বুঁজে দ্বীপান্তরী সাজা খেটে গিয়েছে খিলাফৎ।

কিন্তু সব বিশ্বাস একদিন হারিয়ে ফেলল খিলাফৎ। মানুষকে সে অবিশ্বাস করতে, ঘৃণা করতে শিখল।

দক্ষিণ আন্দামানের গারাচারামাতে তখন জঙ্গল 'ফেলিং' অর্থাৎ বনকাটা চলছে। জঙ্গলে কুলীর কাজ করত খিলাফৎ।

মুলুক থেকে হঠাৎ চিঠি এল, তার বিবি সেই চাচাতো ভাইকে নিকাহ্ করেছে। খবরটা পেয়ে উন্মাদের মত হয়ে উঠল খিলাফৎ খান। বার তিনেক দরিয়ায় লাফ দিল। তিন বারই ফরেস্টের কুলীরা তাকে তুলে আনল। বার দুই গলায় রশি দেবার সব বন্দোবস্ত করে ফেলল। দু বারই ফরেস্টের জবাবদাররা তাকে ধরে ফেলল।

এ সবের পর থেকে তাকে পাহারা দিয়ে রাখা হ'ত। মরে যে খিলাফৎ বাঁচবে, তার কোন উপায়ই রইল না।

দিনের পর দিন যেতে লাগল।

ঋতুর চাকায় মাস, বছর, সময় পাক খেয়ে ফিরতে লাগল।

জঙ্গলে জঙ্গলেই তার কাটে। জঙ্গলের ঠাণ্ডা, হিম হিম ছায়া একটু একটু করে খিলাফতের সব জ্বালা, সব যন্ত্রণা জুড়িয়ে দিতে লাগল।

মানুষের সঙ্গ ছেড়ে জঙ্গলের গভীরে নেমে গেল সে। জঙ্গল তাকে আশ্রয় দিল, নিরন্ত স্নেহে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

মানুষের কাছ থেকে অনেক, অনেক দূরে সরে গিয়ে জঙ্গলের গভীর, নিবিড় স্বাদ একটু একটু যেন বুঝতে পারল খিলাফৎ।

তার মনের একদিকে মানুষের প্রতি অবিশ্বাস আর ঘৃণা। আর এক দিকে জঙ্গলের জন্য অপার মমতা ; অশেষ, অফুরন্ত, ভালবাসা।

জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন খিলাফৎ দেখতে পেল, তার গায়ের চামড়া গাছের ছালের মত খসখসে, মাথাটা গাছের ঝুপসি পাতার মত, হাত-পা ডালপালার মত।

খিলাফৎ দেখল, পঞ্চাশ ষাট বছর আন্দামানের জঙ্গলে কাটিয়ে পাপিতা, চুগলুম কি দিদু গাছের মত সে-ও একটা গাছ হয়ে গিয়েছে।

আজকাল প্রায় রোজই ডিগলিপুরের সেটেলমেণ্টে আসে খিলাফৎ। রোজই বলে, 'এই ডিগলিপুরে আর থাকব না। উত্তরে, বিলকুল উত্তরে ল্যাণ্ডফল জাজিরাতে, যেখানে স্রিফ জঙ্গল আর জঙ্গল, সেইখানেই চলে যাব। কোন আদমীর সেখানে আর যেতে হবে না।'

নতুন বাসিন্দাদের কেউ কিছু বলে না। অবাক হয়ে আন্দামানের এই আজব মানুষটার কথা শোনে। কিছু বোঝে, কিছু বোঝে না।

একদিন দুপুরের দিকে ধুঁকতে ধুঁকতে এল খিলাফৎ।

অনেক বয়স হয়েছে। মেরুদাঁড়াটা দুটো খাঁজ খেয়ে বেঁকে গিয়েছে। চোখদুটো টকটকে লাল। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। একটু চলে, আবার থামে। হাঁপায়, কাশে। তারপর দম নিয়ে টলতে টলতে এগোয়।

খিলাফৎকে দেখে এই কথাটাই মনে হয়, একটা জীর্ণ, বয়স্ক, প্রাচীন গাছ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্তে পৌঁছেছে।

পাল সাহাব দৌড়ে এল।

জমিতে লাঙল চলছিল। লাঙল ফেলে সবাই পাল সাহাবের পিছু পিছু ছুটল।

টলতে টলতে টক্কর খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল খিলাফৎ। দু হাত বাড়িয়ে তাকে জাপটে ধরল পাল সাহাব। আর ধরেই চমকে উঠল। খিলাফতের গা অসহ্য গরম। খুব সম্ভব জ্বরই হয়েছে।

পাল সাহাব বলল, 'এ কি, মালুম হচ্ছে তোমার বুখার!'

'হাঁ।'

ঘাড়টা ভেঙে পড়েছে। পাল সাহাবের কাঁধে মাথা রেখে নির্জীব গলায় খিলাফৎ বলল, 'বুখারই মালুম হচ্ছে।'

'বুখার নিয়ে তোমার আসা ঠিক হয় নি খান সাহাব। চল, শোবে চল। থোড়া আরাম করে 'বীটে' ফিরবে।'

ঘোর ঘোর, রক্তাভ চোখ দুটো একবার মেলল খিলাফৎ। তার পরেই বুঁজে ফেলল। কিছু বলল না।

আস্তে আস্তে খিলাফৎকে হাঁটিয়ে সামনের একটা টিলার দিকে এগুতে লাগল পাল সাহাব। মানুষগুলো পিছু পিছু আসছিল। এক ধমক মেরে তাদের আবার জমিতে পাঠিয়ে দিল, 'শালে কুত্তার পাল, আপনা কামে যা—'

খিলাফতের বুক থেকে ঘড়ঘড়ে, হাঁপানির মত একটা শব্দ আসছে।

পাল সাহাব বলল, 'তখলিফ হচ্ছে?'

'হাঁ। বুকটা ফেটে চুর চুর হয়ে যাবে রে পাল সাহাব। আর হাঁটতে পারছি না। বড় কষ্ট হচ্ছে।'

গলা বেয়ে গোঙানির মত একটা আওয়াজ বেরুতে লাগল খিলাফতের।

পাল সাহাব খুব নরম সুরে বলল, 'আর একটু খান সাহাব, থোড়া দূর। এই এসে গেলাম—'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে?'

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল পাল সাহাব। তার চোখ দুটো হঠাৎ খুশিতে চিক চিক করে উঠল। গাঢ় গলায় বলল, 'যেখানে

নিয়ে গেলে মানুষের ওপর বিশোয়াস (বিশ্বাস) ফিরে পাবে, দিলের তাপ পাবে, যো কুছ হারিয়ে ফেলেছ, সব, সব ফিরে পাবে। সেইখানেই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি খান সাহাব।'

খিলাফৎ জবাব দিল না।

উনত্রিশ

সেটেলমেণ্টের শেষ মাথায় রামকেশবের ঘর।

রামকেশব নোয়াখালি জেলার মানুষ। জাতে তেলী।

তা দেশ গ্রাম, ভিটামাটি কি আর আছে? দেশভাগের ফলে সব গিয়েছে। এই দ্বীপের আর দশজনের মত সেও রিফুজী।

সাত পুরুষের ভিটামাটি হারাবার শোক রামকেশবের প্রাণে কতটুকু বেজেছে, উপর থেকে দেখে বুঝবার জো নেই।

কথা রামকেশব খুব কমই বলে। সাতটা প্রশ্ন করলে একটা জবাব মেলে কি মেলে না! বড় চাপা মানুষ সে। একেবারে পাথরের মত ঠাণ্ডা, নির্জীব।

অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে চলে যেন রামকেশব। কারো সঙ্গে কথা বলে না। দিনরাত কি এক চিন্তায় যেন জর্জর হয়ে আছে।

রামকেশবের সংসারে আর মাত্র একটি মানুষ। সে তার বউ ক্ষিরি। আরো দু'জন ছিল। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। কিন্তু তারা নেই। তাদের কথা পরে।

রামকেশব যেমন চাপা স্বভাবের মানুষ, তার বউ ক্ষিরি ঠিক উল্টা। দিন রাত সে কথা বলে। লোক না পেলে নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়েই বকে যায়।

ভিগলিপুরের বাসিন্দারা বলে, ক্ষিরির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

মাথা খারাপ হওয়াটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। না হওয়াটাই ছিল আশ্চর্যের।

দেশভাগের দুঃখ তবু সইত। কিন্তু ছেলেমেয়ে হারানোর দুঃখ সইল না। রামকেশব আর ক্ষিরি—একজন দুঃখে পাথর, আর একজন মুখর।

দেশখান দু টুকরা হওয়ার পর আর দশজনের মত রামকেশবরাও কলকাতায় এসেছিল।

একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। মেয়ে পরী, ছেলে সুবল। পরী বড়, বছর ষোল বয়স। সুবল ছোট, তার বয়স দশ বছর।

শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সে সব দিনে লঙ্গরখানার সদাব্রত বসেছিল। মাথা পিছু এক ডাব্বা কালচে খিচুড়ি, আর এক খাবলা ঘ্যাঁট।

লঙ্গরখানার খিচুড়ি খেয়ে খেয়ে আমশা ধরল সুবলের। আমাশা থেকে রক্ত আমাশা। তাতেই একদিন ছেলেটা মরল।

বাকী রইল মেয়েটা।

পরী তখন যুবতী হয়েছে। লঙ্গরখানার খিচুড়ি খেয়েও অঢেল স্বাস্থ্যে সে শুধু যুবতীই না, রূপসীও হয়ে উঠেছে।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে বাপ-মায়ের বুক কাঁপে। তারা কাঁদে আর বলে, 'হা ভগমান, একটারে নিয়েছ, আর একটারে রাখ। বাপ-মায়ের বুক খালি কইরা দিও না।'

ঠিক খুপরি না, খোপও না।

শিয়ালদা স্টেশনের পাশে যে ফালতু জমি আর ফুটপাথ পড়ে রয়েছে, তারই এক টুকরা দখল করে পেটা টিন, পীচবোর্ড, চট দিয়ে ঘিরে নিয়েছিল রামকেশব। শুধু রামকেশব কেন, আরো অনেকেই।

হাত দুই মাত্র উঁচু ছাউনি। সামনের দিকে সুড়ঙ্গ। হামাগুঁড়ি মেরে ভিতরে ঢুকতে হয়।

শীত-গ্রীষ্ম, ঝড়-বর্ষা, লজ্জা-সরম—সব কিছুর হাত থেকেই বাঁচার জন্য ঐ ছাউনিটাই একমাত্র ভরসা। জন্ম-মৃত্যুও ঐ একই ছাউনিতে।

রামকেশব স্টেশনে ভিক্ষে করত। ভিক্ষে করতে করতে পৃথিবীর সব চেয়ে পুরানো ব্যবসাটির কায়দা কানুন শিখে নিয়েছিল। সংসার, মেয়ে-বউ, কারো দিকে তার নজর ছিল না। ভিক্ষে করবে, না সংসারের দিকে নজর রাখবে ?

ক্ষিরি মেয়েকে নিয়ে ছাউনিতে থাকত। সামনের দিকে ফুটপাথ। সেখানে তিন টুকরা ইঁট সাজিয়ে টিনের কৌটোতে জাউ রাঁধত। পচা, ঘেয়ো আনাজ দিয়ে ঝোল রাঁধত। আর লক্ষ্য করত, সামনের লাইট পোস্টের গায়ে ঠেসান দিয়ে একটা লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছে।

পোকায় খাওয়া দাঁত। ধূর্ত, ধারাল চোখ। ওলটানো চুল। পরনে পা-জামা আর বুকখোলা জামা।

চোখাচোখি হলেই লোকটা দাঁত বার করে হাসত। খুক খুক করে কাশত।

লোকটার দিক থেকে চোখ ফেরালেই ক্ষিরি দেখতে পেত, পরী একদৃষ্টে সেই লোকটার দিকেই চেয়ে আছে।

মেয়েকে ঠেলে গুঁতিয়ে ছাউনিটার ভিতর ঢোকাতে ঢোকাতে ক্ষিরি চেঁচাত, 'মর মর, তুই মর। আমার হাড্ডি জুড়াক।'

রোজ সকালে এসে দাঁড়াত লোকটা। সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকত। অনেক রাত্রে রামকেশব ফিরে এলে তাকে আর দেখা যেত না।

মেয়েকে দু হাতে আগলে আগলে রাখত ক্ষিরি। তবু তাকে বাঁচাতে পারল কই ?

দু দিন তার চোখে পড়ে গেল।

সন্ধ্যার একটু আগে, কর্পোরেশনের লোকেরা তখনও রাস্তার আলোগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে যায় নি। একটা চৌকা টিন নিয়ে কল থেকে জল আনতে গিয়েছিল ক্ষিরি। ফিরে এসে দেখে সেই লোকটা পরীর সঙ্গে ফিস ফিস করে কি যেন বলছে।

ক্ষিরিকে দেখেই লোকটা চট করে সরে গেল।

জলের টিনটা নামিয়ে রেখেই পরীর চুল ধরল ক্ষিরি। বলল, 'সব্বনাশী, ঐ শয়তান তোরে কী কয়?'

'ছাড় মা, ছাড়। সগল কমু তোমারে।'

'ছাড়ুম না, কিছুতে না। আগে বল্, কী কয় সেই শয়তানে?'

'আমারে শাড়ি দিতে চায়, টাকা দিতে চায়, খাবার দিতে চায়।'

'আজই পেরথম ঐ শয়তানটার লগে (সঙ্গে) কথা বললি?'

চিলের মত ধারাল, হিংস্র চোখে চেয়ে থাকে ক্ষিরি।

'না মা, তুমি যখনই এদিক উদিক যাও, তখনই ও আমার লগে কথা কইতে আসে।'

'আমারে কইস নাই ক্যান সব্বনাশী?'

চুলের মুঠি ছেড়ে পাগলের মত পরীর নাকে মুখে কীল চড় বসাতে থাকে ক্ষিরি। মার খেয়ে পরী পড়ে যায়। এবার নিজের চুল ছেঁড়ে সে। দুম দুম করে বুকে কীল মারতে মারতে বলে, 'তুই মর সব্বনাশী। আমিও মরি। আমার কী হইব? হে ভগমান!'

মার খেয়ে পরী পড়ে গিয়েছিল। টেনে হিঁচড়ে তাকে এবার চট-পীচবোর্ডের ছাউনিটার ভিতর ঢুকিয়ে দেয় ক্ষিরি।

একদিন কিন্তু পরীকে আর পাওয়া গেল না। লাইট পোস্টের গায়ে ঠেসান দিয়ে যে লোকটা দিনরাত বিড়ি ফোঁকে, সেও উধাও হয়েছে।

সুবল মরল। পরী নিখোঁজ হ'ল। ঠিক নিখোঁজ হ'ল না, মরল। শহরই তাকে মারল।

তারপর থেকেই ক্ষিরি যেন কেমন হয়ে গিয়েছে।

সেটেলসেন্টের শেষ মাথায় সব চেয়ে উঁচু টিলাটার উপর রামকেশরের ঘর।

ঘরটার সামনে বসে দিনরাত উকুন বাছে ক্ষিরি। কালো কালো লিকগুলি নখের মাথায় রেখে মারে। পট পট শব্দ হয়।

উকুন মারে আর বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। কাঁদে আর বলে, 'আমার সুবল রে, আমার পরী রে, তোরা কই? তোরা নাই, আমার কোল-বুক খালি হইয়া গেছে। তোরা আয়, ফিরা আয়। আয় রে বাপ, আয় রে মা। আমার লক্ষ্মী, সুনা (সোনা), আমার মণি মাণিক্যি। আয়; তোরা না আসলে আমার পুরী যে আন্ধার (অন্ধকার)।'

শুধু বিনিয়ে বিনিয়েই কাঁদে না ক্ষিরি, অভিসম্পাত দেয়। চোখের সামনে যাকে পায় তাকেই শাপাশাপি করে, 'পুতের মাথা খা। মেয়ের মাথা খা। আমার লাখান (মত) পুতখাকী, মেয়ে-খাকী হইয়া নিঃবংশ হ। তোরা পুত নিয়া মেয়ে নিয়া সুখে ঘর করিস। অত সুখ সইব না। পুতের সুখ, মেয়ের সুখ আমার ভোগে লাগল না। মনে করিস, তোগো (তোদের) ভোগে লাগব? কিছুতেই না। আমার বুক আমার ঘর খা খা করে। তোগো বুকও খা খা করব। শ্মশান হইয়া যাইব।'

ছেলেমেয়ে নিয়ে কারুকে সংসার করতে দেখলে ক্ষেপে ওঠে ক্ষিরি। বলে, 'সইব না, সইব না। অত সুখ ভোগে লাগব না। আমারও লাগে নাই, তোগোও (তোদেরও) লাগব না।'

ছেলেমেয়ের সুখ ঘুচেছে ক্ষিরির। অন্য কারুকে সেই সুখে বিভোর দেখলে, বুকের ভিতরটা যেন কেমন করে ওঠে তার।

সুবল আর পরীকে হারিয়ে স্নেহ, প্রীতি, মমতা—জীবনের সমস্ত মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে ক্ষিরি। পৃথিবীর কোন মানুষের জন্যই তার মনে এতটুকু কোমলতা নেই।

এখন দুপুর।

আজও উকুন বাছছিল ক্ষিরি। বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিল।

খিলাফৎকে নিয়ে পাল সাহাব এসে পড়ল। ডাকল, 'এ চাচী—'

ক্ষিরিকে চাচী ডাকে পাল সাহাব।

একবার মুখ তুলেই আবার উকুন বাছতে লাগল ক্ষিরি।

পাল সাহাব বলল, 'এই ছ্যাখ্ চাচী, কাকে এনেছি—'

'কারে আনছিস পাল সাহাব ?'

'বল্ তো কাকে এনেছি ?'

কারো দিকে না তাকিয়েই ক্ষিরি বলল, 'তুইই বল্ পাল সাহাব।'

একটু কি যেন ভাবল পাল সাহাব। তারপর বলল, 'তোর লেড়কাকে নিয়ে এসেছি চাচী।'

'সত্য ?'

সন্দিগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ পাল সাহাবের দিকে তাকিয়ে রইল ক্ষিরি। আবার বলল, 'সত্য কইস ?'

'হাঁ হাঁ সচ, জরুর সচ্—'

উকুন বাছতে বাছতেই উঠে এল ক্ষিরি। খিলাফতের থুতনি ধরে নেড়ে চেড়ে, মুখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'এ তো বুড়া মানুষ। এ আমার সুবল্ হইব কেমনে ? তুই যে কি কইস পাল সাহাব! তোর মাথা খারাপ।'

এতক্ষণ বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিল ক্ষিরি। এবার তীক্ষ্ণ, তীব্র শব্দে হেসে উঠল।

গাঢ় গলায় পাল সাহাব বলল, 'বুড্ঢা হোক আর বাচ্চা হোক, এ-ই তোর পুত। খুব বুখার হয়েছে। চল্, একে ঘরে নিয়ে যাই।'

'ব্যারাম হইছে ?'

'হাঁ।'

'তুই যখন কইস আমার পুত তখন ঘরেই নিয়া চল।'

বলেই বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল ক্ষিরি, 'ও আমার সুবলা রে, মায়ের বুক খালি করে দিয়া তুই কোথায় গেলি ?'

বিনাতে বিনাতেই পাল সাহাব আর খিলাফৎ খানকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

মাচানের উপর ছেঁড়া চট, ছেঁড়া কাঁথার উঁচু বিছানা। তার উপর খিলাফৎকে শুইয়ে দিল পাল সাহাব।

জ্বরে মুখটা টস টস করছে। চামড়ায় অসহ্য তাপ। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। ঘড়ঘড়ে, হাঁপানির টানের মত শব্দ হচ্ছে। টেনে টেনে গাঢ়, মন্থর, দীর্ঘ শ্বাস নিচ্ছে খিলাফৎ। বুকটা তোলপাড় হচ্ছে। গলার কাছটা ধুক ধুক করছে। মাঝে মাঝে অস্ফুট, আবছা গলায় কি যেন বলছে খিলাফৎ, ঠিক বোঝা যায় না।

পাল সাহাব ডাকল, 'কাছে আয় চাচী—'

একদৃষ্টে অনেকক্ষণ খিলাফতের দিকে তাকিয়ে রইল ক্ষিরি। চোখ কুঁচকে কি যেন ভাবল। তারপর আস্তে আস্তে বিছানাটার পাশে এসে বসল।

খিলাফতের মুখের উপর ঝুঁকে কি যেন খুঁজছে ক্ষিরি। হঠাৎ কি যেন সে পেয়ে গেল।

ক্ষিরির মুখটা এখন চক্‌চক্‌ করছে।

তিরিশ

রাত্রি যেন একটা কালো সমুদ্র।

সেই সমুদ্রের উপর সাদা ফেনার মত কুয়াশা ভাসছে।

কুয়াশার স্তরগুলি ফুঁড়ে আকাশ পর্যন্ত দৃষ্টি পৌছায় না। আকাশে হয়ত চাঁদ আছে, হয়ত নেই।

মায়া বন্দরের জাহাজ ঘাটায় তিনটি মূর্তি বসে আছে।

প্রোপ্রাইটর পানিকর, ডাইভার লা তে, আর একজন নয়া মানুষ। কাল পোর্ট ব্লেয়ার থেকে এখানে এসেছে। নাম আধারকর।

আধারকর পানিকরের অনেক বছরের দোস্ত।

এখন কত রাত, কে বলবে ?

পুবে করাত কলের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আরো দূরে টিলার মাথায় সারি সারি কাঠের বাড়ি, প্যাডক আর নারকেল গাছ—সব কিছু গাঢ় কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

মায়া বন্দরের এই দ্বীপের এখন কোন নির্দিষ্ট আকার নেই। কুয়াশা আর অন্ধকার তাকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

সমুদ্রের অশান্ত গর্জন আর মৌসুমী বাতাসের একটানা মাতামাতি ছাড়া এখন আর কোন শব্দ নেই।

জাহাজ ঘাটায় তিনটে মানুষ বেশ ঘন হয়ে বসে আছে।

আধারকর বলল, 'আমার কথাটা ভেবে দেখেছ ?'

'হুঁ।'

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল পানিকর। ফিস ফিস করে বলল, 'তোমার মতলবটা বহুত আচ্ছা।'

একটু চুপচাপ।

আধারকর আবার শুরু করল, 'বুঝলে দোস্ত, সিপির ব্যবসাতে আর সেই সুখ নেই। দরিয়া শালে মক্ষীচুষ (কৃপণ) হয়ে গেছে।'

আধারকরও সিপির কারবারী। বছর দশেক আন্দামানের দরিয়া থেকে সিপি কুড়িয়ে বিদেশের বাজারে চালান দিচ্ছে। কিন্তু সমুদ্র বড় কৃপণ হয়ে যাচ্ছে। আগে আগে যত সিপি মিলত, এখন আর তত মেলে না। ডাইভারদের মজুরী, মোটর বোটের তেলের খরচ, খাইখরচ—হাজারটা খরচ মিটিয়ে পোষাতে আর চায় না।

সিপির ব্যবসাতে আগে লাভ ছিল। কিন্তু আজকাল আর সে সুখ নেই। আগের সেই মধুও নেই।

আধারকর কিসমৎ ফেরাতে চায়।

কিসমৎ ফেরাতে হ'লে দরিয়ার মর্জির উপর ভরসা করলে চলে না। সিপির পিছনে অনিশ্চিত ভাবে কতদিন আর ছোটাছুটি করা যায়!

আধারকরের মাথায় তাই অন্য একটা ফিকির এসেছে। পানিকর তার অনেক কালের দোস্ত। তাকে নিয়েই কাজে নামতে চায় সে। আজ ক'মাস ধরে তাকে সমানে ফুসলাচ্ছে।

আধারকর বলল, 'বাঁচতে তো হবে। হাড্ডি চুর চুর করে সিপি তুলব। সেই সিপি সাফ করব। তারপর চালান দেব। না না, অত খাটুনি পোষায় না পানিকর।'

'সে তো ঠিক বাত।'

'দেখ ইয়ার, এই দুনিয়াতে লাভের ব্যবসা স্রিফ দুটো আছে। একটা শরাবের—'

আধারকর ঝুঁকে পড়ল। পানিকরের কানে মুখটা গুঁজে ফিস ফিস করে বলল, 'আর একটা হ'ল আওরতের।'

পানিকর মুখে কিছু বলল না। কিন্তু খুব একচোট মাথা ঝাঁকাল।

আধারকর আবার শুরু করল, 'জান ইয়ার, আমার এক শালা পাঞ্জাবী রিফুজী লেড়কীদের নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে। শালা লাল হয়ে গেল।'

অন্ধকারে পানিকরের চোখ দুটো ধক্ ধক্ করে।

আধারকর থামে না, 'তাই ভাবছিলাম, এখানে এমন একটা ব্যবসা ফাঁদলে কেমন হয়। সে কথা তোমাকে তো আগেই জানিয়েছি।'

কুয়াশা আর অন্ধকারে সমুদ্র রহস্যময় হয়ে আছে।

উঁচু উঁচু ঢেউগুলি কুয়াশা মাথায় নিয়ে পারে এসে আছাড় খাচ্ছে। জলের রং বোঝা যায় না। আকাশ দেখা যায় না। শুধু বোঝা যায়, কুয়াশা আর অন্ধকারের নীচে বিপুল সমুদ্র উথল পাথল হচ্ছে।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছে লা তে।

দিনের সমুদ্রকে তবু কিছু কিছু বুঝতে পারে সে। কিন্তু নিরন্ত, অফুরন্ত অন্ধকারে নিজেকে জড়িয়ে যে অদৃশ্য সমুদ্র এখন দুর্জ্ঞেয় রহস্যে মেতে আছে, তাকে কোনদিনই বুঝতে পারল না লা তে।

লা তে'র পাঁজরে কনুই দিয়ে আস্তে একটা গুঁতো মারল পানিকর। ডাকল, 'এ লা তে—'

লা তে চমকে উঠল, 'হাঁ মালেক, কুছু বললেন?'

'আরে শালে, দরিয়া দেখলে বুঝি বাওরা বনে যাস!'

লা তে কিছু বলল না। হি হি করে খুব একচোট হাসল।

পানিকর বলল, 'শালে একদম পানির পোকা।'

'হি-হি—'

লা তে হাসতেই লাগল। বোঝা গেল, পানির পোকা বলাতে সে খুশিই হয়েছে।

'থাম শালে, আধারকরের কথা শোন।'

'কহিয়ে আধারকরজী—'

আধরকর শুরু করল, 'শরাবের ব্যবসা তো করা যাবে না। শুনছি সিরকার (সরকার) আন্দামানে শরাব বিলকুল বন্ধ করে দেবে। তাই ভাবছি, আওরতের ব্যবসাটাই চালু করব।'

লা তে শিউরে উঠল, 'লেকিন—'

'লেকিন ফেকিন কুছ নেহী। আগে আমার বাত শোন্।'

কেশে গলাটা সাফ করে নিল আধারকর। আস্তে আস্তে বলল, 'এক এক লেড়কীর জন্যে আমি হাজার রুপেয়া দেব।'

অনেকটা সময় কেউ আর কিছু বলল না।

পানিকরই প্রথম কথা বলল। তার স্বরে কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা সন্দেহ, কিছুটা লোভ মেশানো। টেনে টেনে সে বলল, 'হা-জা-র রু-পে-য়া—'

'হাঁ ইয়ার।'

কথার মধ্যেই লা তে উঠে চলে গিয়েছে।

মায়া বন্দরের জাহাজ ঘাটায় অন্ধকার আর কুয়াশা মেখে দুটো মূর্তি বড় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে রয়েছে।

একত্রিশ

দিন, মাস, বছর দিয়েই শুধু নয়, সুখ-দুঃখ-যন্ত্রণা-আনন্দ দিয়েও মানুষ তার জীবনকে তার আয়ুকে মেপে মেপে চলে।

জীবনের এই নিয়ম বুঝি সব জায়গাতেই এক। তার কোন ব্যতিক্রম নেই। হের ফের নেই।

বঙ্গোপসাগরের এই সৃষ্টিছাড়া দ্বীপেও জীবনের সেই সনাতন নিয়মটি কাজ করে যায়।

•

নিত্য ঢালীর সঙ্গে ঝগড়া করে নিজের ঘরে ফিরতে ফিরতে উজানী বুড়ী ভেবেছিল, চুলায় যাক হারাণ। তাকে আর খুঁজবে না।

বিড় বিড় করে বকেছিল, 'যা, তোর বান্ধবরা যেইখানে আছে, সেইখানেই যা। তাগো (তাদের) কাছেই থাক। তোর মুখ আমি আর দেখতে চাই না। ক্যান দেখুম? যে না ছাখে আমারে, তারে নিক চামারে।'

মুখে তো এত বলল, তবু মনকে বুঝ মানাতে পারল কই? ঠিক করেছিল, হারাণের ব্যাপারে সে পাষাণ হবে। কিন্তু বুক বাঁধতে পারল কই?

ক্ষুব্ধ, অভিমানী মনটা যেই মাত্র একটু থিতাল, সঙ্গে সঙ্গে হারাণের খোঁজে আবার বেরিয়ে পড়ল উজানী বুড়ী।

হারাণ নিত্য ঢালীর বাড়িতে ওঠে নি। এ ক'দিন সে ছিল উদ্ধব বৈরাগীর কাছে।

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে, কেঁদে, ভাই-দাদা-সোনা ডেকে হারাণের মনটাকে নরম করে ফেলল উজানী বুড়ী।

শেষ পর্যন্ত ঘরে ফিরল হারাণ।

হারাণ ঘরে ফিরলে হবে কি, উদ্ধব বৈরাগীর কাছে থাকলে হবে কি, উজানী বুড়ীর মনে সেই যে ধারণা জন্মেছিল, তা আর ঘুচল না। তার ধারণা, হারাণ নিত্য ঢালীর ঘরেই ছিল।

আজকাল হারাণকে আর বিয়ের কথা বলে না উজানী বুড়ী। ভাত জ্বাল দিতে দিতে কি উঠান নিকাতে নিকাতে নিজের মনেই আক্ষেপ করে, বিলাপ করে, 'বিরিক্ষ (বৃক্ষ), আগে ছিলে কার? তোমার। অখন কার? অমুক বান্ধবের।'

একটু থামে। আবার শুরু করে সে, 'বুঝি, সগলই বুঝি। কিন্তুক এই বান্ধবেরা আছিল কোথায়? যখন ছুই বছরের শিশু রেখে বাপ মরল মা মরল, তখন তারা আসতে পারে নাই! সেই শিশু অখন বড় হইছে, হাত-পা হইছে, পাখ (পাখনা) হইছে। অখন তো বান্ধব জুটবই। জুটুক জুটুক। তোর কপাল তুই খাবি। আমার আর কি? কিছুই না। আমার আর কয়দিন? তিন কাল গেছে। গতর নাই, বয়স নাই, আমার কিছুই নাই। ভাবছিলাম তোর সংসার গুছাইয়া দিয়া যামু। কিন্তুক নিজের কপাল নিজে পোড়াইলে পরে কি করতে পারে?'

উজানী বুড়ী সমানে বকে যায়।

সবই ছাখে হারাণ, সবই শোনে। কিন্তু মুখ খোলে না। মুখ খুললেই তো অনর্থক চেঁচামেচি। একটা অনর্থ বেধে যাবে।

দেখেও হারাণ ছাখে না, শুনেও শোনে না।

কানে তুলো আর চোখে ঠুলি দিয়ে মুখ বুঁজে থাকে সে।

আদতে উজানী বুড়ীকে গ্রাহ্যেই আনে না হারাণ।

অনেকটা আগেই সকাল হয়েছে।

দ্বীপের পাখিরা সমুদ্রে চলে গিয়েছে। দিনের প্রথম রোদে জঙ্গলের মাথা জ্বলছে।

বাঁশের মাচানে শুয়ে রয়েছে হারাণ।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে সোনার তারের মত সরু সরু রোদের রেখা চোখে এসে বিঁধছে। সকাল বেলার ঘুমের মৌতাত ছুটে যাচ্ছে।

অগত্যা রোদ ঠেকাবার জন্য কাঁথাটা মাথা পর্যন্ত টেনে দিল হারাণ।

কিন্তু কাঁথা মুড়ি দিয়েই কি ঘুমাবার জো আছে?

গুপী, বিলাস আর যোগেন এসে ডাকাডাকি শুরু করল, 'হারাণ, আঁই হারাণ, আর কত ঘুমাবি? ওঠ্, ওঠ্—'

উঠতেই হ'ল। বিরক্ত গলায় বিড় বিড় করে হারাণ বলল 'না, সুখের ঘুমটুক যে ঘুমাব, তার উপায় নাই। বিহানে (সকালে) আসতে কইছি, শয়তানেরা রাইত থাকতে উঠে আসছে।'

মাচানে বসেই আড়মোড়া ভাঙল হারাণ। একটা একটা করে হাত-পায়ের বিশটা আঙুল মটকাল। গুনে গুনে দশটা হাই তুলল।

বাইরে গুপীরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে, 'হারাণ, আঁই হারাণ— মরলি না কি? ওঠ্—ওঠ্—'

'আরে যাই যাই—'

ক্যাঁচা বাঁশের ঝাঁপ খুলে বাইরে বেরিয়ে এল হারাণ। আর বেরিয়েই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল।

গুপীরা একপাল কুকুর নিয়ে এসেছে। কুকুরগুলো উঠানময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইল হারাণ। বিস্ময়ের ভাবটা কাটলে বলল, 'এত কুত্তা দিয়া কি হইব?'

'কাল রাইতের কথা আজ বিহানেই (সকালেই) ভুললি?'

গুপীরা বলতে থাকে, 'তুই তাজ্জব করলি হারাণ। তোর মনখান কোথায় থাকে রে বান্দর (বাঁদর) ?'

হারাণ জবাব দিল না।

তার মনে পড়েছে। কাল রাত্রেই ঠিক করা হয়েছিল, আজ সকালে তারা জঙ্গলে শুওর মারতে যাবে। কথা অনুযায়ী গুপীরা কুকুর নিয়ে এসেছে।

নাঃ, আজকাল সব ব্যাপারেই বড় ভুল হয়ে যাচ্ছে হারাণের।

গুপীরা তাড়া লাগাল, 'চল্—সুরয্ (সূর্য) উইঠা গেছে। আর দেরী করণের কাম নাই।'

'চল্—'

আগে আগে কুকুরের পাল চলল। পিছন পিছন গুপী, হারাণ, বিলাস আর যোগেন।

শুওর মারতে তারা পশ্চিম দিকের পাহাড়ে যাবে।

টিলার পর টিলা পেরিয়ে, চড়াই-উতরাই ভেঙে, জঙ্গল ঠেঙিয়ে হারাণরা চলেছে। চলতে চলতে একবার আকাশের দিকে তাকাল তারা।

সূর্যটা আকাশ বেয়ে বেয়ে অনেকখানি উপরে উঠে এসেছে।

পশ্চিমা বাতাস এতক্ষণ ঢিমা তালে বইছিল। হঠাৎ ক্ষেপে উঠল। জঙ্গলের মাথা মুচড়ে মুচড়ে তার মাতামাতি শুরু হ'ল।

নিত্য ঢালীর ঘরের সামনে দিয়ে পথ।

যেতে যেতে থমকে পড়ল হারাণ।

গুপীরা বলল, 'কী হইল ? এইখানে খাড়লি (দাঁড়ালি) যে ?'

'তোরা জঙ্গলে যা, আমি এট্টু পরে যামু।'

বেলা চড়ছে। রোদের তাত বাড়ছে। গুপীরা আর দাঁড়াল না। কুকুরের পাল নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

ঝিম মেরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল হারাণ।

এখান থেকে নিত্য ঢালীর ঘরটা পরিষ্কার দেখা যায়। উঠান, পাটাতন, বাঁশের বেড়া, ঝাঁপ—সব কিছুই স্পষ্ট।

উঠানে পাশাপাশি ঘন হয়ে বসেছে নিত্য ঢালী আর একটা লোক। লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। হারাণের দিকে পিছন ঘুরে সে বসে আছে।

পিছন দিকটা দেখে হারাণ যতদূর আন্দাজ করতে পারছে, তাতে মনে হয় লোকটা এই সেটেলমেণ্টের কেউ না।

এই উপনিবেশের কাকে না চেনে হারাণ! সবার চেহারা তার মুখস্থ। দূর থেকে আদরা দেখেই সে বলতে পারে কে যোগেন, কে পাল সাহাব আর কে রসিক শীল।

কিন্তু এই লোকটা ডিগলিপুরের সেটেলমেণ্টে একেবারে নতুন মনে হচ্ছে।

লোকটা সম্বন্ধে নানা কথা হারাণের মাথায় দলা পাকিয়ে যাচ্ছিল। কি নাম, কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে, নিত্য ঢালীর সঙ্গে এত মাখামাখি হ'ল কি করে, এমনি হাজারটা চিন্তা হারাণকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

এক সময় হারাণের হুঁশ হ'ল। দেখল, কথা বলতে বলতে নিত্য ঢালী আর সেই লোকটা টিলা বেয়ে নীচের দিকে নেমে আসছে।

পাশেই একটা প্যাডক গাছ। সরকারী বন বিভাগের লোকেরা গাছটার ডালপালা এবং ছাল পুড়িয়ে গিয়েছে। কি মনে করে আধপোড়া, কবন্ধ গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল হারাণ।

হারাণ যা আন্দাজ করেছিল, ঠিক তাই।

লোকটা এই সেটেলমেণ্টের কেউ না। চামড়ার রং কুচকুচে কালো, পুরু পুরু ঠোঁট, কোঁকড়ানো চুল। এই উপনিবেশের কারো সঙ্গেই তার চেহারার আদৌ মিল নেই।

লোকটাকে যে কোথা থেকে নিত্য ঢালী আমদানী করল, ঈশ্বর জানে।

লোকটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এরিয়াল উপসাগরের দিকে চলে গেল নিত্য ঢালী।

সঙ্গে সঙ্গে আধপোড়া প্যাডক গাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল হারাণ। বেরিয়েই তার চোখে পড়ল, খোলা বারান্দার পাটাতনে একটা খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে আছে কাপাসী। নতমুখ, আঁটা ঠোঁট, উদাসীন চোখ। পশ্চিমা বাতাস এক একবার ক্ষেপে উঠে চুলগুলো উড়িয়ে নিয়ে কাপাসীর মুখ ঢেকে দিচ্ছে।

টিলা বেয়ে তর তর করে উপরে উঠে এল হারাণ। একটুক্ষণ উঠানের এক কিনারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

নাঃ, যেমন ছিল তেমনি বসে রইল কাপাসী। আগের মতই নত মুখ, আঁটা ঠোঁট, উদাসীন চোখ।

আস্তে আস্তে কাপাসীর সামনে এসে দাঁড়াল হারাণ।

একবার মুখ তুলেই নামিয়ে নিল কাপাসী।

হারাণ ডাকল, 'কাপাসী—'

শান্ত গলায় কাপাসী বলল, 'কও—'

'নিত্য তালুইর লগে (সঙ্গে) একজনেরে বাইরে যাইতে দেখলাম। নয়া মানুষ মনে হইল।'

'ও, তা হইলে দেখা হইছে?'

একটু থতমত খেল হারাণ। বাধো বাধো গলায় বলল, 'এইখান দিয়া শুওর মারতে যাইতে আছিলাম। দেখলাম, নিত্য তালুই আর নয়া মানুষটা কথা কইতে কইতে সমুন্দরের দিকে গেল। তাই—'

'তাই খবর নিতে আসলা?'

'হ।'

অনেকক্ষণ আর কেউ কিছু বলে না। হারাণও না, কাপাসীও না।

হারাণ ভেবেছিল, নিজের থেকেই সব কথা বলবে কাপাসী। লোকটা কে, কি নাম, কি মতলবে এসেছে, কিছুই বাকী রাখবে না। কিন্তু যখন সে কিছুই বলল না, তখন মনে মনে ক্ষুব্ধ হ'ল।

কিন্তু ক্ষোভটাকে মনের মধ্যে চেপে রাখতে জানে হারাণ। নিজের গরজেই এবার সে বলল, 'নয়া মানুষটা কে?'

'পানিকর ভাই। বাপে তার কাছে কাম করে। পানিকর ভাই বড় ভাল মানুষ। কামের বদলে টাকা গ্যায়। আমাগো (আমাদের) কত তত্ত্বতালাস করে।'

পানিকর সম্বন্ধে একসঙ্গে অনেক কথা বলে কাপাসী।

'পানিকর ভাই! এর মধ্যে সম্ভন্ধও পাতান হইয়া গেছে!'

হারাণকে উত্তেজিত, ক্ষুব্ধ দেখায়।

কাপাসী বলতে থাকে, 'মানুষের লগে (সঙ্গে) মানুষের সম্ভন্ধ পাতাইতে হয় না। আপনা থিকাই পাতান থাকে। বুঝলে পুরুষ?'

'এ্যাদ্দিন বুঝি নাই। অখন বুঝলাম।'

খানিকটা চুপচাপ।

হারাণই আবার শুরু করে, 'তোমার পানিকর ভাই কি রোজই আসে?'

বলেই চোখ কুঁচকে কাপাসীর দিকে তাকায়।

'পেরায়ই (প্রায়ই) আসে। আমাগোর (আমাদের) কত উপকার করে।'

টেনে টেনে হারাণ বলে, 'উপকারী বান্ধব। তা এই বান্ধবখান এ্যাদ্দিন আছিল কোথায়?'

কাপাসী জবাব দেয় না।

আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল হারাণ। কিন্তু যে কাপাসী নিস্পৃহ, উদাসীন, তার সঙ্গে সেধে সেধে কত কথাই বা বলা যায়!

মাথার ভিতরটা যেন ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল হারাণের। সে বলল, 'আমি অখন যাই।'

মুখে কিছুই বলল না কাপাসী। মাথাটা বাঁ পাশে কাত করল।

উত্তেজনায়, দুঃখে, ক্ষোভে কপালে, নাকের ডগায় ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিয়েছে। হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে। একটা ভারী, নিরেট কান্না কণ্ঠার কাছে দলা পাকিয়ে আছে। হাজার ঢোঁক গিলেও সেটাকে নামানো যাচ্ছে না।

টিলা বেয়ে টলতে টলতে নীচের দিকে নামছিল হারাণ। একটা কথা ভেবে সে অবাক হয়ে যাচ্ছে।

কাপাসীর পানিকর ভাই এল। সঙ্গে সঙ্গে তার তীব্র, অবুঝ, অস্বাভাবিক হাসিও থেমে গেল! অন্য দিনের মত কাপাসী আজ তো কল কল হাসিতে মেতে উঠল না!

কাপাসীর কথা যতই ভাবল, মাথাটা ততই গরম হয়ে উঠল হারাণের।

একবার বসতেও বলল না কাপাসী। নিজের থেকে একটা কথাও বলল না। হারাণ কিছু জিজ্ঞাসা করলে দু একটা কথায় দায় সারল।

হারাণের মনে হ'ল, কাপাসীর কথায় বার্তায় প্রাণের তাপ নেই। তার সম্বন্ধে কাপাসী কেমন যেন উদাসীন, নীরস, নির্জীব।

কিন্তু কেন?

হুঁশ ছিল না, কাপাসীর কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন নিজের ঘরে এসে উঠেছে।

আজ আর হারাণের শুওর মারতে যাওয়া হ'ল না।

বত্রিশ

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে বর্ষা এসে গেল।

চৈত্র থেকে যে ছন্নছাড়া, দিশাহারা মেঘগুলি আকাশময় ভেসে বেড়াচ্ছিল, আষাঢ়ে এসে তারা জমাট বেঁধে গেল।

আকাশটা পোড়া তামারঙের মেঘে ছেয়ে গিয়েছে। মেঘ এত নিরেট, এত জমাট যে আকাশের নীল দেখার মত কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই।

মাঝে মাঝে আকাশটা আড়াআড়ি চিড় ধরে। কড় কড় শব্দে বাজ গর্জায়। সাপের জিভের মত বিদ্যুৎ লিক লিক করে।

আর দিনরাত আকাশ জোড়া বিরাট মৃদঙ্গটায় গুরু গুরু ঘা পড়ে।

পশ্চিমা বাতাসের দাপট বড় সাঙ্ঘাতিক। কিন্তু আন্দামানের মেঘ এত ঘন, এত ভারী যে পশ্চিমা বাতাসও তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে না। মেঘের গায়ে বাড়ি খেয়ে বাতাস ফিরে যায়।

মেঘ উড়িয়ে নেবে কি, পশ্চিমা বাতাসই রাশি রাশি মেঘের টুকরাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে আন্দামানের আকাশে নিয়ে আসছে।

একদিন সব আয়োজন শেষ হ'ল।

তারপরেই বৃষ্টি শুরু হ'ল। আন্দামানের বৃষ্টির বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, ক্লান্তি নেই, সময়ের হিসাব নেই। দিনরাত ঝরছে তো ঝরছেই।

তামারঙের আকাশটা এখন ছুর্বোধ্য হয়ে গিয়েছে। দূরের কাছের টিলা-জঙ্গল-পাহাড়—সব, সব কিছু আবছা, ঝাপসা।

বৃষ্টির নিরন্তু সীসারঙে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপ ছুর্জ্ঞেয়, রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

বর্ষা নামার আগেই পাল সাহাব নয়া সেটেলমেণ্টের বাসিন্দাদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল, 'এ বারই বারিশ নামবে, খুব সাবধান। চালে আর এক দফা ছাউনি চাপা।'

আন্দামানের বর্ষার স্বরূপ এই নতুন মানুষগুলো জানে না। আগে ভাগে তাদের সাবধান না করে দিলে বিপদ অনিবার্য।

জল যেই নামে, সব গর্ত বুঁজে যায়। গর্তের যারা বাসিন্দা, সাপ-বিছা-কানখাজুরা, এমনি নানান জাতের সরীসৃপ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে।

মানুষের ঘর ছাড়া এই উলঙ্গ, বর্বর দ্বীপে নিরাপদ আশ্রয় কোথায় মিলবে? সরাসরি তারা ঘরেই এসে ঢোকে।

পাল সাহাবের কথামত নতুন বাসিন্দারা ঘরের চালে আর এক পরল বেতপাতা চাপিয়েছে। সাপ-বিছা-পোকা-মাকড় যাতে ঢুকতে না পারে, সে জন্য বেড়ার গায়ে সব ফাঁক-ফোকর-ফুটো ন্যাকড়া গুঁজে গুঁজে বুঁজিয়ে ফেলেছে। ঘরের আড়াগুলো তক্তা দিয়ে আটকে দিয়েছে।

সাতদিন অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে।

কয়েকদিন আগেও কিলপঙ নদীটাকে দেখে হারাণ মনে মনে হেসেছিল। হাত দশেক চওড়া একটা তিরতিরে, প্রায় নিঃস্রোত খালের নাম কি না নদী! তা যে দেশের যে রীতি!

এখন যদি একবার ঘর থেকে বেরিয়ে হারাণ দেখত!

সোঁতা খালটার চেহারা কি ভয়ানকই না হয়ে উঠেছে। দশ হাত

চওড়া খালটা এখন পঞ্চাশ হাত হয়ে গিয়েছে। আর তীরের মত দুর্জয় বেগে জল ছুটছে। জলের ঘা খেয়ে শিকড়সুদ্ধ বিরাট বিরাট গাছগুলি উপড়ে যাচ্ছে।

বর্ষার দৌলতে কিলপঙ নদী কি হয়ে গেল!

নদীর এখন ভরা যৌবন।

শুধু কি কিলপঙ নদীই, ওপাশের ডিগলিপুরের খালটারও একই দশা। বর্ষার জল পেয়ে সেও যুবতী হয়ে উঠেছে। ফুলে ফেঁপে ফেনিয়ে উঠে এরিয়াল উপসাগরের দিকে ছুটেছে।

এই বৃষ্টির মধ্যেও পাল সাহাব বেরিয়ে পড়েছে।

রোজই সে সেটেলমেন্টটা টহল মেরে বেড়ায়। এটা একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। জল হোক, ঝড় হোক, ব্যারাম হোক, কিছুতেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবার জো নেই।

পায়ে গাম বুট, গায়ে রবারের রেনকোট। পা ফেললেই কাদায় গেঁথে যায়। সঙ্গে সঙ্গে টেনে তোলে পাল সাহাব। অতি কষ্টে কাদা আর বৃষ্টির সঙ্গে যুঝতে যুঝতে সে এগোয়। এগোয় আর চিল্লায়, 'শালে লোগ, খুব সাবধান। সাপ-বিছে-কানখাজুরা বেরিয়ে পড়েছে। ঘরে ঢুকবে।'

বৃষ্টির একটানা শব্দে পাল সাহাবের গলার আওয়াজটা চাপা পড়ে যায়।

টহল মারতে মারতে এর-ওর-তার ঘরে গিয়ে বসে পাল সাহাব। কিছুক্ষণ এ কথা সে কথা বলে, 'এবার তো তোদের মজা। বারিশ পড়ল। মিট্টিও লাঙলের গুঁতোয় চৌপট হয়ে আছে।'

এ-ও-সে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলে, 'হ পাল সাহাব। বষ্যাটা এট্টু ধরলেই বীজ রুইতে যামু।'

'মালুম হচ্ছে ফসল এই মিট্টিতে ভালই ফলবে।'

'তাই মনে হয়।'

সকলে একই কথা বলে।

কিছুক্ষণ বসেই উঠে পড়ে পাল সাহাব।

কারো চাল হয়ত ফুটো হয়েছে, তা মেরামত করে, কেউ হয়ত ব্যারামে পড়েছে, তার ব্যবস্থা করে, সব ঘর ঘুরে সকলের খোঁজ খবর নিয়ে শেষ পর্যন্ত সেটেলমেণ্টের শেষ মাথায় উদ্ধব বৈরাগীর ঘরে আসে পাল সাহাব। গাম বুট, রেনকোট খুলতে খুলতে বলে, 'তামাক সাজো উস্তাদ—'

মায়া বন্দর থেকে হুঁকো-কলকি-তামাক—সব সরঞ্জামই এনে দিয়েছে পাল সাহাব।

জুত করে তামাক টানতে টানতে সে বলে, 'লাগাও উস্তাদ, সেই গানাটা লাগাও।'

রোজই এক নিয়ম। কি গান, তা আর বলতে হয় না। আপনা থেকেই উদ্ধব বুঝে নেয়।

দোতারার তারে আঙুল টেনে টেনে টুঙ টাঙ শব্দ করে উদ্ধব। তার পর খানিকক্ষণ গুন গুন সুর ভেঁজে উদাস গলায় গাইতে থাকে—

ওরে যা হবার তাই হবে।
ভবের তরঙ্গ বেড়েছে
বলে কি
ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে?

এক সময় হুঁকোর শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। অনেক, অনেক দূরে সীসার রঙের মত বৃষ্টিতে আকাশটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আকাশের ওপারে দৃষ্টিটাকে হারিয়ে ফেলে পাল সাহাব।

আহা, বঙ্গোপসাগরের এই বর্বর, নিদারুণ দ্বীপে উপনিবেশ গড়তে গড়তে পাগলা পাল সাহাব জীবন রসিক হয়ে গেল।

তেত্রিশ

একটানা পনের দিন বৃষ্টি চলল।

কবে যে বৃষ্টি থামবে, আদৌ থামবে কি না, আকাশের চেহারা দেখে বুঝবার উপায় নেই।

যোগেনের ঘরটা একেবারে কিলপঙ নদীর পারে।

নদীর ঘা খেয়ে খেয়ে ঘরের পিছন থেকে অনেকখানি মাটি ধ্বসে পড়েছে। এখনও বিরাট বিরাট মাটির চাঙাড় ধ্বসছে।

ঘরের চালটা তিন চার জায়গায় ফুটো হয়ে গিয়েছে। জল পড়ে ঘর ভেসে যাচ্ছে। এত বৃষ্টি যে বাইরে বেরিয়ে বেতপাতা এনে চাল ছাইবে, তার জো নেই।

অগত্যা ঘরে বসে বসে ভিজছে যোগেন।

খাওয়া দাওয়া একরকম বন্ধ। বৃষ্টি না ধরা পর্যন্ত আখা (উনুন) জ্বালাবার কোন আশাই নেই।

বর্ষা নামবার আগে কিছু চিঁড়ে আর গুড় জোগাড় করে রেখেছিল যোগেন। চিঁড়ে চিবিয়েই ক'টা দিন চলছে।

দুই হাঁটুতে থুতনি ঢুকিয়ে মাচানের উপর জবুথবু হয়ে বসে আছে যোগেন

ঘরের সব ফাঁক-ফুটো ন্যাকড়া গুঁজে গুঁজে এঁটে দিয়েছিল

তা সত্ত্বেও রোখা গেল না। কোন পথে, কখন, কি ভাবে যে পোকা-মাকড়-জোঁক ঢুকে পড়েছে, তারাই জানে।

ঘরময় বাড়িয়া পোকা, গান্ধী পোকা, জোঁক, বিছা কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। এ ঘর যেন তাদের রাজত্ব।

জোঁকগুলো যোগেনের রক্ত শুষে শুষে কচি তেলাকুচের মত হয়ে আপনা থেকেই খসে পড়ছে। বাড়িয়া পোকা আর গান্ধী পোকারা কামড়ে কামড়ে চামড়া ফুলিয়ে ফেলেছে।

পনের দিন ধরে সমানে জোঁক আর পোকাদের উৎপাত সয়ে সয়ে শরীরে এখন আর বোধ নেই।

বাইরের দিকে একবার তাকাল যোগেন।

সীসারঙ, দুর্বোধ্য আকাশের দিকে তাকিয়ে বোঝা যায় না, এখন কত বেলা। এখন সকাল, দুপুর না সন্ধ্যা!

হঠাৎ চমকে উঠল যোগেন।

ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে বিরাট একটা গোক্ষুর সাপ ঘরের মধ্যে ঢুকল। কুচকুচে কালো রঙ। ফণায় সাদা শাঁখ আঁকা।

ঘরে ঢুকে সাপটা জুল জুল করে এদিক সেদিক তাকাল। তার চোখ দুটো দু টুকরা নীলার মত জ্বলছে। জলে ভিজে ভিজে সাপটার গায়ের আঁশ এখন মসৃণ, পিছল এবং চকচকে।

সাপটা বুঝি বা তাপ চায়। জলের হাত থেকে বাঁচবার জন্য উষ্ণ, নিরাপদ একটি আশ্রয় চায়।

তাকাতে তাকাতেই হঠাৎ সাপটার চোখে পড়ে গেল। মাচানের উপর একটা লোক বসে আছে।

যোগেন একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল।

সাপের সঙ্গে মানুষের চোখাচোখি হ'ল। ঠিক সাপ আর মানুষ নয়। যেন দুটো সাজ্যাতিক প্রতিপক্ষ।

যোগেনের চোখের দিকে তাকিয়ে সাপটা কি বুঝলে কে জানে। সাঁ করে লেজের উপর ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। আধ হাত

চওড়া বিরাট ফণাটা একটু একটু তুলতে লাগল। পাতাহীন চোখ দুটো জ্বলতে লাগল। চেরা জিভটা লিক লিক করতে লাগল।

এক মুহূর্ত আচ্ছন্নের মত বসে রইল যোগেন। মেরুদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা হিমের স্রোত নেমে গেল তার।

একটাই মাত্র মুহূর্ত। তারপরেই পাশ থেকে ঝকঝকে বর্মী দা'টা তুলে বাগিয়ে ধরল সে।

বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে একটি ঘরের দখল নিয়ে একজন মানুষ আর একটা সাপ মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

এই ঘর একজনেরই হবে। হয় মানুষের, নয় সাপের। দু জন প্রতিপক্ষ এক ঘরে থাকা অসম্ভব।

সাপের ফণাটা দুলছে। ছোবল পড়বার আগেই যোগেন দা চালিয়ে দিল। সাপের দেহ থেকে ফণাটা ছিটকে বেরিয়ে গেল। প্রায় পাঁচ হাত লম্বা দেহটা এক মুহূর্ত খাড়া থেকে আছড়ে নীচে পড়ল। তির তির করে কাঁপতে লাগল। খানিকটা পর কাঁপুনি থেমে গেল।

উত্তেজনায়, প্রাণ বাঁচাবার অন্ধ তাগিদে দা চালিয়ে দিয়েছিল যোগেন।

উত্তেজনা কেটে গেলে মাচানের উপর আচ্ছন্নের মত বসে রইল সে। কপালে, কানে, নাকের ডগায় কণা কণা ঘাম ফুটল। হাতের পাতা দুটো ভিজে উঠেছে। শ্বাস টেনে টেনে হাঁপাতে লাগল যোগেন।

নীচের পাটাতনে সাপটা দু খণ্ড হয়ে পড়ে রয়েছে।

কতক্ষণ যে বসে ছিল, যোগেনের হুঁশ নেই। যখন হুঁশ হ'ল, তখন বাইরের সীসারঙ আকাশটা আরো আবছা, আরো দুর্জ্ঞেয় হয়ে যাচ্ছে। বুঝি বা একটু আগে দিন ছিল। দিনটা মরে মরে এখন রাত হচ্ছে।

অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে যোগেন। এখন কি করবে, সেই কথাই সে ভাবছিল।

হঠাৎ কঁ্যাচা বাঁশের ঝাঁপে কে যেন ঘা মারল।

যোগেন চমকে উঠল, 'কে ?'

'আমি। আমি ছাড়া আবার কে ?'

বৃষ্টির একটানা শব্দের সঙ্গে মিশে গলার স্বরটা দুর্বোধ্য শোনাল। কে যে কথা বলছে, যোগেন বুঝতে পারল না।

বাইরে থেকে এবার ঝাঁপ ধরে ঝাঁকানি শুরু হ'ল। অসহিষ্ণু, কিছুটা বা উত্তেজিত গলা শোনা গেল, 'শিগগির দুয়ার খোল। শিগগির—'

অগত্যা বাঁশের মাচান থেকে নীচে নামল যোগেন। আর কঁ্যাচা বাঁশের ঝাঁপটা খুলেই তিন পা পিছিয়ে এল, 'তুমি !'

'হ-হ, আমি। চিনতে পারলা না ? এই কয়দিনে আমি কি এতই বদলাইয়া গেলাম পুরুষ ?'

যোগেন জবাব দিল না। বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

যে ঘরে ঢুকেছিল, এবার তীক্ষ্ণ, রিনরিনে গলায় সে হেসে উঠল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'না চেনার তো কথা না পুরুষ। তোমার লগে আমার দশ বিশ বছরের সম্ভন্ধ। তাই না !'

বিমূঢ় ভাবটা অনেকটা কেটে গিয়েছে যোগেনের। এবার সে বলল, 'তুমি ঘরে যাও তিলি, ঘরে যাও—'

'ঘরে ফেরার জন্যে তো আসি নাই।'

তিলি কাছে এগিয়ে এল।

'কিন্তুক এ ভাল না, এ ভাল না। বড় মোন্দ, বড় পাপ—'

তিলি কিছুই বলল না। আগের মতই সরু, ধারাল শব্দ করে হাসতে লাগল। তিলির হাসির শব্দটা স্চঁের মুখের মত যোগেনের সমস্ত শরীরে বিঁধতে লাগল

বৃষ্টিতে নেয়ে এসেছে তিলি। সারা দেহ কাদায় মাখামাখি।

শাড়িটা জলে ভিজে বুকে লেপটে আছে। শাড়ির তলে এক জোড়া, একই মাপের সুগোল, নিটোল বুক পাশাপাশি ওত পেতে আছে। গালে আর কপালে তিনটে জোঁক লেগে আছে। তিলির হুঁশ নেই। বিড়ালীর মত কটা চোখ দুটো ঝিক ঝিক করছে। দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে তিনটে ধারাল, চোখা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। মুখে ধূর্ত এবং সূক্ষ্ম একটি হাসি মিহি পর্দার মত জড়িয়ে আছে।

তিলির মনে কি আছে, কে জানে ?

যোগেন অনেকটা পিছু হটেছে। তিলিও এক পা এক পা করে তার দিকেই এগুতে থাকে।

নির্জীব গলায় যোগেন আবার বলে, 'তুমি যাও—'

বলে বটে, কিন্তু গলায় তেমন জোর পায় না যোগেন।

খুক খুক হাসে তিলি। বলে, 'আগেই তো কইছি, যাওয়ার জন্যে আসি নাই।'

যোগেন শেষ চেষ্টা করে, 'কেউ দেখে ফেলব—'

'কেউ দেখব না পুরুষ।'

তিলি বলতে থাকে, 'এই ঝড়, বষ্যায় (বর্ষা) পিরথিমীর কেউ বাইর হয় না। ভগমান এই দিনটা খালি আমার জন্যেই বানাইছে। হ গো পুরুষ—'

তিলির ঠোঁট দুটো চিরে আরো কয়েকটা দাঁত বেরিয়ে পড়ে। বুঝি বা তিলি হাসছে।

তিলি আদৌ হাসছে কী ?

যোগেন ঠিক বুঝতে পারে না। তার সমস্ত চেতনা যেন হারিয়ে যাচ্ছে।

চৌত্রিশ

যোগেন আর তিলির পিছনে একসঙ্গে গাঁথা একটা অতীত আছে।

এই সেটেলমেণ্টের কারো সঙ্গেই কোন সম্পর্ক নেই যোগেনের। তবু সবাই তাকে জামাই ডাকে।

একসঙ্গে থাকতে হ'লে একটা কিছু সম্বন্ধ পাতিয়ে নিতেই হয়। কেউ হয় খুড়ী, কেউ তালুই, কেউ মাউই, কেউ জেঠা। যোগেন হয়েছে জামাই।

সেটেলমেণ্টের আর কারো সঙ্গে থাক আর নাই থাক, অনেক দিন, সেই দেশভাগের আগে থেকেই তিলি আর যোগেনের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম, গোপন সম্পর্ক আছে। দুজনের মধ্যে স্পষ্ট, পরিষ্কার একটা বোঝাপড়া আছে।

ঢাকা জেলার বাজিতপুর গ্রাম হ'ল তিলির শ্বশুরের ঘর। সেই গ্রামেরই নাপিত বাড়ির ঘর জামাই যোগেন।

তিলি যে গ্রামের বউ, সেই গ্রামেরই জামাই যোগেন। এমনিতেই দুজনের মধ্যে রসের সম্পর্ক।

যোগেনের বউ নিমি যেদিন মরল, আর তিলির উপর রুগ্ন, অস্থি-সার, খিটখিটে হরিপদর সন্দেহ আর খিটির খিটির যেদিন থেকে

শুরু হ'ল, সেদিন থেকেই তুজনের সম্পর্কটা শুধু রসেরই রইল না। অন্য কিছুরও হ'ল।

নতুন সম্পর্কটা টের পেতে অনেক দিন লেগেছিল তু জনের।

পাশাপাশি বাড়ি। মাঝখানে একটা ভদ্রাসন।

যখন তখন যোগেন আসত তিলিদের বাড়ি। তিলি যেত যোগেনদের বাড়ি। গ্রাম দেশে এই যাওয়া আসা কেউ কু চোখে ছাখে না। সোজা, সহজ মানুষ সব। মন কু না হ'লে কি চোখ কু হয়?

যোগেন ঘর জামাই।

ঘরের কোন কাজেই সে আসে না। নিয়ম করে তু বেলা গেলা ছাড়া তার অন্য কাজ নেই। এই শর্তেই নাপিতরা যোগেনকে ঘর জামাই করে এনেছিল।

দিনরাত যোগেনের অফুরন্ত ফুরসত।

যতদিন বউ বেঁচে ছিল, ততদিন তবু কিছু সময় ঘরে কাটাত যোগেন। কিন্তু বউ যেই মরল, মনও উড়ু উড়ু, উদাস হ'ল। ঘরে আর মন বশ খায় না। ঘুরে ঘুরেই সে কিসের টানে যেন তিলির কাছে আসে।

তিলির হয়েছে মরণ!

নিত্য দিন হাঁপির টানে ভোগে হরিপদ, তা যেন তিলির দোষ। দিনে দিনে হরিপদ আরো রোগা, আরো কাহিল হয়ে পড়ছে, তাও তিলির দোষ। হরিপদর চোখের সামনে দেখতে দেখতে তিলি প্রচুর স্বাস্থ্যে ভরে উঠছে, তাও তিলিরই দোষ।

হরিপদ তামাকের ব্যাপার করে।

তামাক বিকিকিনি করতে হাটে যায়। যতক্ষণ সে হাটে থাকে ততক্ষণই তিলির যা একটু সোয়াস্তি, যা একটু শান্তি।

না হ'লে তিলির জীবনে সুখ নেই, শান্তি নেই।

যতক্ষণ হরিপদ বাড়িতে থাকে, খিটির খিটির করে, 'মাগী এত ফোলে ক্যামনে? কী খেয়ে ফোলে? কী সুখে ফোলে? ভগমান তুমি কি আন্ধা (অন্ধ) হইলা? আমারে শুকাইয়া মাগীরে ফুলাও!'

খিটির খিটির করাটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে হরিপদর।

মুখ বুঁজে সব সয়ে যায় তিলি।

হাজার হোক, মানুষ তো! মানুষের দেহ, মানুষের মনই তো! কত আর সয়! কত সওয়া যায়!

দিবারাত্রি সংসারের কাজ করছে। হরিপদর রোগের সেবা করছে। হরিপদ তামাক বেচতে যাবে, তার ব্যবস্থা করছে। গতরকে গতর মানছে না তিলি। তবু হরিপদর খিটির খিটির কমে না। উঠতে বসতে তার খালি সন্দেহ আর সন্দেহ। যোগেন আসে, সুবল আসে, গোকুল আসে। হাজারটা মানুষ আসে। গ্রামের যে-ই আসুক না, তাদের সঙ্গে তিলিকে জড়িয়ে দিনরাত সন্দেহই করছে সে।

হরিপদ বলে, 'ওরা ক্যান আসে, আমি জানি। সগল জানি। তুই ক্যান দিন দিন ফুলিস, তাও জানি। কিছুই জানতে বুঝতে বাকী নাই।'

'জান তো ভাল। মোন্দ কথা ভাবতে তোমার যত সুখ!'

তিলি রুখে উঠত।

তিলিকে সন্দেহ করাটা স্বভাব হয়ে উঠল হরিপদর। তার ব্যারামটার সঙ্গে সন্দেহ বাতিকটাও পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল।

এমনিতে তিলি হাসিখুশি, প্রাণের প্রাচুর্যে ঠাসা। সব সময় রঙ্গরসে মেতে থাকে।

তিলির প্রাণশক্তি এত প্রচুর, এত অপর্যাপ্ত যে হরিপদর এত সন্দেহ, এত খিটির খিটিরের পরেও সে উজ্জ্বল, সরস, তাজা হয়ে থাকতে পারে।

এমন যে তিলি, এক একদিন বেজার মুখে চুপচাপ বসে থাকে। গালে হাত দিয়ে আকাশে চোখ রেখে কি যেন ভাবে।

হরিপদ হয় তো হাটে গিয়েছে কি বাড়িতে নেই। এদিক সেদিক দেখে তিলির কাছে আসে যোগেন। (হরিপদ থাকলে যোগেন তার বাড়ি ঢোকে না। হরিপদ যে তিলির সঙ্গে তার মাখামাখি পছন্দ করে না, এটুকু যোগেন বুঝে নিয়েছে।)

যোগেন ডাকে, 'বউ—'

'আগো জামাই তুমি, তুমি ? আমি ভাবলাম কে না কে !'

অল্প একটু হাসে তিলি।

'হরিপদ দাদায় নাই ?'

'তারে বুঝি খুব ডর ?'

'না, ডর ঠিক না—তবে—'

বলতে বলতে থেমে যায় যোগেন।

একটু চুপচাপ। তার পর তিলিই শুরু করে, 'বস, তোমার লগে (সঙ্গে) কথা আছে।'

'তিলির পাশ ঘেঁষে বসে যোগেন। বলে, 'কও।'

আকাশের দিকে চোখ রেখে কি একটু যেন ভাবে তিলি। তারপর হঠাৎ আকুল হয়ে বলে, 'আচ্ছা জামাই—'

বলেই থেমে যায়।

'কও, যা কইতে চাও—'

'আচ্ছা জামাই, সারাটা জনম কি আমি দুঃখুই পামু ? কপালে দুঃখুর লিখা নিয়াই কি আমি জন্মাইছিলাম ?'

তিলির প্রশ্নের জবাব যোগেনের জানা নেই। বিমূঢ় মুখে তিলির দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

দু হাতে যোগেনকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে তিলি আবার বলে, 'কও জামাই কও, আর কদ্দিন আমি দুঃখু পামু ?'

যোগেন কিছুটা আন্দাজ করেছিল। আস্তে আস্তে সে বলল,

'নিজেগো (নিজেদের) ব্যাপার! বনিবনা করে নাও। যত মন কষাকষি হইব, দুঃখু খালি বাড়বই বউ। তত্তই দুঃখু পাইবা।'

'ও—'

একটি মাত্র শব্দ করে চুপ করে যেত তিলি।

তিলির মুখের দিকে তাকিয়ে যোগেনের মুখে আর কথা জোগাত না।

হরিপদ আর তিলির মধ্যে যে বনিবনা নেই, মিল নেই, মোটামুটি এই কথাটা বুঝতে দেরী হয় নি যোগেনের। তিলির বিষণ্ণ, উদাস চেহারাই সে কথা বলে দিয়েছে।

কিন্তু এ ব্যাপারে কীই বা করতে পারে যোগেন?

সে নিরুপায়। মুখ বুঁজে চুপচাপ তিলির দুঃখের কথা শোনা ছাড়া তার কিছুই করার নেই।

এক একদিন দুঃখটা যখন অসহ্য হয়ে উঠত, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তিলি কাঁদত। বলত, 'আর পারি না, আর পারি না জামাই। দিন রাইত উঠতে বসতে খালি সন্দ আর সন্দ।'

'ধৈয্য ধর, ধৈয্য ধর বউ।'

যোগেন তাকে বোঝাত।

'আর কত ধৈয্য ধরুম?'

'মনেরে বুঝ মানাও বউ।'

'আর কত বুঝ মানামু?'

এর পর আর কথা খুঁজে পেত না যোগেন।

কথায় বলে বনের বাঘে খায় না, খায় মনের বাঘে। হরিপদর হয়েছে সেই দশা। তার মনে সেই যে সন্দেহ বাতিকটা জন্মেছে, তা আর ঘোচে না। দিন দিন বাড়তেই থাকে।

হরিপদর মনে যে বাঘটা ছিল সেটাই একদিন খেল। হরিপদকে তো আর খেল না, খেল তিলিকে।

হরিপদর সন্দেহই একটু একটু করে তিলিকে যোগেনের দিকে এগিয়ে দিল।

বাজিতপুর গ্রামে এমন একটা মানুষ নেই, যাকে মনের কথা বলে তিলি জুড়াতে পারে। এক আছে ঐ যোগেন।

এদিকে মেয়ে মরেছে তো জামাইর আদরও ঘুচেছে! দু বেলা দু পেট ভাত গিলতে শাশুড়ীর গঞ্জনা সইতে হয়। শ্বশুর দিনরাত ক্যাট ক্যাট করে। চোখ মুখ বুঁজে খাবার সময় শ্বশুর বাড়ি ঢোকে যোগেন। নইলে সারাটা দিন কোথায় কোথায় যে ঘুরে বেড়ায়, কে বলবে।

সোয়ামীর দেওয়া গঞ্জনা সয় তিলি। শাশুড়ীর দেওয়া ভাতের খোঁটা সইতে হয় যোগেনকে। তিলি আর যোগেন—দু জনের দুঃখের মধ্যে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম মিল আছে।

একদিন খাওয়া হ'ল না যোগেনের। ঘর জামাইর চামড়া যতই পুরু হোক, খিদের মুখে ভাতের খোঁটাটা বড় বিঁধল।

শ্বশুর বলেছিল, 'লবাবের ছাও, একখান কুটা নাড় না। এক খান কাম কর না। দুই বেলা পাত সাজাইতে সরম লাগে না?'

শাশুড়ী ঘোমটার ফাঁকে নথপরা নাক নেড়ে বলেছিল, 'সরম নাই গো, সরম নাই। আমরা হইলে অমুন গু মুত গিলতে পারতাম না। গলায় দড়ি দিতাম।'

সামনের ভাত ফেলে উঠে গিয়েছিল যোগেন।

তারও জুড়াবার একটা জায়গাই আছে এই গ্রামে। সরাসরি সেইখানেই চলে এসেছিল সে।

উঠানে পা দিয়েই চমকে উঠল যোগেন।

বারান্দায় একটা খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে আছে তিলি। চুল উড়ে উড়ে মুখের উপর এসে পড়েছে। চোখ দুটো পাকা করমচার

মত লাল। সেই লাল চোখ ফেটে টপ টপ করে লোনা জল ঝরছে।

চোখ দুটো ফুলে উঠেছে। দেখেই বোঝা যায়, অনেকক্ষণ ধরে তিলি কাঁদছে।

কাছে এগিয়ে এসে যোগেন ডেকেছিল, 'বউ—'

'জামাই, তুমি আসছ! সেই বিহান (সকাল) থিকা তোমার কথাই ভাবতে আছিলাম।'

উঠে এসে যোগেনের দু হাত চেপে ধরল তিলি।

তিলির চোখের দিকে তাকিয়ে ভয়-ভয় গলায় যোগেন বলল, 'কী হইছে রে বউ, অমুন কান্দিস (কাঁদিস) ?'

'সাধে কি কান্দি (কাঁদি) ? কপালে কান্দায়।'

অতি দুঃখে হাসে তিলি। বলে, 'সোয়ামী আজ ঘরের বাইর করে দিল। বলল, 'মাগী তোর মন যেখানে যাইতে চায়, সেইখানে যা।' সোয়ামী আমারে লষ্ট, দুষ্ট, কুচরিত্তির কইল। আর পারি না জামাই, আর পারি না।'

বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল যোগেন। নিজের দুঃখ জুড়াবার জন্য তিলির কাছে এসেছিল সে। নিজের কথা আর বলা হ'ল না।

তিলি অস্থির, আকুল হয়ে উঠেছে। কাঁদছে আর বলছে, 'অনেকদিন ভাবছি, কিন্তুক আমি ঘরের বউ। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। আজ আর পারুম না। পিরথিমী জানব, আমার মনে পাপ আছে। আমি মোন্দ, লষ্ট। যার মনে যা আছে, তাই ভাবুক। তুমি আমারে বাঁচাও পুরুষ, আমারে বাঁচাও।'

'কেমনে ?'

যোগেনের গলা কেঁপে উঠেছিল।

'পুরুষ যেমনে মেয়ে মানুষেরে বাঁচায়!'

একটু থামল তিলি। একটু কি যেন ভাবল। বলল, 'তুমি আমারে কোথাও নিয়া চল জামাই।'

স্থির, শান্ত গলায় যোগেন বলেছিল, 'যামু।'

'চল, অখনই যাই। এই পুরীতে এক দণ্ডও আমার থাকতে সাধ নাই।'

'অখন না, আজ না, কাল না। যেদিন বুঝুম, পিরথিমীর কোথাও তোমায় আশ্চয় (আশ্রয়) নাই, হরিপদ দাদায় সত্যসত্যই তোমারে আর চায় না, সেই দিন তোমারে নিয়া যামু।'

'সত্য ?'

'সত্য। তোমারে ছুঁয়ে কই (বলি)।'

তারপরও অনেকগুলো দিন পার হ'ল।

একদিন দেশভাগ হ'ল। ভাসতে ভাসতে তিলিরা কলকাতায় এল। তিলিদের সঙ্গে সঙ্গে যোগেনও কলকাতায় এল। হরিপদ ব্যারামী মানুষ। মনে তার যাই থাক, বিপদের দিনে যোগেনকে পেয়ে সে যেন বাঁচল, ভরসা পেল।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, রিফুজী ক্যাম্পে কয়েক বছর কাটিয়ে এখন তারা বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে এসেছে।

যোগেন আর তিলির পিছনের অতীতটা মোটামুটি এইরকম

পঁয়ত্রিশ

এ বৃষ্টি যেন কোনদিন শেষ হবে না।

বাইরে সীসারঙ আকাশটা কালো হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির সঙ্গে যুঝে যুঝে এই দ্বীপ দিনের কাছ থেকে যেটুকু আলো পেয়েছিল, সন্ধ্যা এসে তাকে মুছে দিতে শুরু করেছে।

মড় মড় শব্দে বাইরে গাছ ভাঙছে। যোগেনের ঘরের ঠিক পিছনেই ঝুপ ঝাপ আওয়াজ হচ্ছে। কিলপঙ নদী দুর্জয় বেগে মাটি ভাঙছে। বিরাট বিরাট চাঙাড় ধ্বসে পড়ছে।

একটানা বৃষ্টির শব্দ, মাটি ধ্বসার শব্দ, ক্ষ্যাপা নদীর শব্দ, উন্মাদ বাতাসের শব্দ, গাছ ভাঙার শব্দ—সব মিলিয়ে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপটা সৃষ্টির সেই আদিম দুর্যোগে ফিরে গিয়েছে।

ঝাঁপটা খোলা রয়েছে।

তীব্র, ধারাল রেখায় ঘরের ভিতরে বৃষ্টি আসছে।

কারো হুঁশ নেই। তিলিরও না, যোগেনেরও না।

পিছু হটতে হটতে বাঁশের মাচানে গিয়ে ঠেকেছে যোগেন। হটবার আর জায়গা নেই।

তিলি যোগেনের একটা হাত ধরে ফেলেছে। তার চোখের তারায় হাসি ঝিলিক দিল। ফিস ফিস করে সে বলল, 'এইবার পুরুষ ?'

ভীরু, অসহায় গলায় যোগেন বলল, 'নিজের সব্বনাশ কইরো (করো) না তিলি। অখনও সময় আছে, ফিরে যাও।'

'নিজের কথা ভেবে কি মেয়েমানুষ ঘরের বাইর হয়!'

অদ্ভুত শব্দ করে হেসে উঠল তিলি। বলল, 'নিজের কথা ভাবি না পুরুষ। নিজের ভাবনা আমার ঘুচছে।'

'তবে কী ভাব তুমি?'

করুণ, নির্জীব গলায় বলল যোগেন।

'তোমার সব্বনাশ করুম। দিন রাইত এই কথাই ভাবি। বুঝলা?'

যোগেনের গায়ে আস্তে একটা ঠেলা দিল তিলি।

যোগেন জবাব দিল না।

তিলি বলতে লাগল, 'সোয়ামীর কাছে কোন দিন সুখ পাইলাম না। সোয়ামীর কাছে দুঃখু পেয়ে ফিরা ফিরা তোমার কাছে আসছি পুরুষ। তুমি ফিরাইয়া দিছ।'

'তোমার ভালর জন্যেই ফিরাইছি।'

তিলি হাসল। আস্তে আস্তে বলল, 'আ গো পুরুষ, মেয়ে মানুষের কিসে ভাল কিসে মোন্দ, তা কি তোমরা বোঝ? আমার ভাল-মোন্দ আমারেই বুঝতে দাও।'

একটু চুপচাপ।

বৃষ্টিতে নেয়ে এসেছিল তিলি। ভিজা কাপড় থেকে টপ টপ করে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরছে। চুল, চোখের ভুরু, মুখ—সব সপসপে হয়ে আছে। হাতের আঙুলগুলো সিঁটিয়ে গিয়েছে। বেশ শীত ধরেছে। হি হি করে কাঁপছে তিলি।

কাঁপতে কাঁপতেই তিলি বলল, 'খাড়ইয়া খাড়ইয়া (দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে) কী ছাখ পুরুষ? আমি এইদিকে শীতের কাঁপে মরি। একখান কাপড় দাও।'

টিনের ছোট একটা বাক্স থেকে শুকনা একটা কাপড় বার করে তিলির হাতে দিল যোগেন।

তিলি বলল, 'হাঁ করে তাকাইয়া ছাখ কী? যত বলদ বোকা নিয়া আমার কারবার। ড্যাবা ড্যাবা চোখে আমার দিকে তাকাইয়া থাক! সরম নাই। আমার দিকে পিছন দিয়া খাড়াও (দাঁড়াও)।'

অগত্যা তাই করতে হ'ল। তিলির দিকে পিছন দিয়ে ডান দিকের বেড়ায় চোখ রাখল যোগেন।

একা মানুষ যোগেন। তার একাকে নিয়েই একটা সংসার। ঘরে মেয়ে মানুষ নেই যে তিলি ভিজে এলে শাড়ি জোগাবে। নিজের একখানা ধুতিই দিয়েছে সে। ক্ষিপ্র হাতে ভিজা শাড়ি বদলে শুকনা ধুতি পরে ফেলেছে তিলি। ভিজা শাড়িটা নিঙড়ে সারা শরীর মুছেছে।

তিলি বলল, 'এইবার মুখ ফিরাও পুরুষ।'

যোগেন ঘুরে দাঁড়াল।

তিলি এবার এক কাণ্ডই করল। আস্তে আস্তে যোগেনের কাছে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল। বলল, 'বার বার তুমি ফিরাইয়া দিছ। এইবার আর পারবা না।'

যোগেন জবাব দিল না।

যোগেনের বুকে একটা হাত রেখে ফিস ফিস করে তিলি বলল, 'ডর লাগে পুরুষ?'

'হুঁ।'

অস্ফুট শব্দ করল যোগেন।

'ডর আর সরম-ভরমের মাথা না খাইলে কি আমারে পাইবা?'

যোগেন চুপ করে রইল।

ক্ষ্যাপা বাতাস বৃষ্টির ছাঁটকে ঘরের ভিতর নিয়ে আসছে।

এতক্ষণে তিলির হুঁশ হ'ল। সে বলল, 'ইস্ ঘর একেবার ভিজা গেল।'

ছুটে গিয়ে কঁ্যাচা বাঁশের ঝাঁপটা বন্ধ করে দিল তিলি।

একটানা বৃষ্টি বঙ্গোপসাগরের এই উলঙ্গ, বর্বর দ্বীপটাকে, শুধু কি দ্বীপটাকেই, যোগেনের এই ছোট্ট বেতপাতার ঘরটাকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

বাইরে এই দ্বীপটা যখন অন্ধ, আদিম দুর্যোগে মেতে উঠেছে, তখন ঘরের ভিতর যোগেন আর নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না।

বার বার এসেছে তিলি। বার বার তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে যোগেন। কিন্তু আজ আর তাকে ফেরানো গেল না।

আন্দামানের বর্ষা শুধু মাটিকেই না, জীবনকেও বুঝি সরস এবং উর্বর করে তোলে।

ছত্রিশ

বর্ষার আগে আগেই সিপি তোলার মরশুম শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সিপি তোলা শেষ হ'ল বলেই কি কাজ শেষ হ'ল? কাজ শেষ হতে হতে আবার মরশুম শুরু হয়ে যাবে।

সমুদ্র থেকে যে সিপিগুলি তোলা হ'ল, এবার তাদের সাফ করার পালা। এ্যাসিড দিয়ে তাদের উপরকার চুন এবং নুন পরিষ্কার করতে হবে।

সিপি সাফ করার পর তাদের বাছতে হবে। যেগুলি কুলীন জাতের সিপি, যেমন টার্বো, ট্রোকাস, নটিলাস, বাজারে যাদের চড়া দর সেগুলোকে কাঠের বাক্সে বোঝাই করা হবে। জাহাজে উঠে তারা যাবে কলকাতা, মাদ্রাজ। কলকাতা মাদ্রাজ থেকে আবার জাহাজে উঠবে।

আন্দামান সমুদ্রের সিপি পৃথিবীর কোথায় কোথায় যে চলে যাবে, অত খবর পানিকর রাখে না। এজেন্টের কাছে বেচে দিয়েই সে খালাস।

ফ্রগ শেল, নী-ক্লাম—বাজারে যে সিপিদের দর কানাকড়িও না, সেগুলি বিলিয়ে বিলিয়ে ফুরিয়ে ফেলবে পানিকর।

এখন সিপি সাফ করার কাজ চলছে।

একটানা বিশ দিন বৃষ্টির পর আকাশটা দিন দুই চুপচাপ রইল। থমথমে চেহারা দেখে মনে হ'ল, আকাশটা একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। যখন আবার শুরু করবে, এই দ্বীপ রেহাই পাবে না।

এর মধ্যেই ফাঁক বুঝে মায়া বন্দর থেকে ডিগলিপুরের সেটেলমেণ্টে এসে উঠল পানিকর। এরিয়াল উপসাগরের পার থেকে পুরা ছ মাইল টিলা-জঙ্গল ভেঙে, থকথকে কাদা আর জোঁকের সঙ্গে লড়তে লড়তে এসেছে সে।

কাঁটা আর গোঁজের খোঁচা খেয়ে খাবলা খাবলা মাংস উঠে গিয়েছে। সমস্ত শরীর রক্তারক্তি। কাদা আর জোঁকে মাখামাখি। যা হাল হয়েছে পানিকরের! দেখে দুঃখও হয়, হাসিও পায়।

বারান্দায় বাঁশের পাটাতনে বসে চাল বাছছিল কাপাসী। পিঠটা উদাম, কাপড় সরে গিয়েছে। ঘাড় আর গলার কাছে রাশি রাশি রুক্ষ, তেলহীন চুল ছড়িয়ে রয়েছে। মুখটা ঠিকমত দেখা যায় না। চুলে ঢাকা পড়েছে। পালকের মত সরু, কালো একটু ভুরু চোখে পড়ে।

শাড়ির লাল জমিতে চৌকা চৌকা সবুজ খোপ কাটা। শাড়িটা কাপাসীর সুঠাম, চিকন কোমরে কি বশই না মেনেছে!

এখন দুপুর।

আকাশ থেকে মেঘভাঙা রুপালী রোদ এসে কাপাসীর গায়ে পড়েছে। উদাম পিঠ, রুক্ষ চুল, হাত, পাখির পালকের মত সরু ভুরু—সব চকচক করছে।

কাপাসীকে কেমন যেন দুর্বোধ্য দেখায়। শুধু দুর্বোধ্যই না, একটানা বিশ দিন বৃষ্টির পর দুপুরের মেঘভাঙা রুপালী রোদে অবিশ্বাস্য, অবাস্তব মনে হয়।

টিলা বেয়ে উপর দিকে উঠতে উঠতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল পানিকর। কাপাসীর চুল-হাত-পিঠই শুধু না, পানিকরের চোখ দুটোও চক চক করছিল।

পানিকর যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশেই একটা চুগলুম গাছ। চুগলুমের পুরু পুরু বিরাট পাতায় বৃষ্টির জল আটকে ছিল। রোদ সেই জলকে পুরাপুরি শুষে নিতে পারে নি। বাকী যেটুকু আছে বাতাসের ঝাঁকানি খেয়ে ঝুপ ঝুপ করে পানিকরের গায়ে ঝরে পড়ল। তবু তার হুঁশ নেই।

একদৃষ্টে কাপাসীর দিকে চেয়ে আছে পানিকর। চোখদুটো শুধু চকচকই করছে না, অস্বাভাবিক জ্বলছে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপাসীর উদাম পিঠটা দেখল পানিকর। তারপর একসময় টিলা বেয়ে উপরে উঠে এল। আস্তে আস্তে ডাকল, 'কাপাসী—'

'কে ?'

কাপাসী চমকে উঠল।

'আমি—আমি পানিকর—'

শাড়ির আঁচল দিয়ে পিঠটা ঢাকতে ঢাকতে কাপাসী বলল, 'পানিকর ভাই, আপনে আসছেন! আসেন আসেন।'

বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল পানিকর। তার সারা দেহ কাদা, রক্ত আর জোঁকে মাখামাখি। মূর্তি যা খুলেছে!

পানিকরের কিম্ভূত চেহারার দিকে চেয়ে মুখে কাপড় ঠেসে কাপাসী হাসে। পুরা হাসিটা বেরোয় না। কাপড়ের ফাঁক দিয়ে কিছুটা বেরোয়। বাকীটা মুখের ভিতর উথলে উথলে উঠতে থাকে। গুজ গুজ শব্দ হয়। আটকানো হাসির দমকে কাপাসীর শরীরটা থরথরিয়ে কাঁপে।

বোকার মত পানিকরও একটু হাসে।

কাপাসী বলে, 'কি হাল হইছে পানিকর ভাই!'

পানিকর যেন কৈফিয়ৎ দিতে শুরু করে, 'কি করব! বারিশে (বৃষ্টিতে) মাটি গলে আছে। পা ফেললেই কোমর পর্যন্ত গেঁড়ে

যায়। যা জোঁক! কাঁটার খোঁচা খেতে খেতে চামড়া ছিঁড়ে গোস্ত আউর খুন বেরিয়ে পড়েছে।'

পানিকর আর কাপাসীর হাসাহাসি, কথা কওয়া-কওয়ির মধ্যেই নিত্য ঢালী এসে পড়ে।

বিশ দিন পর বৃষ্টি ধরেছে।

সকালে উঠেই একটা ঝাঁকি জাল নিয়ে ডিগলিপুরের খালে গিয়েছিল নিত্য ঢালী। ডুলা বোঝাই করে পার্শে, তারিণী, লাল ভেটকি আর মায়া—নোনা জলের মিঠে মাছ মেরে এনেছে।

পানিকরকে দেখেই মাছ আর জাল উঠানে নামিয়ে রাখল নিত্য। ছুটতে ছুটতে তার সামনে এল। বলল, 'কখন আসলেন পানিকর বাবা ?'

'এই তো এলাম চাচা—'

পানিকর আগে আগে নিত্য ঢালীকে নিত্য বুড়ঢা ডাকত। আজকাল চাচা সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছে।

নিত্য ঢালী আবার বলল, 'বিহানে (সকালে) উঠে মাছ মারতে বাইর হইছিলাম। বুঝলেন নি বাবা, বড় বাহারের মাছ। আজ না খাইয়া যাইতে পারবেন না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা—'

পানিকর হাসল।

মেয়ের দিকে ঘুরে নিত্য বলল, 'পানিকর বাবায় খাইব। লাল ভেটকির পাতরি, আর পার্শে মাছ দিয়া সরষের ঝাল পাক করিস (রাঁধিস) কাপাসী। বাহারের করে পাক করবি। এক ফির খাইলে যেন পানিকর বাবায় ভুলতে না পারে।'

কাপাসী মুখে কিছু বলল না। মাথা ঝাঁকাল। তারপর কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠানের যেখানে জাল আর মাছ রেখেছে নিত্য, আস্তে আস্তে সেদিকে চলে গেল।

এবার পানিকরকে তাড়া লাগাল নিত্য ঢালী, 'চলেন, চলেন বাবা, গা-হাত-পা ধুইতে চলেন।'

কিলপঙ নদী থেকে একেবারে নেয়ে ঘরে ফিরল দুজনে।

নিত্য ঢালীর দেওয়া একটা শুকনা কাপড় কোমরে জড়িয়ে জুত করে বাঁশের মাচানে বসল পানিকর। নিত্যও মুখোমুখি বসল।

পানিকর বলল, 'ক'দিন কি বারিশই (বৃষ্টিই) না হ'ল!'

'যা কইছেন বাবা, আমাগোও (আমাদেরও) জলের ত্রাশ। সেই মাতানি নদী, তার পারে ঘর। কিন্তুক এমুন বিষ্টি বাপের জম্মে দেখি নাই।'

পায়ের বুড়ো আঙুল নাচাতে নাচাতে অল্প অল্প হাসে পানিকর। বলে, 'এ আর কি বারিশ! আন্দামানের বারিশ বহুত বেতর্বিয়ৎ। যখন মেজাজ হবে, একটানা দু মাস চলবে তো চলবেই।'

'ক'ন (বলেন) কী বাবা?'

'সচ্ই বলি। সবে তো এসেছ। আমার কথা সচ্ কি ঝুট, নিজের আঁখেই দেখবে। যাচাই করে নেবে।'

একটু চুপচাপ।

পানিকরই আবার শুরু করল, 'আজ বারিশ থেমেছে। সকালে উঠে তোমার কথা মনে পড়ল চাচা। আর দেরি করলাম না। সিধা চলে এলাম।'

'ভাল করছেন বাবা, খুব ভাল কাম করছেন। বড় আনন্দ দিলেন। বড় আনন্দ পাইলাম। আমার কথা যে ভোলেন নাই, কি সুভাগ্যি!'

খুশিতে নিত্য ঢালীর রুক্ষ, খসখসে মুখটা টস টস করে। সে বলতে থাকে, 'কয়দিন আপনের দেখা নাই। দেখা হইব কেমনে! যা বিষ্টি! যাউক সে কথা। যা কই (বলি), মনে মনে এই কয়দিন আপনের কথাই ভাবতে ছিলাম।'

'বহুত তাজ্জবের বাত!'

অবাক হয়ে একটুক্ষণ নিত্য ঢালীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল পানিকর। তারপর বলল, 'আমিও যে তোমার কথাই ভাবছিলাম চাচা—'

'ক্যান বাবা

পাছা ঘষটাতে ঘষটাতে পানিকরের কাছে ঘন হয়ে এল নিত্য ঢালী। বলল, 'কিছু কাম আছে বাবা?'

'হাঁ হাঁ, অনেক দরকারী কাম চাচা।'

'তো ক'ন (বলুন)।'

ঘরের ঝাঁপটা খোলা।

আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া, টুকরা টুকরা, সীসারঙের মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। মেঘের সঙ্গে যুঝে যুঝে এতক্ষণ রোদ আসছিল। এখন সূর্যটা ঢাকা পড়েছে।

একটা নিরন্ত ছায়ার পর্দা উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপটাকে ছেয়ে ফেলেছে। অনেক দূরে একটা উঁচু টিলা। টিলার উপর বিরাট একটা গর্জন গাছ। গাছটার মাথায় ধোঁয়ার মত সাদা সাদা কি যেন জমেছে। আকাশ, টিলা, গাছ, মেঘ—সবই দেখা যায় কিন্তু অস্পষ্ট, নিস্তেজ আলোতে মনে হয়, তাদের আরো কিছু মানে আছে। মানেটা যে কি, ঠিক বোঝা যায় না। মনে হয়, তারা শুধু গাছ না, পাহাড় না, টিলা না, আকাশ না। সব মিলিয়ে পরম দুর্জ্ঞেয় একটা কিছু। ঠিক যে কি, তা নিয়ে নিত্য ঢালী বা পানিকরের মাথাব্যথা নেই।

বাইরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল পানিকর। কি একটু যেন ভেবে নিল। তারপর শুরু করল, 'ছাখো চাচা, কামে ঠিক সুবিধে হচ্ছে না। একা লা তে'কে দিয়ে হবে না। ভাবছি—'

'কী ভাবেন বাবা?'

'ভাবছি, তোমাকে মায়া বন্দর নিয়ে যাব।'

মায়া বন্দর যাবার নাম শুনে নিত্য ঢালী দমে গেল। একটা ঢোঁক গিলে বলল, 'কিন্তুক পানিকর বাবা—'

তীব্র, ধারাল চোখে নিত্য ঢালীর মুখচোখ, ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করতে লাগল পানিকর। আস্তে আস্তে বলল, 'লেকিন কী চাচা?'

'আমি গেলে চলব কেমনে? কাপাসীরে কার কাছে রেখে যামু? কে এমন বান্ধব আছে, কাপাসীরে দেখব? না না, কেউ নাই।'

একটু থামে নিত্য। টেনে টেনে শ্বাস নেয়। ভোতা, খ্যাস-খেসে গলায় বলতে থাকে, 'শত্তুর, চারপাশে যে মুখ ছাখেন, সেই মুখই আমার শত্তুরের মুখ। শত্তুর পুরীর মধ্যে মেয়েরে রেখে আমি মরতেও পারুম না পানিকর বাবা।'

'তবে—'

চোখ কুঁচকে, কপালে ভাঁজ ফেলে একটুক্ষণ বসে থাকে পানিকর। আবার বলে, 'তবে কী হবে চাচা? লা তে তো একা একা এত সিপি সাফ করতে পারবে না। 'সীজন' (মরশুম) ধরতে না পারলে খাব কী? সিপি চালান দিতে না পারলে—'

বলতে বলতে সে থেমে যায়।

খানিকটা চুপচাপ।

হঠাৎ নিত্য ঢালী বলে, 'একটা কাম করলে কেমুন হয় পানিকর বাবা?'

'কী কাম?'

'সিপিগুলান যদি আমার বাড়িতে আনেন। আপনে, লা তে, কাপাসী আর আমি চারজনে মিলে সাফ করতে পারি।'

উপরের পাটির দাঁত নীচের পুরু কালো ঠোঁটে গিঁথে ভুরু ছুটো অল্প একটু কুঁচকে পানিকর বলে, 'তা হ'লে তো ভালই হয়। লেকিন ছুটো কথা—'

'আবার কী কথা? কথা তো হইয়াই গেল। কালই আপনে সিপি নিয়া আমার এইখানে আসেন।'

'আগে আমার কথাটাই শোন চাচা। সিপি এখানে থাকলে তো আমাদেরও এখানে থাকতে হবে। না হ'লে রোজ মায়া বন্দর থেকে ডিগলিপুরে আসার বহুত ঝামেলা। এরিয়াল বে থেকে ছ মাইল জঙ্গল ভেঙে এখানে আসতে হয়। বড় তখলিফ—'

'হ হ, সে কথা কইতে হইব না কি? আমি জানি না? জঙ্গলের মধ্য দিয়া আসতে যে কত কষ্ট, রোজই টের পাই।'

নিত্য ঢালী থামে না। এক দমে বলে যায়, 'যাওন আসনের কাম নাই। আপনেরা এইখানেই থাকবেন।'

'লেকিন—'

পানিকরের দ্বিধা ভাবটা কিছুতেই আর ঘুচতে চায় না।

'আবার কী হইল বাবা?'

'রিফুজী কলোনীর কেউ যদি কিছু বলে? আমরা তো তোমাদের মুলুকের আদমী না। আমরা—'

এমনিতে নিরীহ, শান্ত মানুষ নিত্য ঢালী। হঠাৎ কি হ'ল সে ক্ষেপে উঠল, 'কোন শালায় কী কইব? কারো কওনের (বলার) তোয়াক্কা করি? কেউ দুই পয়সা দিছে? কেউ এক বেলা খাওয়াইছে যে কারো কথার ধার ধরুম? আমার ঘর, আমার বাড়ি, যারে খুশি তারে রাখুম। কোন শালায় কথা কইতে আসব!'

দু হাত ধরে নিত্যকে শান্ত করল পানিকর। বলল, 'ঠিক আছে চাচা, ঠিক আছে। চটাচটি ক'রো না। আমি সিপি আউর লা তে'কে নিয়ে কালই আসব।'

'হ হ, কাইলই আসবেন। যত তরাতরি (তাড়াতাড়ি) পারেন, আসবেন। কে কি কয়, একবার দেখুম।'

নিত্য ঢালীর উত্তেজনা কমে না। সমানে চিল্লাতেই থাকে সে।

নিত্য হঠাৎ কেন যে ক্ষেপে উঠল, পানিকর জানে না। না জানলেও তার লোকসান নেই।

বাঁইত্রিশ

তরিবত করে রেঁধেছে কাপাসী।

মায়া মাছ ভাজা, তারিণী মাছের রসা, সরষে দিয়ে লাল ভেটকি আর পার্শে মাছের টক।

নোনা জলের টাটকা, তাজা, মিঠে মাছ।

রাঁধার গুণে জলের মাছে এমন স্বাদ এমন গন্ধ খোলে, না খেলে কোন দিন কি জানতে পারত পানিকর!

পানিকররা নিজেরাই রান্নবান্না করে খায়। সিপি তুলতে তুলতে ফুরসত বুঝে মোটর বোট থামিয়ে উপসাগরের পারে ওঠে। তিন টুকরো ইঁট সাজিয়ে উনুন পেতে নেয়। ভাত ফোটায়, মাছ রাঁধে। আধা সিদ্ধ, আধা পোড়া, আধা কাঁচা, না তেল, না ঝাল, না ঠিকমত নুন—এমন এক বস্তু গিলে গিলে জিভ অসাড় হয়ে গিয়েছে।

আজ জবর খাওয়া খেয়েছে পানিকর।

খেয়ে আঁচিয়ে বারান্দার পাটাতনে পাশাপাশি বসেছে দু জনে। পানিকর আর নিত্য ঢালী।

পানিকর ঢেকুর তুলতে তুলতে বলে, 'বহুত খেয়েছি। একেবারে গলা পর্যন্ত ঠাসা। তোমার মেয়ে আচ্ছা পাকায় (রাঁধে) চাচা।'

'এই কি আর খাইলেন পানিকর বাবা, থাকত সেই ছ্যাশ, যাইতেন আমার বাড়ি, বুঝতেন খাওয়া কারে কয়! সগলই কপালের লিখা বাবা—'

অল্প একটু হাসল নিত্য ঢালী। মুখটা বিষণ্ণ, করুণ, উদাস দেখাল। এই মুহূর্তে সে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপটিতে নেই। হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মাতানি নদীর পারে ঢালীদের ছোট্ট গ্রামটিতে চলে গিয়েছে।

অনেকটা সময় কাটল।

একসময় ফিস ফিস করে নিত্য ঢালী বলল, 'কিছুই রইল না সাহেব বাবা। ছ্যাশ গেল, ভিটা গেল, সাতপুরুষের সগল চিহ্ন গেল। সগল খুয়াইয়া এই দ্বীপি আসছি। কিছুই নাই। পথের ভিখারী হইয়া গেছি। থাকত সেই ছ্যাশ—'

গলাটা ভারী হয়ে বুঁজে গেল।

একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলল নিত্য ঢালী।

মৌসুমী বাতাসের তাড়া খেয়ে টুকরা টুকরা মেঘেরা পশ্চিম দিকে ফেরার হচ্ছে। আবার রোদ দেখা দিয়েছে। উজ্জ্বল, ধারাল, তেজী রোদ। মেঘভাঙা রোদ এমনিতেই বড় তীব্র। চোখে যেন বেঁধে।

এখন ঠিক বিকালও না, ছুপুরও না। ছুপুর আর বিকালের ঠিক মাঝামাঝি। রোদের তেজ মরে নি কিন্তু তাপ জুড়োচ্ছে। রং বদলাতে শুরু করেছে। একটু আগে গলা রুপোর মত ঝকঝকে রোদ ছিল। এখন তাতে হলদে আভা লেগেছে।

টিলা-জঙ্গল-পাহাড়-আকাশ—এখন সব কিছুই বড় স্পষ্ট, বড় তীক্ষ্ণ। একটু আগে আবছা আলোতে মনে হচ্ছিল, তাদের অন্য কোন মানে আছে। কিন্তু এখন, এই প্রখর রোদে তাদের চারপাশ থেকে সব রহস্য সরে গিয়েছে। মেঘম্লান অস্পষ্ট আকাশের নীচে তাদের অস্তিত্বকে ছাপিয়ে একটা ছুর্বোধ্য মানে হয়ত খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু তীব্র আলোতে এখন তারা নিতান্তই আকাশ, পাহাড়, টিলা এবং জঙ্গল। একেবারেই নগ্ন, নিরাবরণ, উলঙ্গ। এখন তাদের অন্য কোন মানে নেই।

পানিকর ডাকল, 'চাচা—'

'কী ক'ন (বলেন) বাবা ?'

নিত্য ঢালীর গলাটা এখনও ধরা-ধরা। এখনও মাতানি নদীর পারের সেই গ্রামটার কথা ভেবে মনটা ভারী হয়ে আছে তার।

পানিকর বলল, 'তুমি যে বলছিলে, আমার সাথ তোমার কী কাম আছে !'

'হ বাবা—'

খাকারি দিয়ে গলাটা সাফ করে নিল নিত্য ঢালী। আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল সে, 'চোখ টাটায়। সগলের পরাণ কচকচ করে। উই যে আপনে হুইটা পয়সা ছ্যান, আমি যে গতর খাটাইয়া হুইটা পয়সা ঘরে আনি, কারো তা সয় না।'

পানিকর কিছুটা বুঝে, কিছুটা না বুঝে মাথা ঝাঁকায়। মুখে কিছুই বলে না।

নিত্য ঢালী থামে না, 'পানিকর বাবা, বুঝলেন কিনা, চারপাশে আমার শত্তুর। তা না হইলে উই যে উজানী বুড়ী, হারাণের ঠাকুরমা, আমার বাড়িতে এসে আমার মেয়েরাই লষ্ট কয়, কুচরিত্তির কয় ! আমি জানি, সগলই আমার কানে আসে, আড়ালে আব-ডালে কাপাসীরে সগলেই কুচরিত্তির কয়। কিন্তুক ঈশ্বর জানে, ভগমান জানে, মেয়ে আমার খাঁটি সোনা। তার ভিতর এতটুক দাগ নাই, খাদ নাই।'

বলে আর হাউ হাউ করে কাঁদে নিত্য।

সেই যে সেদিন উজানী বুড়ী বাড়িতে এসে জাত-বংশ উদ্ধার করল, কাপাসীকে নষ্ট-হুষ্ট-কুচরিত্তির বলে গেল, বাপ হয়ে কিছুতেই তা সইতে পারছে না সে। হুঃখটা নিত্য ঢালীর প্রাণে বড় বেজেছে।

কাপাসী কি সাধ করে শরীর নষ্ট করেছে ? সে কথা কেউ না বুঝুক, নিত্য তো বোঝে। জীবনের সবচেয়ে মর্মান্তিক হুঃখের দামে সে কথা সে বুঝেছে।

কে হারাণ, কে উজানী বুড়ী, কে নষ্ট, কে কুচরিত্তির—কিছুই বোঝে না পানিকর। হাঁ করে নিত্য ঢালীর হাউ হাউ কান্নার বিচিত্র শব্দ শোনে।

নিত্য বলতেই থাকে, 'সগলে আমার মেয়েরে নিয়া পড়ছে। সে পাগল মানুষ। পাগল হইয়াও তার বাঁচনের জো নাই।'

পানিকর চমকে উঠল, 'পাগল, কে পাগল!'

'কাপাসী বাবা, আমার মেয়ে—'

'কাপাসী পাগল!'

'হ বাবা, এমনে বোঝনের উপায় নাই। ভাল মানুষ, থির ধীর। বুঝ-বুদ্ধি—সগলই আছে। কিন্তুক মাঝে মধ্যে কেমন হইয়া যায়। খালি হাসে।'

গাঢ়, মন্থর, দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলল নিত্য ঢালী। বিষণ্ণ, করুণ গলায় বলল, 'সেই হাসি শুনলে বুকের ভিতরটা কাঁপে পানিকর বাবা।'

এর আগেও বার দু তিন ডিগলিপুরের এই সেটেলমেন্টে নিত্য ঢালীর এই ঘরেই এসেছে পানিকর। কাপাসীর সঙ্গে তার জান পয়চান হয়েছে। কথাবার্তা হয়েছে। সহজ, সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষের মতই কাপাসী তার সঙ্গে কথা বলেছে। তার যে মাথা খারাপ, সে যে পাগল, একবারও এ সন্দেহ পানিকরের মনে আসে নি। কাপাসীর মুখেচোখে, কথায় বার্তায়, চলায় ফেরায় পাগলামির কোন লক্ষণই খুঁজে পায় নি সে।

রোদের রঙ এখন হলুদ। জঙ্গলের মাথা ঝিম মেরে আছে। সকালে যে পাখিরা সমুদ্রে গিয়েছিল, বিকালে তারা দ্বীপমুখী হতে শুরু করেছে। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপ, নিঝুম জঙ্গল, নিবু নিবু হলুদ রোদ, দ্বীপে ফেরা পাখির ঝাঁক—সব মিলিয়ে একটা শান্ত, উদাস সুর যেন সাধা হচ্ছে।

হঠাৎ তাল কেটে গেল।

উঠানের এক কিনারে পাকের ঘর। সেখান থেকে অবুঝ, অস্থির গলায় দমকে দমকে হেসে উঠল কাপাসী।

পানিকর চমকে উঠল।

নিত্য ঢালী বলল, 'শুনলেন তো বাবা! এই হাসন, এই হাসন আমি সইতে পারি না। আমার বুকের ভিতরটা কেমুন জানি করে। হা ভগমান—'

কপাল থাপড়াতে লাগল নিত্য। বলতে লাগল, 'সগলই আমার দোষে, আমার পাপে। বাপ হইয়া তারে বেড়া আগুনের হাত থিকা বাঁচাইতে পারলাম না, এই দুঃখু আমার মরলেও ঘুচব না।'

একসময় কপাল থাপড়ানি, হাউ হাউ কান্না থামল। ঝিম মেরে বসে রইল নিত্য ঢালী। পানিকরও চুপচাপ।

আর একটানা অনেকক্ষণ হেসে হেসে হয়রান হয়ে কাপাসীও থামল।

হঠাৎ নিত্য ঢালী বলল, 'কামের কথাটা কই (বলি) পানিকর বাবা—'

'হাঁ হাঁ জরুর।'

'আপনেরে আমি বিশ্বাস করি। বেঁচে থাকলে আমার ছেলেও আপনের বয়সেরই হইত।'

একটু চুপ করল নিত্য ঢালী। মনের কথাগুলি আগে পরে ঠিকমত সাজিয়ে গুছিয়ে নিল। তারপর শুরু করল, 'একটা কথা আমি শুনছি, কথাটা সত্য কিনা আপনে ক'ন (বলুন) দেখি।'

'কী কথা?'

'পাগলগো (পাগলদের) না কি একটা হাসপাতল আছে? সেইখানে চিকিচ্ছা (চিকিৎসা) করাইলে না কি পাগলামি ব্যারাম সারে?'

'হাঁ হাঁ—'

এতক্ষণে পানিকর উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল, 'ঠিকই শুনেছ চাচা। পাগলা গারদে পাঠালে কাপাসী জরুর সেরে উঠবে।'

'সত্য ক'ন (বলেন) বাবা ?'

'হাঁ হাঁ, জরুর সচ্—'

'কাপাসী আবার আগের লাখান (মত) হইব ?'

'হাঁ হাঁ—'

একটু চুপ।

এতক্ষণ তীব্র, প্রখর রোদ ছিল। আবার ছায়া ছায়া, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ লম্বা লম্বা পাড়ি মেরে দ্বীপের মাথায় আসতে শুরু করেছে। রোদ ঢাকা পড়েছে। সাগর পাখিদের আর দেখা যাচ্ছে না। টিলা-জঙ্গল-পাহাড় আবার অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য হয়ে যাচ্ছে।

নিত্য ঢালী বলল, 'আপনে পাগলগো (পাগলদের) হাসপাতল চিনেন পানিকর বাবা ?'

'হাঁ হাঁ চিনি।'

'তা হইলে কাপাসীরে বাঁচান বাবা, আমারে বাঁচান।'

পানিকরের দু হাত জড়িয়ে ধরল নিত্য ঢালী। করুণ গলায় বলল, 'আমরা আপনের গুলাম হইয়া থাকুম।'

'ডর নেই। আমি সব বন্দোবস্ত্ করব। তুমি দেখো চাচা, কাপাসী জরুর আগের মত হয়ে যাবে। পাগলামি ঘুচবে।'

'ঠিক তো বাবা ?'

'আরে হাঁ হাঁ—'

পানিকর বলল, 'এবার উঠি। আমাকে আবার মায়া বন্দর যেতে হবে।'

পানিকর উঠে পড়ল।

নিত্য ঢালীও সঙ্গে সঙ্গে উঠল। বলল, 'কালই সিপি আর লা ভে'রে নিয়া এসে পড়বেন।'

পানিকর মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল, আসবে।

আটত্রিশ

দিন পাঁচেক হ'ল পাল সাহাব সেটেলমেণ্টে নেই। কি একটা কাজে পোর্ট ব্লেয়ার গিয়েছে।

পাল সাহাব থাকলে একটা কিছু সুরাহা হতই। চিন্তাই করতে হত না। পাল সাহাবই সব আসান করে দিত।

কিন্তু চোখেমুখে এখন অন্ধকার দেখছে হারাণ।

উজানী বুড়ীর একটা মাত্র কাপড়। সেই কাপড়খানা ফেঁসে ফেঁসে পিঁজে পিঁজে গিয়েছে। মাঝে মাঝে ফালি ফালি গর্ত। এতদিন তালি দিয়ে সেলাই করে কোনরকমে চালিয়ে এসেছে।

এখন আর উপায় নেই।

কোথায় তালি মারবে? ক'টা গর্ত বুঁজোবে?

উজানী বুড়ী সোজাসুজি একবারও হারাণকে বলে না, 'আমার কাপড় ছিঁড়া গেছে। একখান নয়া কাপড় কিনে দে।'

সোজাসুজি না বলার কারণও আছে।

বড় সাধ করে হারাণের সঙ্গে চন্দ্র জয়ধরের মেয়ে পাখির বিয়ে দিতে চেয়েছিল উজানী বুড়ী। কিন্তু শেষ বয়সের শেষ সাধটা মিটল না। হারাণ সিধা মুখের উপর বলে দিয়েছে, পাখিকে বিয়ে করবে না।

অথচ হারাণ বিয়ে করবে। বিয়ে করবে কাকে? না ঐ নিত্য ঢালীর নষ্ট শরীর, পাগল মেয়েটাকে।

দুঃখটা প্রাণে বড় বেজেছে উজানী বুড়ীর। নিজের নাতিকে দিয়ে একটা সাধ মিটবে না, তার উপর নিজের জোর খাটবে না, এ দুঃখ কোথায় রাখবে সে ?

আজকাল বড় অবুঝ হয়ে উঠেছে উজানী বুড়ী। হারাণের সঙ্গে কথা বন্ধ করেছে। একটুতেই ক্ষেপে ওঠে।

সোজাসুজি কাপড়ের কথা বলে না উজানী বুড়ী। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে নানানভাবে কথাটা শোনায়।

ভোরে উঠেই মাটির পাতিলে জাউ জ্বাল দিতে বসেছে উজানী বুড়ী।

পুব দিকটা আবছা আবছা। এখনও রোদ এই দ্বীপের মাথায় এসে পৌঁছতে পারে নি।

আখার মুখে শুকনা পাতা গোঁজে উজানী বুড়ী। দপ দপ করে পাতা পোড়ে। টগ বগ করে জাউ ফোটে।

ফুটন্ত জাউর দিকে তাকিয়ে উজানী বুড়ী বকতে থাকে, 'কে আছে আমার ? কেউ নাই। এই যে একখান কাপড় দিয়া সারা বচ্ছর বারো মাস কাটাই, কেউ কি ছ্যাখে ? ছ্যাখে না। কাপড়-খান পিঁজা পিঁজা ছিঁড়া ছিঁড়া গেছে। এত বড় পিরথিমীতে কেউ নাই আমার, যে একখান কাপড় দিতে পারে, যে আমার সুখ দুঃখু বোঝে।'

ঘরের ভিতর বাঁশের মাচানে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল হারাণ। উজানী বুড়ীর বকবকানিতে সুখের ঘুমটা ছুটে গেল।

ঘুম ছুটলেও হারাণ উঠল না। চোখ বুঁজে কান খাড়া করে রইল।

উজানী বুড়ী থামে না, 'কাপড় নাই, অখন আমি সরম ঢাকি কেমনে ? আমি তো কেউ না। গাঙ্গের জলে ভেসে আসছি। যত আপন, যত বান্ধব সেই লষ্ট, পাগলা মাগীটা।'

টেনে টেনে একটু দম নেয় উজানী বুড়ী। নতুন উদ্যমে আবার শুরু করে, 'সেই বান্ধবের কাপড় যদি ছিঁড়ত, এই ডিগলিপুরের সগল মানুষ দেখত, কবে বাহারের শাড়ি এসে গেছে। বান্ধবের জন্যে চুপে চুপে সগল আসে। বাহারের বাহারের শাড়ি, বাহারের বাহারের বেলাইজ (ব্লাউজ), গন্ধতেলের শিশরি। সগল কথাই কানে আসে। কালা তো আর হই নাই। কিন্তুক আমার বেলাতেই মুখ বেজার। আমার কাপড় যে ছিঁড়া গেছে, দেখেও গ্যাখে না।'

ভোরে উঠেই নির্জলা মিথ্যা বকতে শুরু করেছে উজানী বুড়ী।

কবে সে কাপাসীকে বাহারের বাহারের শাড়ি, বাহারের বাহারের জামা, গন্ধতেল দিল, ভেবেই পায় না হারাণ। কে যে এই সব কথা উজানী বুড়ীর কানে তোলে!

সকাল বেলাতেই মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল হারাণের।

কতক্ষণ আর উজানী বুড়ীর বকবকানি শোনা যায়! মানুষের ধৈর্য তো!

অগত্যা চোখ ডলতে ডলতে উঠে পড়ল হারাণ। নাঃ, আজ যেমন করে পারুক, উজানী বুড়ীর জন্য একখানা কাপড় কিনে আনবেই।

পাল সাহাব সেটেলমেণ্টে থাকলে ভাবনাই ছিল না। না থাকাতেই হয়েছে যত বিপদ!

নিজের হাতে একখান পয়সাও নেই হারাণের। কি যে সে করবে?

এদিকে ঘরে টিঁকবার উপায় নেই। যতক্ষণ নয়া কাপড় না আসবে, ততক্ষণ বক বক করে উজানী বুড়ী তাকে জ্বালিয়ে মারবে।

কর্জের আশায় আশায় সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সেটেলমেণ্টের সব ঘরে হন্যে হয়ে ঘুরল হারাণ।

পরনের কাপড় আর প্রাণটা ছাড়া বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে এই দ্বীপে কে-ই বা কি আনতে পেরেছে? কার ঘরে সোনাদানা মণি-মাণিক্য রয়েছে যে কর্জ দেবে?

শেষ পর্যন্ত উদ্ধব বৈরাগীর কাছে পাঁচটা টাকা মিলল।

সেই টাকা পাঁচটা সম্বল করে যোগেনকে সঙ্গে নিয়ে এরিয়াল উপসাগরের দিকে রওনা হ'ল হারাণ।

মাস দুই হ'ল, উপসাগরের পারে একটা দোকান বসেছে। মালাবারী মুসলমান হাসমত আলীর দোকান।

হাসমতের দোকানে চাল-ডাল-মসলা পাতি, কাপড়চোপড়, সব মেলে।

ডিগলিপুরের সেটেলমেণ্টে এই একটা মাত্রই দোকান।

ছ মাইল চড়াই-উতরাই, টিলা-জঙ্গল ঠেঙিয়ে একবার গিয়েছে, আবার ফিরেছে। ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল।

বেজার, হতাশ এবং ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে দু জনে। হারাণ আর যোগেন।

সেটেলমেণ্টে ঢুকেই প্রথমে উদ্ধব বৈরাগীর ঘর।

উদ্ধবের ঘরে আলো জ্বলছে। দূর থেকে খোলের আওয়াজ আর গানের সুর ভেসে আসছে।

জোরে পা চালিয়ে সরাসরি উদ্ধবের ঘরে এসে উঠল হারাণরা।

আসর বেশ জমে উঠেছে।

রসিক শীল, চন্দ্র জয়ধর, বুড়ী বাসিনী—সেটেলমেণ্টের অনেকেই এসে উদ্ধবের ঘরে জমা হয়েছে।

খোলশিল্পী হয়েছে রসিক শীল। বাঁ হাতে বাঁ কান চেপে ডান হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে উদ্ধব গান ধরেছে:

সব্ব অঙ্গ খাইও রে কাক
না রাখিও বাকি,
শুধু কিষ্ণ দরশন আশে
রেখো দুটি আঁখি।

তালের মাথায় মাথায় খোলে চাঁটি মারে রসিক শীল।

হারাণদের দেখে গান থামাল উদ্ধব। সঙ্গে সঙ্গে খোলের আওয়াজও থামল।

উদ্ধব বলল, 'কি রে সোনা, কুন সময় ফিরলি ?'

বিরস গলায় হারাণ বলল, 'এই তো আসলাম।'

উদ্ধব হারাণের কাছে এগুতে এগুতে বলে, 'দেখি দেখি, ঠাকুর-মায়ের লেইগা (জন্য) কী কাপড় আনলি ?'

'কাপড় আনি নাই বৈরাগী দাদা। এই ধর তোমার টাকা।'

উদ্ধবের কাছ থেকে পাঁচটা টাকা কর্জ নিয়ে কাপড় কিনতে গিয়েছিল হারাণ। সেই টাকা ফেরত দিতে দিতে বলল, 'টাকা উধার (ধার) করলাম, কিন্তুক কোন কামে লাগল না।'

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ হারাণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল উদ্ধব। আস্তে আস্তে বলল, 'ক্যান ? হইল কী ?'

'একখান মোটা কাপড়ের দাম চায় দশ টাকা।'

হারাণ উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'দশ টাকা দিয়া কাপড় কিনা (কেনা) আমার কাম না। এইবার থিকা ঠিক করছি, ল্যাংটাই থাকুম। ঠাকুরমায়েরে গিয়া কমু, কাপড়ের আশা ছাড় বুড়ী।'

গানের আসরের তাল আগেই কেটে গিয়েছিল।

রসিক শীল, বুড়ী বাসিনী, চন্দ্র জয়ধর—সবাই হারাণ আর উদ্ধবের কথা শুনছে।

উদ্ধব বলল, 'কইস কি হারাণ, একখান মোটা কাপড়ের দাম দশ টাকা !'

'ঠিকই কই বৈরাগী দাদা, বিশ্বাস না হয় জামাইরে জিগাও (জিজ্ঞাসা কর)।'

যোগেনকে আস্তে ঠেলা মেরে হারাণ বলল, 'তুমি তো গেছিলা। সত্য মিথ্যা তুমিই কও জামাই।'

যোগেন সায় দিয়ে বলল, 'হ, হাসমত মিয়া ঐ দামই চাইল।'

'সব্বনাশ!'

অদ্ভুত একটা শব্দ র উদ্ধব।

খানিকটা সময় একেবারেই চুপচাপ।

হঠাৎ চন্দ্র জয়ধর বলল, 'হাসমত মিয়ার কাছে গলাকাটা দাম। কয়দিন আগে মেয়ের লেইগা একখান শাড়ি কিনতে গেছিলাম। পনের টাকা দাম চায়। সুদিন পাইছে। ডিগলিপুরে আর দোকানও নাই। পরানে যা চায়, মুখে যে দাম আসে, তাই কয়।'

একটু থামে চন্দ্র। আবার শুরু করে, 'মিয়া ভাই জানে, যে দাম কইব, সেই দামেই মাল কিনতে হইব। মোটে একখান দোকান। জানে, তার দোকানে না গিয়া গতি নাই।'

কথায় কথা বাড়ে।

রসিক শীল বলল, 'সুযুগ (সুযোগ) পাইয়া কাপড়, চাউল, ডাইল, মশল্লা, সগল জিনিসের দাম চড়াইয়া দিছে হাসমত। অত চড়া দরে মাল কিনতে হইলে আমাগোর (আমাদের) লাখান গরীব কি বাঁচে?'

উদ্ধব বলল, 'তা হইলে উপায় কী? বিহিত কী?'

এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি বুড়ী বাসিনী। এক কোণে বসে মুখ বুঁজে সকলের কথা শুনছিল।– এবার সে মুখ খুলল, 'পাল সাহেব কোলোনিতে নাই। সে না আসা ইস্তক (পর্যন্ত) কোন বিহিত, কোন উপায়ই হইব না। আগে সে আসুক, একটা উপায় হইবই

আরো তিন দিন পর পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ফিরে এল পাল সাহাব। সব শুনে বলল, 'হাসমত শালে একটা ডাকু।'

রসিক শীল বলল, 'এত দরে তো মাল কিনা যায় না।'

'জরুর যায় না।'

পাল সাহাব ক্ষেপে উঠল, 'এই ডিগলিপুর আমার এলাকা, এখানে অত মুনাফাবাজি চলবে না। হাসমত কুত্তার জান তুড়ব।'

নাকের ফুটো দিয়ে পাঁশুটে রঙের অনেকগুলো রোঁয়া বেরিয়ে পড়েছে। উত্তেজনায় সেগুলো নড়তে লাগল। ঘোলাটে, বাদামী রঙের চোখছুটো ধক ধক করছে। ফেল্ট হ্যাটটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। হাতের মুঠি ছুটো কি একটা আঁকড়ে ধরার জন্য বার বার পাকিয়ে যাচ্ছে।

একটা জখমী জানোয়ারের মত পায়চারি করতে লাগল পাল সাহাব। হঠাৎ এক সময় থেমে সে চিল্লাতে শুরু করল, 'আঁই হারাণ, আঁই যোগেন, আঁই গুপী—চল্, হাসমত শালের দোকান তুড়ে দিয়ে আসি।'

বুড়ী বাসিনী ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এল। ধীর, স্থির, শান্ত মানুষ সে। বয়সের গুণেই হোক, আর যে কারণেই হোক, মাথাটা সব সময়ই তার ঠাণ্ডা।

বাসিনীকে দেখে পাল সাহাব বলল, 'এই যে মাঈ, তুই কুছু বলবি ?'

আজকাল বাসিনীকে মাঈ ডাকে পাল সাহাব।

বাসিনী বলল, 'হ বাবা, আমি কিছু কইতে চাই।'

'বল্ বল্—'

বাসিনীর পাশে এসে দাঁড়াল পাল সাহাব।

'কমু, কিন্তুক রাগ করতে পারবেন না সাহেব বাবা।'

'আরে না না। রাগ করব না। তুই আমার মাঈ। তোর ওপর রাগ করতে পারি ?'

বলতে বলতে হেসে ফেলল পাল সাহাব। হাসি থামিয়ে আবার বলল, 'তোদের ওপর আমি যখন তখন রাগ করি, তাই না? কি করব, মেজাজটা এতনা বেতর্বিয়ত হয়ে গেছে! যাক ও বাত। এবার তোর বাত শুরু কর মাঈ।'

বুড়ী বাসিনী বলল, 'হাসমত মিয়ার দোকান ভেঙে দিয়া কি হইব? কিছু সুরাহা হইব না। আমাগো (আমাদের) অন্য উপায় দেখতে হইব।'

'কী উপায়?'

একদৃষ্টে বাসিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল পাল সাহাব।

'আমি কই কি বাবা, এই ডিগলিপুরের কোলোনিতে আমরা তো এত মানুষ রইছি—'

'হাঁ, ও তো ঠিক বাত, লেকিন তাতে হ'ল কী?'

'আমারে কথাটা পুরা করতে ছান।'

'হাঁ হাঁ, তুই বল্ মাঈ।'

বাসিনী বলতে থাকে, 'আমরা এত মানুষ আছি। তবু আমাগোর (আমাদের) দোকান-পসার, হাট-বাজার নাই। এই-খানে একখান হাট বসাইলে কেমুন হয়?'

'বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা। আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব।'

দু হাতে বুড়ী বাসিনীকে জড়িয়ে ধরল পাল সাহাব। বলল, 'এ্যায়সা এ্যায়সা কি তোকে মাঈ বলি? ঠিক মতলব ঠিক সময় তুই বাতলে দিস।'

এর পর হাট-বাজার দোকান-পসার সম্বন্ধে নানান কথা হ'ল।

এমনিতে কারো হাতেই টাকা পয়সা নেই।

অথচ মূলধন ছাড়া ব্যবসা হয় কেমন করে?

ঠিক হ'ল পাল সাহাবই সব ব্যবস্থা করবে। নিজে জামীন দাঁড়িয়ে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ধারে মাল এনে দেবে। মাল বেচার পর দোকানীরা মহাজনকে টাকা শোধ করে আসবে।

হাট বসার কথাটা পাকা হয়ে গেল।

দিন কয়েকের মধ্যেই ডিগলিপুরের খালের পার ঘেঁসে খান পাঁচেক ছোট ছোট দোচালা ঘর উঠল। বাঁশের খুঁটির মাথায় বেতপাতার চাল।

এটাই হাট।

উজানী বুড়ীর কাপড়ের কল্যাণে ডিগলিপুরের সেটেলমেন্টে হাট বসল।

উনচল্লিশ

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে যারা উপনিবেশ গড়তে এসেছে, এতদিন মনে হত তারা এক, অভিন্ন। তাদের আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। বউ-বাচ্চা, জোয়ান-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ—সবাই মিলে মানুষের একটা পিণ্ড।

কিন্তু পায়ের নীচে মাটি আর মাথার উপর ছাউনি পেয়ে তাদের অন্য স্বরূপ বেরিয়ে পড়েছে।

একমাত্র উপনিবেশ গড়ার ব্যাপারেই তারা একত্র হয়। না হ'লে প্রত্যেকটি মানুষই তার মন, অনুভূতি, সুখ কি দুঃখ নিয়ে এই দ্বীপের মতই আলাদা আলাদা, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ। এক এক জনের সমস্যা এক এক রকম। এক জনের স্বভাব, চরিত্র কি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অন্যের আদৌ মিল নেই।

দ্বীপের মত বিচ্ছিন্ন হয়েও প্রত্যেকটি মানুষ দুটো জায়গায় এক। প্রথমত উপনিবেশ গড়ার কাজে। দ্বিতীয়ত পাল সাহাবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখায়।

কেউই তার অভিযোগ, নালিশ, দুঃখ, হতাশা কি আনন্দের কথা পাল সাহাবকে না জানিয়ে পারে না।

এই দ্বীপের সব মানুষের সমস্ত দুঃখ, সুখ এবং জীবনবোধের উপর ব্যাপ্ত হয়ে আছে একজন মাত্র মানুষ। সে পাল সাহাব।

নিয়তির মত, অমোঘ বিধানের মত এই মানুষটিকে কোনমতেই অতিক্রম করা যায় না।

পাল সাহাবকে ঘিরেই বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে জীবন গড়ে উঠছে।

শেষ পর্যন্ত কুমীকেও পাল সাহাবের কাছে আসতে হ'ল।

ডিগলিপুরের সেটেলমেণ্টে কুমীর মত চরিত্র নেই।

কুমী বিধবা, সধবা না কুমারী, বুঝবার জো নেই। সিঁথিতে সিঁদুর নেই কিন্তু ডান হাতে এক গাছি শাঁখা আছে।

একহারা চেহারা। থ্যাবড়া নাক, গোল মুখে হনু দুটো খাড়া হয়ে আছে। চারকোণা থুতনি। চেহারা দেখে বয়স আন্দাজ করার জো নেই। কুমী যদি না বলে ছায়, তা হলে তিরিশও মনে হতে পারে, আবার চল্লিশ ভাবতেও দোষ নেই।

উপর থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হয়, বড় সোজা মানুষ কুমী। কিন্তু চোখের দিকে তাকালেই ধারণা বদলে যায়। অমন ধূর্ত, চতুর চোখ হাজারে একটা নজরে পড়ে কিনা সন্দেহ।

কুমীর চোখের তারা দুটো খাঁচার পাখির মত ছটফট করছে। খাঁচার পাখি হয়ত ঠিক নয়, উপমা হওয়া উচিত চরকি। চরকির মতই ছুটাছুটি করছে।

চিকন মাজার নীচে ভারী, মাংসল পাছা। সেই পাছা দুলিয়ে দুলিয়ে ডিগলিপুরের সেটেলমেণ্টে ঘুরে বেড়ায় কুমী।

কোন দিন হয়ত সাদা একখান থান পরে বেরুল কুমী। হাতে শাঁখা নেই। চুলগুলি মাথার উপর থুপথাপ করে বাঁধা।

কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করল, 'এই আবার কোন বেশ!'

অল্প একটু হেসে কুমী বলে, 'যুগিনী (যোগিনী) সাজলাম।'

আবার কোনদিন টকটকে লাল ডুরে শাড়ি পরে, হাতে আয়না-চুড়ি দিয়ে, পানের রসে ঠোঁট রাঙিয়ে কুমী চলল।

সেদিনও হয়ত কেউ জিজ্ঞাসা করল, 'এই আবার কোন বেশ।'

চোখের তারা দুটো ঘুরিয়ে, মাজার খাঁজে ঢেউ তুলে কুমী বলে, 'আজ মুহিনী (মোহিনী) সাজলাম।'

উপর দেখে যে কুমীকে সোজা, সরল মনে হয়, তার ভিতরে ডুব দিতে পারলে যা পাওয়া যাবে তা হ'ল কতকগুলি প্যাঁচ।

কুমীর চামড়ার তলে বুঝি বা রক্ত, মাংস কি হাড় নেই। জটিল কুটিল, অসংখ্য প্যাঁচ সেখানে ঠাসা।

সেটেলমেণ্টের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায় কুমী।

কোন ঘরের সোয়ামী আর স্ত্রীতে বনিবনা নেই, দেশভাগের পর কোন ঘরের মেয়ে শরীর নষ্ট করেছে, কোন ঘরের বউ নিশি রাতে নাগরের কাছে চলাতে যায়, ঘুরে ঘুরে এই সব খবর সে জোগাড় করে। দিনরাত এই-ই তার কাজ। এতেই তার চরম সুখ।

মাছির মতই মানুষের জীবনের ঘা-গুলি খুঁটে খুঁটে আনন্দ পায় কুমী।

অনেক দেখে দেখে, নিঃসন্দেহ হয়ে শেষ পর্যন্ত পাল সাহাবের কাছে এল কুমী।

এখন দুপুর।

একটানা তিন মাস বর্ষার পর রোদ উঠেছে। উজ্জ্বল, ধারাল, তীব্র রোদ।

ঝুপড়ির সামনে বসে লাল, খয়েরী, হলুদ—নানা রঙের কাপড়ের টুকরা দিয়ে চালু লাইন (এক ধরনের বঁড়শি) বানাচ্ছিল পাল সাহাব। কাল সকালে সে এরিয়াল উপসাগরে মাছ মারতে যাবে।

চালু লাইন বানাচ্ছিল আর গুন গুন করে গাইছিল পাল সাহাব:

ভোবের তোরঙ্গ উঠল

উসকো লিয়ে কি

লাও ডুবাবে ?

এমন সময় কুমী এসে ডাকল, 'পাল সাহেব—'

গান থামিয়ে চমকে উঠল পাল সাহাব। বলল, 'কে ?'

'আমি কুমী—'

লাল লাল দাঁত বার করে একটু হাসল পাল সাহাব। বলল, 'ও, তুই—মুহিনী-যুগিনী (মোহিনী-যোগিনী), আয় আয়, বস।'

পাল সাহাব কুমীকে মুহিনী-যুগিনী ডাকে।

পাল সাহাবের পাশ ঘেঁষে ঘন হয়ে বসল কুমী।

পাল সাহাব বলল, 'কিছু কথা আছে ?'

'হু বাবা।'

'বল্, বলে ফ্যাল্—'

চোখ দুটো চারপাশে চরকির মত ঘুরিয়ে কুমী বলে, 'কথাটা কিন্তুক গোপন—'

'হাঁ হাঁ, বল্ না তুই—'

চালু লাইন বানানো বন্ধ রেখে কুমীর মুখের দিকে তাকাল পাল সাহাব।

একটা ঢোঁক গিলল কুমী। প্রচুর উৎসাহ নিয়ে কথাটা বলার জন্য পাল সাহাবের কাছে এসেছিল। কিন্তু এখন বলার মুখে এসে সাহস হারিয়ে ফেলছে।

পাল সাহাব তাড়া লাগাল, 'বল্ বল্—'

আবছা গলায় কুমী বলল, 'কিন্তুক—'

এবার পাল সাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'লেকিন ফেকিন কুছ নেহী। জলদি কর শালী।'

কি ভেবে কুমী উঠে পড়ল।

পাল সাহাব বলল, 'উঠলি যে ?'

কুমী বাব দিল না। পাল সাহাবকে পিছনে রেখে জোরে জোরে পা চালিয়ে দিল।

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল পাল সাহাব। বিস্ময়ের ঘোরটা ছুটে গেলে লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল। তারপর দৌড়ে গিয়ে কুমীকে ধরে ফেলল।

কুমীর একটা হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে ঝুপড়িটার সামনে নিয়ে এল পাল সাহাব। সমানে চিল্লাতে লাগল, 'মাগী, মুহিনী-যুগিনী, বাত বলতে এসে না বলে চলে যাবি। ও হবে না।'

ভয় ভয় চোখে পাল সাহাবের দিকে তাকাল কুমী। বলল, 'কমু, সগল কথা কমু। কিন্তুক আজ না। অন্য দিন।'

'আজই তোকে বলতে হবে, আভী বলতে হবে।'

এক ঝটকায় কুমীকে বসিয়ে দিল পাল সাহাব। বলল, 'দিল্লাগী পেয়েছিস, তামাসা পেয়েছিস! বল্ শালী।'

একটুক্ষণ চুপচাপ।

নিজেকে খানিকটা ধাতস্থ করে নিল কুমী। তারপর শুরু করল, 'সে কথা কইতে বড় সরম লাগে পাল সাহেব। আপনে সামনে রইছেন—'

কথা পুরা না করেই থেমে গেল কুমী।

পাল সাহাব বলল, 'আমি সামনে থাকলে সরম লাগে?'

'হ পাল সাহেব।'

'তা হ'লে আমার দিকে পাছা দিয়ে বস।'

কথামত পাল সাহাবের দিকে পাছা দিয়ে বসল কুমী।

পাল সাহাব বলল, 'এবার বল্—'

কুমী বলল, 'কথাটা কিন্তুক খুব গোপন। আপনে বিশ্বাস করবেন না।'

'হাঁ হাঁ গোপন। তোর কথা জরুর বিশোয়াস করব। বল্ তুই।'

অনেক ভনিতার পর কুমী বলল, 'উই হরিপদর বউ তিলি, উই কথা—'

'উই মাগী কী করল ?'

'কী করতে বাকী রাখছে ?'

উত্তেজনায় ঘুরে বসল কুমী। ফিস ফিস করে বলল, 'উই

পাল সাহাব চমকে উঠল।

'হ পাল সাহেব, উই মাগীর শরীল লষ্ট হইয়া গেছে।'

'বুঝলি কেমন করে ?'

'কী যে ক'ন (বলেন) বাবা, সারা জনম এই কইরা কাটাইলাম।'

চোখ মটকাল কুমী। চতুর, ধূর্ত শব্দ করে একটু হাসল। বলল, 'পাল সাহেব, আমার চোখেরে ফাঁকি দিয়া লাগর নিয়া চলাইব, এমুন মাগী ডিগলিপুরের এই কোলোনিতে নাই।'

একটু চুপচাপ।

একদৃষ্টে কুমীর মুখের দিকে চেয়ে আছে পাল সাহাব। নাকের রোঁয়াগুলো একটু একটু নড়ছে।

এবার পাল সাহাবের কানে মুখটা গুঁজে দিল কুমী। ফিস ফিস করে বলল, 'রোজ রাইতে, যখন পিরথিমী ঘুমে নিঝাম (নিঝুম) হইয়া থাকে, তখন তিলি লাগরের কাছে যায় পাল সাহাব।'

'লাগরটা কোন শালা ?'

'উই জামাই।'

'জামাই! যোগেনের কথা বলছিস ?'

'হ বাবা—'

পাল সাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'মিছে বাত।'

একটু সরে বসল কুমী। বলল 'মিছা আমি কই না পাল

সাহেব। নিজের চৌখে রাইতের পর রাইত তিলিরে জামাইর কাছে যাইতে দেখছি। চৌখে তো আর ছানি পড়ে নাই। নিজের চৌখেরে অবিশ্বাস করি কেমনে?'

'শালী তোর মুখে যত বদ কিস্‌সা। ভাগ মাগী—'

পাল সাহাব ক্ষেপে উঠল।

আশ্চর্য! কুমী ভয় পেল না। কোমরে ক্ষিপ্র একটা মোচড় দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'এর একটা বিহিত করলেন না পাল সাহেব। ভুল করলেন, জবর ভুল করলেন।'

'যা মাগী, আভী আমার আঁখের সামনে থেকে ভাগ—'

'যাই বাবা, যাই—'

পাল সাহাবের ঝুপড়ির সামনেই ঢালু উতরাই। উতরাই বেয়ে নামতে নামতে কুমী বলল, 'আজ আমারে খেদাইয়া দিলেন। কিন্তুক আমি আবার আসুম। ফিরা ফিরা আসুম।'

'যা শালী, তোর কোন বাত আমি শুনতে চাই না।'

'শুনবেন বাবা, এক শ বার শুনবেন। শুনতে হইবই।'

হিক্কার মত শব্দ করে টেনে টেনে হাসতে লাগল কুমী। বলল, 'অখন আমার কথা তিতা লাগে। কিন্তুক যেই দিন ফল ফলব, সেই দিন বুঝবেন, মিঠা কথাই কইছিলাম। সেই দিন ফল ফলনের খবর দিতে আসুম বাবা।'

মাজাটা বাঁকিয়ে চুরিয়ে, ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে উতরাই বাইতে বাইতে নীচের দিকে নেমে গেল কুমী।

চল্লিশ

পানিকর সেই যে বলে গিয়েছিল, সিপি আর লা তে'কে নিয়ে কালই এসে পড়বে, তা আর হয়ে ওঠে নি।

কানখাজুরার (চেলা জাতীয় সরীসৃপ) কামড় খেয়ে পুরা ছ মাস ভুগল সে। কানখাজুরার বিষে সমস্ত শরীরটা নীল হয়ে গিয়েছিল।

মায়া বন্দর থেকে পানিকরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পোর্ট ব্লেয়ারের সিকমেনডেরায় (হাসপাতালে)।

সিকমেনডেরায় ছ মাস কাটিয়ে খানিকটা সুস্থ হয়ে কাল রাত্রে মায়া বন্দর ফিরে এসেছে পানিকর।

আজ সকালেই 'নটিলাস' বোটটা সিপিতে সিপিতে বোঝাই করে লা তে'কে সঙ্গে নিয়ে সে ডিগলিপুর রওনা হ'ল।

পানিকররা নিত্য ঢালীর ঘরে এসে যখন পৌঁছাল, তখন বিকাল।

এখন রোদের তাপ কম, জেল্লা বেশি। উজ্জ্বল রোদে চারপাশের জঙ্গলের গাঢ় সবুজ মাথাগুলি জ্বলছে।

দাওয়ার পাটাতনে বসে ভুক ভুক করে তামাক পোড়াচ্ছিল নিত্য ঢালী। বুড়ো বয়সের মুষ্টিযোগ বেশ জমে উঠেছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল।

চড়াই বেয়ে আগে আগে আসছে পানিকর। তার পিছে পিছে বিরাট একটা টিনের তোরঙ্গ মাথায় চাপিয়ে লা তে।

পানিকরদের দেখে হুঁকা নামিয়ে নিত্য ঢালী ছুটে এল। বলল, 'আসেন পানিকর বাবা, আসেন।'

পানিকরকে নিয়ে দাওয়ায় গিয়ে বসল নিত্য।

উঠানের এক কিনারে টিনের তোরঙ্গটা নামাল লা তে। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে নিত্য ঢালীর পাশে গিয়ে বসল।

নিত্য বলল, 'সেই যে কইয়া (বলে) গেলেন কালই আসুম; আর আসলেন না। দিনের মনে দিন যায়। রাইতের মনে রাইত যায়। কাপাসী আর আমি একটা একটা করে দিন গুনি। দিন গুনি আর চিন্তায় মরি। কিন্তুক কোথায় পানিকরবাবা?'

'কী করব চাচা! আমাকে কানখাজুরায় কাটল। পুরা দুটো মাস তো সিকমেনডেরায় (হাসপাতালে) কাটালাম।'

'বেশ মানুষ আপনে।'

বেজার মুখে নিত্য ঢালী বলতে লাগল, 'আমরা যে এই ডিগলিপুরে আছি, একটা খবর তো পাঠাইতে হয়। আসলে আপনে আমাগো (আমাদের) আপন জন ভাবেন না। আমরা পানিকর বাবা পানিকর বাবা করে মরলে কী হইব!'

কথাগুলির মধ্যে নিত্য ঢালীর প্রাণের তাপ রয়েছে।

পানিকর কিছু বলল না। অল্প একটু হাসল।

নিত্য ঢালী আবার বলল, 'অখন কেমুন আছেন পানিকর বাবা?'

'এখন তবিয়ত ভালই—'

একটু থামল পানিকর। আবার শুরু করল, 'তবে কানখাজুরার বিষে বহুত কাবু হয়ে পড়েছি।'

কথা কইতে কইতে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল পানিকর, 'এরিয়াল বে'তে মোটর বোট বেঁধে এসেছি। বোটে সিপি আছে। সিপিগুলো আনতে হবে।'

চুপচাপ দুই হাঁটুতে থুতনি গুঁজে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল লা তে। পানিকরের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। বলল, 'আমি যাই মালেক, সিপিগুলো নিয়ে আসি।'

কোন সময় ক্লান্তি নেই লা তে'র। দিনরাত সে অসুরের মত খাটতে পারে। একটু আগে ছ মাইল পাহাড় জঙ্গল ঠেঙিয়ে বিরাট একটা টিনের তোরঙ্গ নিয়ে এসেছে। একটু জিরিয়ে নিয়ে সব অবসাদ ঝেড়েঝুড়ে এখনই আবার সিপি আনতে ছুটছে।

কোন সময় হয়রান হয়ে পড়ে না লা তে।

তার ধাতে চুপচাপ বসে থাকা নেই। (অবশ্য সমুদ্রের দিকে চেয়ে চুপচাপ, দিনের পর দিন সে কাটিয়ে দিতে পারে।) একটা কিছু না কিছু নিয়ে সব সময় মেতেই আছে সে। তার মধ্যে এমন একটা প্রাণশক্তি আছে, যা কোন সময় টোটে না, ফুরায় না।

পানিকর বলল, 'তুই কি এত সিপি আনতে পারবি লা তে?'

'এক দফে পারব না। বার বার গিয়ে আনব।'

'তবে যা।'

সামনের উতরাই বেয়ে লা তে চলে গেল।

লা তে চলে যাবার পর চনমন চোখে এদিক সেদিক তাকাতে লাগল পানিকর।

নিত্য ঢালী বলল, 'কী খোঁজেন পানিকর বাবা?'

'কুছু না, কুছু না—'

পানিকর নিত্য ঢালীর দিকে মুখ করে বসল।

নিত্য ঢালী বলল, 'আপনেরা আসলেন, ভালই হইল। এইবার কামের কথা কওয়া যাউক।'

'হাঁ হাঁ চাচা, বল—'

'কই কি, আমার তো একখান মোটে ঘর। এক ঘরে এত জনের জায়গা হইব না।'

'ঠিক বাত, ঠিক বাত—'

কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে পানিকর। নিজের অজান্তেই আবার এদিক সেদিক তাকাতে থাকে।

পানিকরকে এদিক সেদিক তাকাতে দেখে মনে মনে কি একটু ভেবে নেয় নিত্য ঢালী। ফিস ফিস করে বলে, 'কিছু দরকার পানিকর বাবা?'

'অঁ্যা, নেহী নেহী—'

চমকে উঠেই নিজেকে সামলে নেয় পানিকর। নিজের মতলবটা এত তাড়াতাড়ি ফাঁস করতে রাজী নয় সে।

আস্তে আস্তে পানিকর বলে, 'বল, বল চাচা, কী যেন বলছিলে—'

'হ বাবা, কই (বলি)।'

পানিকরের ভাবগতিক ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না নিত্য ঢালী। একটুক্ষণ চুপ থেকেই সে বলে, 'এক ঘরে তো এত জনের কুলাইব না। আর একখান ঘর বানাইয়া নিতে হইব।'

'হাঁ হাঁ জরুর।'

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকিয়ে পানিকর সায় দিল, 'তুমি কোঠি বানাও চাচা। যা খরচ লাগে আমি দেব।'

নিত্য ঢালী উৎসাহিত হয়ে ওঠে, 'কাল থিকাই ঘর বানানো শুরু করুম।'

'বহুত আচ্ছা।'

খানিকটা এ কথা সে কথার পর আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে পানিকর। নিত্য ঢালীর ঘরের আনাচ কানাচ, উঠান, দূরের ঢালু উতরাই—চারপাশে তার চোখদুটো চরকির মত ঘুরতে থাকে।

মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়ায় পানিকর। কি যেন ত্যাখে।

নিত্য ঢালী বলে, 'কী ত্যাখেন বাবা?'

'কুছ না, কুছ না।'

আবার বসে পড়ে পানিকর।

নিত্য ঢালী নিজের খেয়ালে বকে যায়, 'আপনেরা আসলেন, বড় ভাল হইল, বড় বাহারের হইল। কত বল, কত ভরসা পাইলাম।'

'হাঁ—'

'পাঁচ মুখে পাঁচ কথা রটব—'

'হাঁ—'

'কিন্তুক আমি কারোরে ডরাই না। ক্যান ডরামু? আমি কি কারো কাছে দুই খান পয়সা ধারি? না কেউ দুই দিন আমারে খাওয়াইছে? উল্টা আমার ঘরে এসে আমার মেয়েরেই লষ্ট, দুষ্ট, কুচরিত্তির কইয়া যায়!'

বকতে বকতে হঠাৎ হুঁশ হ'ল নিত্য ঢালীর। পানিকর তার কথা শুনছে না।

বকবকানি থামিয়ে সরাসরি পানিকরের চোখের দিকে তাকাল নিত্য ঢালী। পানিকরের চোখ দুটো ধক ধক করছে।

দূরে উতরাইর দিকে তাকিয়ে আছে পানিকর। এক দৃষ্টে ধক ধক, ধারাল চোখে কি যেন দেখছে।

কী দেখছে পানিকর?

পানিকর যা দেখছে, তা দেখার জন্য উতরাইর দিকে চোখ ফেরাল নিত্য ঢালী।

খানিকটা আগে জল আনার জন্য কিলপণ্ড নদীতে গিয়েছিল কাপাসী। ভিজা কাপড়ে কাঁখে কলস নিয়ে এখন উতরাই বেয়ে উঠে আসছে সে। কলস থেকে জল ছলকে ছলকে পড়ছে।

কাপাসীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার পানিকরের দিকে তাকাল নিত্য ঢালী। এতক্ষণ পানিকরের চোখ দুটো ধক ধক করছিল। এখন অস্বাভাবিক জ্বলছে।

সোজা, সহজ মানুষ নিত্য ঢালী। বুঝি বা একটা কিছু আন্দাজ করল সে। একটা কিছুর গন্ধ পেল।

একচল্লিশ

বর্ষা নামার আগে লাঙলের ফলায় ফলায় জমি চৌরস হয়ে গিয়েছিল। তারপর বীজদানা বোনা হয়ে ছিল।

লাঙল দিয়েও জঙ্গলকে পুরাপুরি মারা গেল না।

হাজার হাজার বছর ধরে এই দ্বীপের অস্তিত্বের সঙ্গে অরণ্য মিশে আছে। এত সহজে, একবার মাত্র লাঙল চালিয়ে সেই অরণ্যকে উৎখাত করা যায় না।

বর্ষার মেয়াদ ফুরিয়েছে।

মাটির গর্ভ চিরে চিরে মাথা তুলেছে সবুজ, নধর ধানের চারা।

দ্বীপের কুমারী মাটি এই প্রথম গর্ভিণী হয়েছে। গর্ভিণী হওয়ার গৌরবে পুলকময়ী হয়ে উঠেছে।

যতদূর তাকানো যায়, গাঢ় সবুজ রঙের ধান। ধানের গোছা-গুলি কি সতেজ, কি পুষ্ট!

ধান দেখেও সুখ।

কিন্তু পৃথিবীতে নিরঙ্কুশ সুখ বলে বুঝি কিছুই নেই। সুখের সঙ্গে চিরদিনই দুখের খাদ মেশানো।

না হলে ধানের সঙ্গে সঙ্গে কেন হাওয়াই বুটি, জলডেঙ্গুয়া আর নানান জাতের আগাছা মাথা তুলবে?

সারাদিন ডিগলিপুরের বাসিন্দারা জমিতে নিড়ান দেয়।

আগাছা সাফ করে। জলডেঙ্গুয়া আর হাওয়াই বুটির চারাগুলি শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলে।

ধানের পাশে আগাছা থাকলে ফসলের জোর কমে যাবে।

সমস্ত দিন নিড়ান দিয়ে সন্ধ্যার মুখে মুখে সেটেলমেণ্টের বাসিন্দারা জমি থেকে উঠে কিলপণ্ড নদীতে যায়। পাহাড় ফুঁড়ে নেমে আসা ঠাণ্ডা, হিমাক্ত জলে গায়ের মাটি ধুয়ে সরাসরি উদ্ধব বৈরাগীর ঘরে গিয়ে জমা হয়।

সরকার থেকে খোল করতাল দিয়েছে।

উদ্ধবের ঘরে সারাদিন কাজকর্মের পর গানের আসর বসে।

গানের ব্যাপারে ডিগলিপুরের বাসিন্দাদের প্রচুর উৎসাহ। সমস্ত দিন খাটুনির পর যে জীবনীশক্তি তারা হারায়, এই গানের আসরে এসে আবার তা ফিরে পায়। এখানে এসে ক্লান্ত, অবসন্ন, শ্রান্ত মানুষগুলি সতেজ হয়, সজীব হয়।

গানের ব্যাপারে সবচেয়ে যার বেশি উৎসাহ, সে হ'ল পাল সাহাব। পাল সাহাব আজ নেই। সেটেলমেণ্টের কি একটা জরুরী কাজে পোর্ট ব্লেয়ার গিয়েছে।

অগত্যা পাল সাহাবকে বাদ দিয়েই আজ আসর বসল।

ঘরের দুই কোণে ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে দুটো কেরাসিনের ডিবে জ্বলছে। আবছা আবছা আলো আর ছায়া ছায়া অন্ধকারে এই ঘরের কিছুই স্পষ্ট না। মানুষগুলির ছায়া অস্বাভাবিক লম্বা আর বিকৃত হয়ে ঘরের বেড়ায় কাঁপছে।

কেরাসিনের ডিবে থেকে যত আলো পাওয়া যায়, তার হাজার গুণ বেশি মেলে ধোঁয়া। কালো, কেরাসিন-পোড়া ধোঁয়ার গন্ধ বড় উগ্র, বড় তীব্র। নাকে ঢুকলেই মানুষগুলো খক খক কাসে।

ধোঁয়া ধোঁয়া আলোতে মানুষগুলোর চেহারা বোঝা যায়। কিন্তু, নাক, চোখ, চোখের ভাষা বোঝা যায় না।

উদ্ধবের ঘরে তামাকের সরঞ্জাম আছে।

হাতে হাতে হুঁকো ঘুরছে। ভুক ভুক করে হুঁকো বাজছে।

বুড়ো রসিক শীলই প্রথম কথা বলল, 'লাগা রে উদ্ধব, একখান বাহারের গান ধর।'

'না না—'

উদ্ধব বলল, 'পরথমে (প্রথমে) আমি না। পরথমে গান গাইব গুপী। ছাখ না, গুপী গাওয়ার লেইগা (জন্য) কেমন ছোঁক ছোঁক করতে আছে।'

গুপীর গান গাওয়ার খুব শখ।

বলা মাত্র ঘরের এক কোণ থেকে মাঝখানে উঠে এল সে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, গলায় তিন লহর রুদ্রাক্ষের মালা। সহজ, সোজা মানুষ গুপী।

বাঁ হাতে বাঁ কানটা চেপে ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে খ্যাসখেসে, ভোতা গলায় গান জুড়ে দিল গুপী ঃ

তোমার চরণ তলে
হে গুরুচাঁদ রেখো,
রেখো আমারে—

গুপীর গানের মধ্যেই লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল হারাণ। একটা হাত ধরে তাকে টেনে বসিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আর গাইতে হইব না সোনা।'

'ক্যান ?'

গুপীর মুখখান বড় করুণ, বড় অসহায় দেখায়।

ততক্ষণে উদ্ধবের ঘরে হাসির শোর উঠেছে। হেসে হেসে ঢলে ঢলে একজন আর একজনের গায়ে গড়াগড়ি খায়।

রোজই গুপীকে নিয়ে রঙ্গ করে হারাণরা। তামাসা করে। রোজই প্রথমে তাকে গান গাওয়ার জন্য তুলে দেয়।

দোষের মধ্যে গুপী হ'ল নিপাট ভাল মানুষ। কোন প্যাঁচের কথা জানে না। কারো কোন কথায় কি কোন ব্যাপারেই সে নেই। জীবনে একটা মাত্র শখই আছে তার। একটু গান গাওয়ার শখ।

প্রাণে শখ থাকলেই গলায় গান আসবে, এমন কথা নেই।

হাঁ করলেই গুপীর গলা থেকে সরু-মোটা-মিহি—নানা জাতের চার পাঁচটা আওয়াজ একসঙ্গে বেরোয়। মনে হয়, তিনটে কুকুর আর দুটো ঘোড়া পাল্লা দিয়ে কাঁদছে।

এই মানুষগুলি, যারা পদ্মা-মেঘনার দেশ থেকে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে আশ্রয়ের আশায় আশায় এসে পড়েছে, তাদের জীবনে রং কোথায়? রস কোথায়? সাত পুরুষের বাস্তু থেকে উৎখাত হয়ে আসার পর তাদের জীবনের সব রস, সব কৌতুক, সব আনন্দের উৎস শুকিয়ে গিয়েছিল।

জীবনের নিরন্তর যন্ত্রণা নিয়েই তো তাদের দিন কাটে। জীবনে যন্ত্রণা তো আছেই। দুঃখ-ধান্দা-চিন্তারও পারাপার নেই।

দুঃখ তো এদের নিয়ত সঙ্গী। রোগ-ভোগ-শোকের মত নিয়তির অমোঘ বিধানে দুঃখ এদের সঙ্গে লেগেই আছে। দুঃখ এদের জীবনে সহজ সত্য।

তবু মাঝে মাঝে মনকে চোখ না ঠেরে উপায় কী? বিশেষ এই আন্দামানে, বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, নিদারুণ দ্বীপে।

গুপীকে নিয়ে রঙ্গ করে কিছু সময়ের জন্য জীবনের অন্য চিন্তাগুলিকে তারা ভুলে থাকে। বুঝি বা তাদের জীবনে রসের উৎসটা একেবারেই শুকিয়ে যায় নি।

সামান্য ব্যাপার নিয়ে প্রচুর হেসে এরা নিজেদের সরস, সজীব রাখে।

নিরুপায় চোখে হারাণের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল গুপী। এবার সে বলল, 'রোজ তোরা অমন হাসাহাসি করিস ক্যান?'

'তোর গলার গুণে।'

'ক্যান, আমার গলায় হইছে কী?'

'তুই যখন গাইস—'

হাসতে হাসতে হারাণ বলে, 'মনে হয়, এক লগে (সঙ্গে) তিনটা খাটাস ডাকতে আছে। বুঝলি?'

গুপী আর কিছু বলে না। সবাইকে ডিঙিয়ে ঘরের একটি কোণায় গিয়ে বিষণ্ণ, বেজার মুখে বসে থাকে। ভাবে, কাল আবার যখন তাকে গান গাইতে ডাকবে, কিছুতেই সে উঠবে না।

অবশ্য এই প্রতিজ্ঞাটা রোজই করে গুপী। রোজই ভাঙে।

গুপীকে নিয়ে হাসাহাসি কাসাকাসি এক সময় থামল।

হারাণ বলল, 'অনেক হইছে। এই দিকে রাইতও হইল এইবার গান ধর গো বৈরাগী দাদা।'

'হ-হ, গান ধর—'

সবাই সায় দিল।

হারাণ বলল, 'আজ রাধাতত্ত্বের গান শুনুম।'

ইতিমধ্যে খোল তুলে নিয়েছে রসিক শীল।

টাটুম-টুটুম-টুম—রসিক শীল খোলে চাঁটি মারে। করতাল তুলে নিয়েছে যোগেন। ঢিমা তালে করতাল বাজে—ঝমর-ঝমর-ঝম।

গুন্ গুন্ করে সুর ভেঁজে উদ্ধব গান ধরে:

না পুড়াইও রাধা অঙ্গ,
না ভাসাইও জলে—
মরিলে তুলিয়া রেখো
তমালেরই ডালে।

রাধাতত্ত্বের গান ধরেছে উদ্ধব।

গলাখান ভারি মিঠা। সুরকে হৃদয়ের রসে জারিয়ে উদ্ধব গায়। গলা থেকে মানিনী রাধার বেদনা যেন ক্ষরে ক্ষরে পড়ে।

রসিক শীল খোলে চাটি মারতে মারতে বলে, 'আহা, কী গান শুনাইল উদ্ধব, বড় বাহারের গান!'

'আহা!'

আসর ভরা মানুষ বিভোর হয়ে গান শোনে। রাধাতত্ত্বের গানে সবাই মজে আছে। সুরের মধ্য দিয়ে অশেষ, মধুর এক বেদনাকে মানুষগুলির অনুভূতির ভিতর ছড়িয়ে দিয়েছে উদ্ধব।

মরিলে তুলিয়া রেখো

তমালেরই ডালে—এ-এ-এ—

সুরটাকে খাদে নামিয়ে পরমুহূর্তেই চড়ায় তুলে দীর্ঘ টান দেয় উদ্ধব। সুরটা যেন সিধা বুকের মধ্যে বিঁধে যায়। প্রাণের ভিতর কোন একটা অবুঝ তার যেন তির তির করে কাঁপে। শুধু কাঁপেই না, ককাতেও থাকে।

ঘরের এক কোণে বসে বসে বুড়ী বাসিনী, মনোরঞ্জন সানা, অক্রুর বিশ্বাস, এমনি অনেকেই হাতের পিঠে চোখ মুছছে।

রাধাতত্ত্বে আসর যখন মেতে আছে, ঠিক সেই সময় চিকন মাজা ঢুলাতে ঢুলাতে, আঙুল মটকাতে মটকাতে উদ্ধবের ঘরে ঢুকল কুমী। টেনে টেনে বলল, 'খুব তো আসর জমাইছ!'

কুমীকে ঢুকতে দেখেই গান থামিয়ে দিয়েছে উদ্ধব। গান থেমেছে কিন্তু তার রেশটা এখনও যায় নি।

একটু আগে এই ঘর, ডিগলিপুরের এই সেটেলমেণ্ট, এই দ্বীপ—সমস্ত কিছু উদ্ধবের গানের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। এই ঘরের মানুষগুলো যমুনা পুলিনের চিরকালের এক ব্যথায় মগ্ন হয়ে ছিল।

কিন্তু উদ্ধবের গানই তো শেষ কথা নয়। তারপরেও অনেক কিছু আছে। আছে জীবন।

উদ্ধবের গানের স্বপ্নলোক কতক্ষণ আর তাদের আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে! জীবন থেকে কতক্ষণ বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারে!

কুমী আগের কথাটাই আবার বলল, 'খুব তো আসর জমাইছ! উই দিকে কি হইছে, খবর রাখ?'

কোল থেকে খোল নামাতে নামাতে রসিক শীল বলল, 'কী হইছে লো কুমী?'

'কী হইতে বাকী আছে?'

মাজা বাঁকিয়ে গালে একখান হাত রেখে কুমী দাঁড়াল।

কুমীকে দেখলেই ডিগলিপুরের বাসিন্দাদের বুক কাঁপে। তার সঙ্গে গূঢ়, গোপন এবং ভয়ানক সব খবর ঘোরে। কোন ঘরে সোয়ামী-স্ত্রীতে বনিবনা নেই, কোন মেয়ের শরীর নষ্ট, কোন বউ নিশিরাতে উঠে নাগরের কাছে ঢলাতে যায়, কেমন করে যে সে এ সবের গন্ধ পায়, কুমীই জানে। তার নাক চোখ, সমস্ত ইন্দ্রিয় বড় প্রখর। বড় ধারাল।

এই সব খবর যোগাড় করে সেটেলমেণ্টের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায় কুমী। সবার কানে খবরগুলি না দেওয়া পর্যন্ত তার সোয়াস্তি নেই।

কুমীর রকম সকম দেখে, কথা শুনে মানুষগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে।

বুড়ো রসিক শীল বলল, 'রঙ্গ করবি না আসল কথাখান ক'বি (বলবি)?'

কুমী ঠোঁট টিপে টিপে হাসে। মুখে কিছুই বলে না। এটা তার স্বভাব। একবারে খবরটা সে দেয় না। রসিয়ে রসিয়ে মজিয়ে মজিয়ে মানুষের উদ্বেগকে চরমে পৌঁছে দিয়ে খবরটা সে ফাঁস করে। এতেই তার সুখ।

রসিক শীল অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'হাসন রাখ কুমী। কথাখান কইয়া (বলে) যত পারিস হাস।'

রসিক শীলই এতক্ষণ কথা বলছিল। আর সকলে চুপচাপ বসে ছিল।

এবার বুড়ী বাসিনী মুখ খুলল, 'মাগী রঙ্গী, ঢঙ্গী। রঙ্গ কইরাই (করেই) বাঁচে না! অনেক হইছে। এইবার ক' (বল)।'

ভরা আসরের উপর দিয়ে চোখ ছুটো ঘুরিয়ে নিয়ে গেল কুমী। বুঝল, মানুষগুলো খবরটা জানার জন্য উদ্‌গ্রীব, অস্থির হয়ে উঠেছে। বিচিত্র এক তৃপ্তিতে কুমীর মনটা ভরে গেল।

আসরসুদ্ধ মানুষ এবার তাড়া লাগাল, 'কও-কও, তরাতরি কও। মানুষেরে তুমি বড় জ্বালা দিতে পার। কমু কমু কইরাও (করেও) কও না। মন খান উচাটন কইরা রাখ।'

চোখের তারা ছুটো কাঁপিয়ে অল্প একটু হাসল কুমী।

এতক্ষণ ছুয়ারের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। এবার সিধা আসরের মাঝখানে ঢুকে বসে পড়ল।

পানের রসে জিভ লাল করে এসেছিল কুমী। জিভটা সরু করে বার করে শুকনা ঠোঁট ছুটো চেটে চেটে ভিজাল। তারপর বলল, 'কমু, সগল কথাই কমু। কিছুই লুকামু না, কোন কথা ছাপামু না।'

কে যেন ফিস ফিস করে, 'মাগী কত রঙ্গই না জানে!'

কথাটা শুনেও গায়ে মাখল না কুমী। সব কথা ধরতে গেলে কি চলে!

কুমী শুরু করল, 'আঁই গো রসিক খুড়া, আঁই গো বাসিনী মাউই, তোমরা তো ডিগলিপুরের কোলোনির মাথা—'

রসিক শীল বলল, 'তাতে হইছে কী?'

'হইব আবার কী!'

কুমী ঝেঁঝে উঠল, 'হইছে তোমাগো (তোমাদের) মাথা।'

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ কুমীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল রসিক শীল। কুমীর রকম সকম, কথা, কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। আস্তে আস্তে সে বলল, 'কী কইস কুমী?'

'ঠিক কথাই কই (বলি)—'

কুমী বলতে লাগল, 'তোমরা তো চোখ বুইজা (বুজে) আছ। উই দিকে কোলোনিতে কী হইয়া গেল, খোঁজ রাখ ?'

'কোলোনিতে আবার কী হইল !'

'হইছে হইছে, ট্যার পাও নাই।'

চোখ মটকে মটকে কুমী হাসে। বলে, 'উই যে নিত্য তালুই, উপুর থিকা দেখলে মনে হয়, ভাজা মাছখান উল্টাইতে জানে না। কিন্তুক তলে তলে মানুষখান সোজা না।'

'বুঝলি কেমনে ?'

'বুঝলাম, বুঝলাম—'

চোখের পাতা নাচিয়ে নাচিয়ে হাসতেই থাকে কুমী। তার হাসিতে ধার আছে কিন্তু শব্দ নেই।

রসিক শীল বলে, 'নিত্য আবার কী করল ?'

'বিদেশীরে ঘরে এনে তুলছে।'

'বিদেশী !'

আসরভরা মানুষগুলো তাজ্জব হয়ে বসে থাকে।

কুমী থামে না, 'খালি বিদেশী না, বিজাত-কুজাত। শুনলাম্—'

'কী শুনলি ?'

'শুনলাম, নিত্য তালুই বিদেশীরে ঘরেই রাখব।'

'ঘরে রাখব !'

'সেই কথাই শুনলাম। শুনলাম আর একখান ঘর তুলব।'

উদ্ধবের ঘরে প্রথমে গুন্ গুন্, পরে ভনভনানি শুরু হ'ল। মনোরঞ্জন, অক্রুর, বুড়ী বাসিনী, হারাণ, যোগেন—সবাই একসঙ্গে কথা কয়। অদ্ভুত এক উত্তেজনায় ডিবের ধোঁয়া ধোঁয়া তামাটে আলোতে মানুষগুলোর মুখ চকচক করে।

রসিক শীল ক্ষেপে উঠল, 'এ কেমুন কথা, আমরা কি মরছি! আমাগো (আমাদের) জানাইল না, শুনাইল না। লুকাইয়া

ছাপাইয়া বিদেশীরে বিজাতিরে ঘরে এনে তুলল। আমরা থাকতে বিদেশী-বিজাতি আপন হইল। মানের ডর নাই! ধম্মের ডর নাই!'

কুমী জুড়ে দিল, 'তার উপুর ঘরে ডাকাবুকা, যুবতী মেয়ে আছে। ডর নাই গো খুড়া, শরম-ভরমের ডর নাই।'

'এর একখান বিহিত করন লাগে।'

সবাই রুখে উঠল।

'কী বিহিত করবা? নিজের ঘরে যদি কেও অজাত-বিজাত-কুজাত, তার পরানের বান্ধবরে এনে তোলে, তুমি আমি কী করতে পারি খুড়া?'

বলে আর মিটির মিটির হাসে কুমী। কুমীর মনে কী আছে, তার দিশা সে নিজেই কী পায়?

খবরটা এনে সবাইকে দিতে পেরেছে। এতেই কুমীর শখ মিটেছে। আর এই শখটা মিটিয়েই তার যত সুখ, যত সোয়াস্তি। এর পর চুলাচুলি, লাঠালাঠি, যা করতে হয়, রসিক শীলরাই করবে। তার কাজ শেষ।

কুমী উঠে পড়ল। মাজা ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে যেমন এই ঘরে ঢুকেছিল, ঠিক তেমনিই চলে গেল।

কী বিহিত করা উচিত, ঠিক এই মুহূর্তে ভেবে উঠতে পারল না রসিক শীল। লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে সে শাসাতে লাগল, 'সোমাজের ডর নাই? সোংসারের ডর নাই? নিত্যার বুকের পাটাখান কত বড় হইছে, দেখুম। আসুক পাল সাহেব, আসুক—'

ঘরের এক কোণে ঝিম মেরে বসে আছে হারাণ।

কুমী বিদেশীর নাম বলে যায় নি। তবু তার মনে কু ডাক উঠেছে। কেন জানি তার মনে হচ্ছে, সে দিনের সেই কুচকুচে কালো, পুরু ঠোঁট, কোঁকড়ানো চুল লোকটা, নাম যার পানিকর, তাকেই ঘরে এনে তুলেছে নিত্য ঢালী।

বিয়াল্লিশ

সমস্ত রাত ঘুমাতে পারল না হারাণ। মাথাটা গরম হয়ে রইল। মাথায় এত তাপ নিয়ে ঘুমানো যায় না।

এমনিতে বিছানায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ জুড়ে যায়। নাকের ডাক শুরু হয়। কিন্তু আজকের রাতের কথা ভিন্ন।

বুকের মধ্য থেকে একটা অবুঝ, অসহ্য কান্না দুর্জয় বেগে উঠে এসে কণ্ঠার ঠিক কাছে দলা পাকিয়ে যাচ্ছে। কান্নাটা গলা ফুঁড়ে বেরোয় না, নামেও না। অনড়, নিরেট হয়ে থাকে।

গলাটা ভারী হয়ে উঠেছে। ঢোক গিলতে পারছে না হারাণ। মনে হয়, একরাশ তেতো, ধারাল বালি তালুতে আটকে আছে।

চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করছে।

ঠিক শিয়রের উপরেই একটা বাঁখারির জানলা। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল হারাণ।

এটা বছরের মধ্যম ঋতু।

এখন শীতের গাঢ়তা নেই। কুয়াশায় ঘনতা নেই। জানলাটার ওপাশ থেকেই একটা মিহি, আবছা আবছা পর্দা ঝুলছে।

এখনকার কুয়াশা বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে না। তার গায়ে আলগা, উদাসভাবে জড়িয়ে থাকে।

আজ কি তিথি হারাণ জানে না।

দ্বীপের মাথায় চন্দনের পাটার মত গোল একটি চাঁদ দেখা

দিয়েছে। ঝিনিক ফোটা জ্যোৎস্নায় ডিগলিপুরের এই সেটেল-মেন্টটা ভেসে যাচ্ছে। দূরের টিলা, জঙ্গল আর পাহাড়ের মাথাগুলি চকচক করছে।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল হারাণ।

জানলাটার ঠিক ওপাশে কতকগুলো পুরুষ জোনাকি জ্বলছে আর নিবছে। জ্বলে জ্বলে, উড়ে উড়ে তারা মেয়ে জোনাকিদের ফুসলাচ্ছে।

দ্বীপের মাটি থেকে ভিজা ভিজা বুনো গন্ধ উঠে আসছে।

ঝিনিক ফোটা চাঁদের আলো, পুরুষ জোনাকিদের জ্বলা আর নেবা, দ্বীপের মাটির ভিজা ভিজা গন্ধ—কোন দিকেই মন নেই হারাণের।

বাতাসে হিমের আমেজ মিশতে শুরু করেছে। কেমন যেন শীত শীত করে। পায়ের কাছ থেকে কাঁথাটাকে তুলে গলা পর্যন্ত টেনে দিল হারাণ।

ঘরের ওপাশে আর একটা মাচান। সেখানে বুকে হাঁটু গুঁজে কুণ্ডলী পাকিয়ে উজানী বুড়ী ঘুমাচ্ছে। ক্লান্ত, মন্থর, বড় বড় শ্বাস ফেলছে। বুকের মধ্য থেকে কেমন যেন অস্বচ্চ, ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে।

কান খাড়া করে অনেকক্ষণ উজানী বুড়ীর নিশ্বাসের শব্দ শুনল হারাণ। শ্বাস ফেলা আর শ্বাস টানাই না। মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে উজানী বুড়ী। কেন কাঁদছে কে জানে?

হারাণের একবার মনে হ'ল, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে উজানী বুড়ী কাঁদছে। বুড়ো মানুষ কি স্বপ্ন দেখে কাঁদে? হয়ত বা।

কিন্তু না, কোন ভাবনাই মনের সেই আসল ভাবনাটাকে সরিয়ে দিতে পারল না। দাবিয়ে রাখতে পারল না। বার বার ঘুরে ঘুরে সেই ভাবনাটা মাথায় বিঁধতে লাগল।

না, আজ আর হারাণের ঘুম আসবে না।

একবার উঠে কলস থেকে জল নিয়ে চোখেমুখে ছিটিয়ে এল হারাণ। কিন্তু যে চোখ জিদ ধরেছে, ঘুমাবে না, জোড়া লাগবে না, হাজার জল ছিটিয়েও কী তাকে জোড়া লাগানো যায়!

অগত্যা আবার মাচানে এল হারাণ। টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থাকার পরই ছটফটানি শুরু হ'ল। মাচানের এপাশ ওপাশ করতে লাগল সে।

সেই দুঃখের দিনগুলি হুবহু মনে করতে পারে হারাণ। দুঃখের দিনকে মানুষ কি ভোলে, না ভুলতে পারে? থেকে থেকে সে যে সুঁচের মুখের মত বিঁধতে থাকে।

সুখের দিনের কথা মানুষ ভোলে। কিন্তু দুঃখের দিনের বড় জ্বালা! বড় পোড়ানি! গিয়েও সে যায় না। অস্তিত্বের সঙ্গে একটা খরধার কাঁটা হয়ে মিশে থাকে। একটু নিরালা বসে বসে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু করলেই সেই কাঁটাটা খচখচ করে ওঠে।

সোয়া দুই বছর আগে শীতের এক ভোরে গোয়ালন্দের স্টীমার ঘাটাটা কুয়াশা আর গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল।

স্টীমার থেকে নেমে একদল মৃতমুখ, নিঃস্ব মানুষ—মেয়ে-মরদ-জোয়ান-বুড়ো-বউ-বাচ্চা, সকলে মিলে দলা পাকিয়ে বসে ছিল। তারা জানে না, সাতপুরুষের ভিটামাটি, ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে কোথায়, কোন অন্ধ নিয়তির টানে তারা চলেছে!

শুধু এটুকু তারা জানে, যেমন বাতাস তেমনি আছে, যেমন নদী তেমনই বইছে, মাটির উপর রেখ পড়ে নি, তবু নাকি দেশখান দু-ভাগ হয়ে গিয়েছে। আর জানে, সাতপুরুষের ভিটামাটির উপর তাদের আর দাবী নেই। দেশের সঙ্গে বত্রিশ নাড়ির যোগ। সেই যোগ কেটে তারা ভেসে পড়েছে।

আপাতত তারা গোয়ালন্দের স্টীমার ঘাটায় এসে পৌঁছেছে। এখান থেকে বর্ডার অর্থাৎ পশ্চিম বাঙলার ট্রেন ধরবে। বর্ডার পর্যন্তই তাদের জানা আছে। বর্ডারে পৌঁছে তারা কোথায় যাবে, সে ঠিকানা জানা নেই।

জড়াজড়ি গাদাগাদি করে মানুষগুলো চুপচাপ বসে ছিল। তাদের নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছিল না।

চারপাশে প্রচুর জায়গা। তবু কেন যে মানুষগুলো জড়াজড়ি গাদাগাদি করে বসে ছিল, তারাই জানে।

হঠাৎ মানুষগুলোকে ভয়ানকভাবে চমকে দিয়ে তীব্র, অবুঝ হাসির শব্দ উঠেছিল। শোর তুলে সেই মেয়েটাই বুঝি হাসছে। এই দুঃসময়ে সে ছাড়া কে-ই বা হাসতে পারে!

মানুষের পিণ্ডটার মধ্যে হারাণ আর উজানী বুড়ীও ছিল।

কনুই দিয়ে হারাণকে আস্তে একটা ঠেলা মেরেছিল উজানী বুড়ী। ফিস ফিস করে বলেছিল, 'সেই মাগীটা রে হারাণ, সেই হাসনি ঢলানি—'

'হুঁ—'

অস্ফুট একটা শব্দ করে হারাণ চুপ করে গিয়েছিল।

উজানী বুড়ীর গজগজানি থামে নি, 'সারাটা ইস্টিমার মাগী ঢলাইতে ঢলাইতে জ্বালাইতে জ্বালাইতে আসছে।'

একই স্টীমারে মুন্সীগঞ্জ থেকে তারা গোয়ালন্দে এসেছে। অন্য মানুষ যখন দেশ হারানোর শোকে শোর তুলে কেঁদেছে, ঐ মেয়েটা তখন সারা শরীর ঢুলিয়ে ককিয়ে ককিয়ে হেসে উঠেছে। কি সুখে যে সে হাসে, সে-ই জানে।

গোয়ালন্দে নেমেও সে হাসি থামে নি।

উজানী বুড়ী বলেছিল, 'শরম নাই, ভরম নাই—ডাকাবুকা মাগী সগল কিছুর মাথা খাইয়া হাসে। আমরা মরি আমাগো (আমাদের) জ্বালায়। ভাশ গেল, ভিটা গেল। কোথায় যাইতে

আছি, জানি না। ডরে বুকখান কলার পাতের লাখান (মত) থরথরাইয়া কাঁপে। আর মাগী কিনা হাসে! হা ভগমান, কত নীলাই না দেখাইলা!'

আশে পাশে তিন চারটে মানুষের পিণ্ড রয়েছে। ঠিক কোথা থেকে যে মেয়েটা হাসছে, বোঝা যায় না।

মাথা তুলে বার দুই দেখার চেষ্টা করল হারাণ। কিন্তু অন্ধকার আর কুয়াশা ফুঁড়ে দৃষ্টি চলে না।

এক সময় মেয়েটার অবুঝ অস্বাভাবিক হাসি থেমে গেল।

অনেক দূরে স্টীমার ঘাটায় আলো জ্বলছিল। সেই আলো এখান পর্যন্ত এসে পৌঁছায় নি।

পৃথিবীর উপর, জীবনের উপর সমস্ত দাবী এবং দখল ছেড়ে মানুষগুলো পালিয়ে যাচ্ছে। আলোর সীমানার বাইরে এই ঘুর-ঘুট্টি অন্ধকারে তারা নিঃশব্দে নিজেদের লুকিয়ে রেখেছে। এখন তাদের আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। সবাই মিলে মানুষের একটা দলা, একটা পিণ্ড। যতক্ষণ না বর্ডারের গাড়ি আসবে, এই মানুষ-গুলো পিণ্ড পাকিয়ে বসে থাকবে।

এই মানুষগুলোর আলাদা আলাদা নাম ছিল, আলাদা আলাদা চেহারা ছিল, অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু দেশভাগ তাদের সবাইকে একটি মাত্র নাম, একটি মাত্র চেহারা এবং একটি মাত্র অস্তিত্ব দিয়ে একাকার করে ফেলেছে। তারা রিফুজী।

কুয়াশা কেটে যাচ্ছিল। অন্ধকার ছিঁড়ে ছিঁড়ে পুবের আকাশ 'ফরসা হতে শুরু করেছিল।

স্টীমার ঘাটায় এখনও আলো জ্বলছে। গাধাবোটের জেটিটা অল্প অল্প দুলছে। আলোতে নদীর জল কালো কাচের মত ঝকমক করছে।

ঘাড় গুঁজে সবার সঙ্গে একাকার হয়ে বসে ছিল হারাণ। আগের ছুটো রাত একটুও ঘুমাতে পারে নি।

চোখ ঢুলে আসছে। ঘাড়টা আপনা থেকেই হাঁটুর উপর ভেঙে পড়ছে। পৃথিবীর সব ঘুম হারাণের চোখে ভর করেছে।

হঠাৎ গম্ভীর, কর্কশ শব্দ উঠল। স্টীমারের ভোঁ। স্টীমারের চাকার বাড়ি খেয়ে জল গেঁজে উঠতে লাগল। স্টীমার নারায়ণগঞ্জ থেকে এসেছিল। আবার বুঝি নারায়ণগঞ্জেই ফিরে যাচ্ছে। নারায়ণগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ, গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জ—দিবা-রাত্রি স্টীমারটার যাতায়াতের কামাই নেই। নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ভাগ্যকূল—নানান ঘাট থেকে পেট বোঝাই করে করে মানুষ এনে গোয়ালন্দে ঢালছে।

এই স্টীমারেই হারাণরা এসেছে।

স্টীমারের আওয়াজে মাথা তুলল হারাণ। আর মাথা তুলেই চমকে উঠল।

আবছা আবছা আলোতে চোখে পড়ল, বাঁ পাশে রেলের লাইন।

এখন পর্যন্ত গাড়ি আসে নি। গাড়ি আসতে আসতে ছুপুর হয়ে যাবে।

রেল লাইনের উপর এক দলা মানুষ। মানুষগুলোর মধ্য থেকে সেই যুবতী মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছে। তীব্র, অস্বাভাবিক শব্দ করে হেসে হেসে ঢলে ঢলে পড়ছে। হাসির দমকে শরীরটা বেঁকে ছুমড়ে যাচ্ছে।

মেয়েটাকে স্টীমারেও হাসতে দেখেছে হারাণ।

নদীর দিক থেকে জলো বাতাস হু হু করে ছুটে আসছে। মানুষগুলো শীতে হি হি কাঁপছে।

একটা কাঁথা জড়িয়ে চুপচাপ বসে ছিল হারাণ।

পুবের আকাশে অন্ধকার আর কুয়াশা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল।

এখন সব কিছুই অস্পষ্ট। চারপাশের মানুষগুলোর আকার বোঝা যায় কিন্তু তাদের চোখের ভাষা পড়া যায় না, মুখের রং বোঝা যায় না।

কনুই দিয়ে হারাণের পাঁজরে আস্তে ঠেলা মারল উজানী বুড়ী। বলল, 'উই যে রে হারাইণা (হারাণ), মাগীটা আবার হাসে।'

হারাণ কিছু বলে না।

উজানী বুড়ী সমানে বকে যায়, 'মাগী এত ঢলায় কেমনে? ভ্যাশ গেল, ভিটা গেল, মাটি গেল, সগল খাইয়া এসেও মাগীর বুক কাঁপে না! মাগী খালি হাসে। ভগমান, মাগীর অঙ্গে তুমি এত হাসনও দিছিলা!'

হারাণ হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল, 'চুপ মার ঠাকুরমা—'

হারাণের মুখের দিকে চেয়ে কি বুঝল, উজানী বুড়ীই জানে। থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

মেয়েটা তখনও হাসছে। কলকলিয়ে, মেতে মেতে, শরীরটাকে ঢলিয়ে, বাঁকিয়ে চুরিয়ে অবিরাম হাসছে। হাসি তার থামে না। হারাণের মনে হ'ল, হাসা বুঝি মেয়েটার ব্যারাম।

কান খাড়া করে হাসির অবুঝ, অস্বাভাবিক শব্দ শুনতে লাগল হারাণ।

ঠাসবোনা অন্ধকার আগেই ছিঁড়ে গিয়েছিল। কুয়াশার পর্দাটা ফেঁসে গিয়েছিল। এখন পুবের আকাশে দিনের প্রথম সূর্য সবে মাত্র মাথা তুলেছে। স্নিগ্ধ, নরম আলো ফুটেছে। সে আলোতে তাপ নেই, জ্বালা নেই। বড় কোমল, বড় মধুর একটু আলো।

নারায়ণগঞ্জের স্টীমারটা চলে গিয়েছে।

এখন জোয়ারের মাতামাতি নেই, ভাটির ঢলানি নেই। জোয়ার আর ভাটির ঠিক মাঝামাঝি নদী এখন স্থির, নিরুত্তেজ। ছোট ছোট পলকা ঢেউগুলো দূর থেকে তরল কাচের মত দেখায়। ছোট ঢেউয়ের ছোট খেয়ালে জেলেডিঙিগুলি টলমল করে।

হারাণ নদী দেখছিল না। সকালের প্রথম নরম আলো কি জেলেডিঙি দেখছিল না। একদৃষ্টে সে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ছিল।

মেয়েটা ঘোরের মধ্যে হাসছে।

একটা আধাবয়সী লোক, মাথায় যার কাঁচা পাকা চুল, চোখা চোখা নোংরা গোঁফদাড়ি, গোরুর মত অবোধ চাউনি, মেয়েটার হাত ধরে বলছে, 'অমুন করে না, অমুন হাসে না। থির হ কাপাসী, থির হ।'

মেয়েটার নাম তবে কাপাসী!

আধাবয়সী লোকটার কথায় কাপাসী স্থির হয় না। কলকলিয়ে হাসতে হাসতে বলে, 'নিজের ইচ্ছায় কি হাসি বাবা! বুকের ভিতর থিকা হাসন উথলাইয়া উথলাইয়া ওঠে। পারি না বাবা, সেই হাসনেরে ঠেকাইতে পারি না।'

কাপাসীর হাত ছেড়ে লোকটা হাউ হাউ করে কাঁদে। কাঁদে আর কপাল থাপড়ায়। কপাল থাপড়াতে থাপড়াতে বলে, 'ভগমান আমার আর বাঁচনের সাধ নাই। আমারে শ্যাষ কর। আমারে নাও। আর পারি না। এই দুঃখু আর সইতে পারি না।'

তার চোখ ফেটে টস টস করে লোনা জল ঝরতে থাকে।

কখনও কলকলিয়ে হেসে, কখনও চুপচাপ উদাস চোখে আকাশ কি নদীর দিকে তাকিয়ে থেকে দুপুর পর্যন্ত কাটিয়ে দিল কাপাসী।

দুপুরের তীব্র, উত্তেজক রোদে গোয়ালন্দের স্টীমার ঘাটা, নদীর ঢেউ আর আকাশ যখন জ্বলছে, ঠিক সেই সময় বর্ডারের গাড়ি এল।

দলা পাকানো মানুষগুলো ঝিম মেরে বসে ছিল। মাঝে মাঝে অনুচ্চ, অস্ফুট শব্দ করে গেঙিয়ে গেঙিয়ে কাঁদছিল।

বর্ডারের গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলো শোর তুলে কাঁদতে শুরু করল।

সাত পুরুষের ভিটামাটি হারিয়ে এসেছে। সেই শোকে দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে তারা শেষবারের মত কাঁদছে। বর্ডারের ওপারে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, তারা জানে না। সেই ভয়ে কাঁদছে। শোক এবং ভয়ের মিশ্র কান্নার শব্দে গোয়ালন্দের স্টীমার ঘাটা থমথম করছে।

আকাশটা গলা কাঁসার মত ঝকঝক করে। তার নীচে একটা অন্ধ, অনিবার্য নিয়তির মত বর্ডারের ট্রেনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পুঁথিপুস্তকে কয়েকটা অক্ষর বসল। আর সেই অক্ষরগুলির কারসাজিতে নিজের দেশ আর নিজের রইল না। সাতপুরুষের ভিটামাটির উপর নিজের দাবী কি দখল থাকল না।

এখন পৃথিবীর কোথাও এই মানুষগুলির নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই।

এই মানুষগুলো জানল না, বুঝল না, কেন তাদের দেশ হারাতে হচ্ছে। কি এক অসহ্য, অবুঝ তাড়নায় শোর তুলে চেঁচাতে চেঁচাতে, হুড়মুড় করে, ঊর্দ্ধশ্বাসে তারা ট্রেনের কামরাগুলির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

হাজার চেষ্টা করেও হারাণ নজর রাখতে পারল না। ভিড়ের মধ্যে ভাসতে ভাসতে কাপাসী আর সেই আধাবয়সী মানুষটা কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

সন্ধ্যার পর ট্রেন ছেড়ে দিল।

মানুষ না, যেন দেশভাগের মর্মান্তিক শোকটাকে বয়ে বর্ডারের ট্রেন অন্ধকার ফুঁড়ে ফুঁড়ে ছুটে চলল।

মানুষগুলো আর কিছু জানুক আর নাই জানুক, সহজ বুদ্ধিতে এটুকু বুঝেছে, এই যাত্রা অনন্ত, অফুরন্ত, অশেষ দুঃখের যাত্রা।

দেশের মাটির বাইরে কোনদিন তারা পা বাড়ায় নি। এই

তাদের প্রথম বাইরে বেরুনো। এখানে, এই পদ্মা-মেঘনার দেশে আর কোনদিন তারা ফিরবে না।

বর্ডারের ট্রেন দেশের বাইরেই ফেলে আসে। ফিরিয়ে আনে না।

বাইরে কালো, নিরেট অন্ধকার। আজ কি তিথি, কে জানে। খুব সম্ভব অমাবস্যা।

অমাবস্যার অন্ধকার একটা অসহ্য শোককে, একটা নিদারুণ দুর্ভাগ্যকে ঢেকে, পৃথিবীর সব কিছুর কাছ থেকে আড়াল করে বর্ডারের দিকে নিয়ে চলেছে।

মানুষগুলো এর মধ্যেই জেনে ফেলেছে, তাদের আর আলাদা আলাদা জাত নেই, আলাদা আলাদা নাম নেই। বুঝিবা আলাদা চেহারাও নেই। একই দুর্ভাগ্য তাদের সবাইকে একটা মাত্র নাম দিয়েছে। সে নামটা হ'ল 'রিফুজী'।

বর্ডারগামী ট্রেনের সমস্ত মানুষই এখন এক। তাদের শোক দুঃখ, যন্ত্রণা—সমস্ত কিছুই অভিন্ন।

বাঙ্কে, বেঞ্চের উপরে নীচে অজস্র মানুষ। পা ছড়িয়ে যে বসবে তার উপায় নেই। হাঁটু মাথা এক করে কুণ্ডলী পাকিয়ে সবাই বসে আছে।

গোরুর মত অবোধ, ভয়াতুর চোখ। আশ্চর্য! সকলের চোখমুখের চেহারা অবিকল এক।

মানুষগুলো ঝিম মেরে বসে থাকে। মাঝে মাঝে অন্ধকার রাত্রিটাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে ভোতা, খ্যাসখেসে গলায় বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। আশ্চর্য! একই দুর্ভাগ্যের শরিক হয়ে তাদের কান্নার শব্দও হুবহু একরকম হয়ে গিয়েছে।

এক কোণে বসে বসে হারাণ ঢুলছিল। হাঁটুর চোখা হাড়ে

কপালটা বার বার ঠুকছিল। তার পাশেই বসে ছিল উজানী বুড়ী।

চারপাশের মানুষগুলো বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিল।

কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়ে মানুষগুলো এক একবার থামে। আবার নতুন উদ্যমে শুরু করে।

হারাণ ভাবতে চেষ্টা করল, কখন থেকে এই মানুষগুলো কাঁদছে? উজানী বুড়ী আর সে মুন্সীগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দের স্টীমারে উঠেছিল। সেখান থেকেই মানুষগুলোকে কাঁদতে দেখেছে। তাদের কাঁদতে দেখে নিজেরাও কেঁদেছে।

তারপর স্টীমারটা তারপাশা, ভাগ্যকূল, রাজাবাড়ি—নানান ঘাটে ভিড়ে অনেক যাত্রী তুলে গোয়ালন্দ রওনা হয়েছিল। যত বারই যাত্রী উঠেছিল, ততবারই স্টীমারে কান্নার শোর পড়ে গিয়েছিল।

দেশের মাটি হারিয়ে কান্নাকে সঙ্গী করে তারা বর্ডারের দিকে চলেছে। কপালে কি আছে কে জানে!

উজানী বুড়ী ডাকল, 'হারাণ—'

'কী কও?'

হাঁটুর উপর থেকে মাথা না তুলেই হারাণ বলেছিল।

'কী আর কমু ভাই? সেই পুরান কথাই কই (বলি)।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উজানী বুড়ী বলেছিল, 'এই যে অচিনা (অচেনা) ছ্যাশে যাইতে আছি, আমাগো (আমাদের) কী হইব রে দাদা?'

'সগলের যা হইব, আমাগোও (আমাদের) তাই হইব।'

'ঠিকই। কিন্তুক—'

'কিন্তুক আবার কী?'

মাথা তুলে বসল হারাণ। চোখদুটো টকটকে লাল, যেন দু পিণ্ড রক্ত জমাট বেঁধে আছে। সে বলল, 'কিন্তুকের আবার কী হইল?'

বাপ শ্বউরের ভিটায় আবার ফিরে আসতে পারুম তো ?'

হারাণ জবাব দিল না। জানালার বাইরে নিরেট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল।

উজানী বুড়ী খেঁকিয়ে উঠল, 'ড্যাকরা কথা কইস না ক্যান ? এই যাওনই কী আমাগো (আমাদের) শ্যাষ যাওন ?'

'কী জানি ?'

'আর কি আমরা ফিরুম না ?'

হাউ হাউ করে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে, বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কাঁদতে শুরু করল উজানী বুড়ী। কাঁদে আর বলে, 'ড্যাকরারা, যমের অরুচিরা—যারা আমাগো (আমাদের) ভিটা-মাটি থিকা খেদালি, পাতা সোংসার ভেঙ্গে দিলি, তারা কুনোদিন সুখ পাবি না। তোগো (তোদের) ভরা ভোগে ছাই পড়ব। তোগো (তোদের) সোংসার ছারেখারে যাইব। আমাগো (আমাদের) মত তোরাও বুক থাপড়াবি, কানবি (কাঁদবি)। কপাল ভাঙলেও এট্টু সুখ পাবি না। তোরা মর, গুষ্টিসুদ্ধা নিঃবংশ হ।'

উজানী বুড়ী জানে না, কে তাদের সাজানো সংসার ভেঙে দিল, কে তাদের সাত পুরুষের ভিটামাটি উৎখাত করল। কে তাদের বড় সুখের বড় সাধের জীবনটাকে এমন তছনছ করে দিল। না জেনেও সে শাপাশাপি করে। হাউ হাউ কাঁদে।

মানুষগুলো কেঁদে কেঁদে ঝিমিয়ে পড়েছিল। গাড়ীর দোলানির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চোখ বুঁজে ঢুলছিল। উজানী বুড়ীর কান্নার শব্দ শুনে সবাই চোখ মেলল। পিট পিট করে তাকাতে লাগল। তারপর নতুন উৎসাহে কাঁদতে শুরু করল।

মাঝ রাত্রিতে বর্ডারগামী ট্রেনটা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। খুব সম্ভব লাইন ক্লিয়ার নেই।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল গাড়িটা। ইঞ্জিনের ক্লান্ত হৃৎপিণ্ডটা ধস্ ধস্ করে আওয়াজ করতে লাগল।

মানুষগুলো চুপচাপ বসে ছিল।

হঠাৎ বাইরের গাঢ় অন্ধকার আর সীমাহীন মাঠকে ভয়ানক ভাবে চমকে দিয়ে শব্দ উঠল। তীব্র, অবুঝ, অস্বাভাবিক হাসির শব্দ। শব্দটা ঠিক পাশের কামরা থেকে আসছে।

হারাণের কাঁধে মাথা রেখে উজানী বুড়ী ঘুমিয়ে পড়েছিল। হাসির আওয়াজে ধড়মড় করে উঠে বসল। বলল, 'সেই হাসনি ঢলানি মাগীটা, বুঝলি হারাইণা (হারাণ)? মাগীর হাসন ঘোচে না। কুন চুলায় যাইতে আছি, জানি না। বাঁচুম না মরুম, তার দিশা নাই। মাগী তো হাসে! কী সুখে হাসে, ভগমানই জানে!'

অনেকেই সায় দেয়, 'হ-হ, এমুন বেতরিবত মেয়েমানুষ বাপের বয়সে দেখি নাই। ডর নাই, শরম নাই। সগল কিছুর মাথা ˋাইয়া বসছে।'

'ডাকাবুকা মাগী।'

ডাকাবুকা না ডাকাবুকা! মাগী যত অমঙ্গলের হাসন হাসে!'

উজানী বুড়ী গজ গজ করে।

হারাণ বলে, 'থাম দেখি ঠাকুরমা। হাসে হাসুক, কান্দে (কাঁদে) কান্দুক, পরানে যা চায়, তা করুক। তোর আমার কী?'

উজানী বুড়ী ঘোলা ঘোলা চোখে একবার হারাণের মুখের দিকে তাকিয়ে টেনে টেনে বলেছিল, 'হাসনি মাগীর লেইগা (জন্য) খুব যে টান!'

'হ টান! তুই এইবার থাম বুড়ী।'

হারাণ ধমকে উঠেছিল।

ভোরের দিকে বর্ডারের ট্রেন আবার চলতে শুরু করেছিল।

বানপুর, দর্শনা—নানান ঘাটে ঠেক খেতে খেতে বর্ডার পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত তারা রাণাঘাট এল।

হারাণের মাথার মধ্যে সেই তীব্র, অবুঝ, অস্বাভাবিক হাসিটা বিঁধে ছিল। কিন্তু রাণাঘাটে এসে হাসনি মেয়েটাকে কোথাও খুঁজে পেল না সে।

অসংখ্য, অজস্র মানুষ।

কামরা, পা-দানি, শুধু কি তাই, ট্রেনের মাথায় উঠে ঝুলতে ঝুলতে এসেছে মানুষগুলো। একটা অন্ধ তাগিদ তাড়াতে তাড়াতে ঝাপটা মারতে মারতে সাতপুরুষের ভিটামাটি থেকে তাদের উৎখাত করে এনেছে।

বউ-বাচ্চা, জোয়ান-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ—যতদূর তাকানো যায়, মানুষ দলা পাকিয়ে আছে। এর মধ্যে কাপাসীকে কোথায় খুঁজে পাবে হারাণ!

বর্ডারের স্লিপ নেবার পর হারাণরা শুনল, রাণাঘাটের রিফুজী ক্যাম্পে জায়গা নেই। পরের ট্রেনেই তাদের কলকাতা যেতে হবে।

কলকাতার ট্রেন যখন শিয়ালদা এসে পৌঁছাল, তখন সন্ধ্যা।

দিনটা মরে মরে অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। হাজারটা আলো জ্বলে উঠেছে।

গাড়ির ঘষঘষ, ইঞ্জিনের তীব্র আকস্মিক হুইসিল, গিজ গিজ ভিড়, ট্রেনের শব্দ, মানুষের হাঁকাহাঁকি, চিল্লাচিল্লি, ছোটাছুটি, সারি সারি ধাঁধানো আলো—চারদিকে তাকিয়ে হকচকিয়ে গেল হারাণ। কোনদিন এত আলো, এত শব্দ, এত মানুষ দেখে নি সে।

কখন যে ভিড়ের মধ্যে ভাসতে ভাসতে উজানী বুড়ীর একটা হাত ধরে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসেছিল, হারাণের খেয়াল নেই।

ফিস ফিস করে উজানী বুড়ী ডাকল, 'হারাইণা (হারাণ) রে—'

'কী কইস ঠাকুরমা ?'

'এই কী কইলকাতা ? এই আমরা আসলাম কুন খানে ?'

হারাণও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কাঁপা গলায় সে বলেছিল, 'হ লো ঠাকুরমা, এই বুঝি কইলকাতা—'

'এইখানে আমরা থাকুম কুন খানে ?'

'দেখি সগলের কী গতি হয় ?'

হারাণের কথা শেষ হবার আগেই কে যেন পিছন থেকে ডাকল, 'এই যে বাবা, এইদিকে—একখান কথা শুনবা ?'

উজানী বুড়ী আর হারাণ ঘুরে দাঁড়াল। দেখল, তাদের ঠিক মুখোমুখি সেই আধাবয়সী মানুষটা কাপাসীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে।

হারাণ বলল, 'আমারে কিছু কইলেন (বললেন) ?'

'হ বাবা একখান কথা—'

'কী কথা ?'

আধাবয়সী লোকটা বলল, 'তোমরাও তো রিফুজী ?'

'হ।'

'ভালই হইল। বিত্তাশ (বিদেশ) জায়গা। চিনা পরিচয় কইরা রাখন ভাল। কখন কুন বিপদ আসে, কে কইব ! আমাগো (আমাদের) তো অখন কথায় কথায় বিপদ, উঠতে বসতে বিপদ। কপাল ভাঙল, ত্যাশ ছাইড়া (ছেড়ে) আসলাম। কুনো দিন যে আবার ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগব, এমুন ভরসা নাই।'

হাউ হাউ করে খানিকটা বকে যায় লোকটা। খানিকটা হাঁপায়। টেনে টেনে দম নেয়। আবার শুরু করে, 'আমার নাম নিত্য ঢালী, এই হইল আমার মেয়ে কাপাসী। তোমার নামখান কী বাবা ?'

'হারাণ।'

উজানী বুড়ীকে দেখিয়ে নিত্য ঢালী বলল, 'এনি তোমার কে ?'

'ঠাকুরমা।'

'ভালই হইল। মাথার উপুর একজন বুড়া মানুষ থাকলে বুকে বল পাওয়া যায়।'

উজানী বুড়ী কিছুই বলছিল না। কিছুই শুনছিল না। একদৃষ্টে কাপাসীর দিকে তাকিয়ে ছিল।

নিত্য ঢালী বলল, 'অখন করন কী? যামু কুন খানে?'

থেমে কি যেন সে ভাবে। তারপর বলে, 'ভাবনা তো লগে লগে আছেই। অখন চল যাই উই কোণায় গিয়া এট্টু থির হইয়া বসি। দুই দিন প্যাটে কিছু পড়ে নাই; এট্টু পা পেতে বসতে পারি নাই।'

চারজনে প্ল্যাটফর্মের এক কোণায় গেল।

সম্বলের মধ্যে খান দুই ছেঁড়া কাঁথা, একখান চট, দুই খান কাপড়, আর খুচরা এবং নোটে মিলিয়ে সাত টাকা কয়েক গণ্ডা পয়সা। দেশ থেকে নিত্য ঢালী এইটুকু বিত্তই আনতে পেরেছে।

নিত্য ঢালী কাঁথা পাতল।

পুরা দু দিন পর চারজনে পা ছড়িয়ে বসল।

নিত্য ঢালী বলল, 'অখন কিছু খাইতে না পারলে বাঁচুম না।'

'ঠিক কথা।'

বাকী তিনজনে সায় দিল।

'চল, কিছু চিড়ামুড়ি কিনা (কিনে) আনি।'

হারাণকে সঙ্গে নিয়ে নিত্য ঢালী উঠে পড়ল।

কথায় বলে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

শ্বাস যখন আছে, বাঁচার আশাও আছে। অন্তত বাঁচার জন্য যোঝাযুঝিটা তো আছে।

সেই যে হারাণরা শিয়ালদা স্টেশনে এসেছিল, তারপর অনেক-গুলো দিন পার হয়ে গেল। তবু প্ল্যাটফর্মের সেই কোণটি ছেড়ে তাদের কোথাও যাওয়া হ'ল না। প্রথম প্রথম শুনেছিল, তাদের রিফুজী ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে।

কিন্তু দিন যায়, মাস ফুরায়, বছরও প্রায় ঘুরে আসে।

প্রায় রোজই 'রিফুজী' অফিসে খোঁজ নেয় হারাণ। রোজই এক জবাব মেলে। ক্যাম্পে জায়গা নেই। ক্যাম্পে তাদের পাঠানো হবে না। একেবারে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। হারাণরা মাটি পাবে, ঘর পাবে। পদ্মা-মেঘনার দেশে যা যা হারিয়ে এসেছে, সবই ফিরে পাবে।

রোজই আশায় আশায় 'রিফুজী' অফিসে যায় হারাণ। বেজার মুখে ফিরে আসে। কবে যে পুনর্বসতি হবে, আদৌ হবে কিনা, কে বলবে।

প্ল্যাটফর্মের উপর হাত চার পাঁচেক জায়গা দখল করে এক একজন ইঁট দিয়ে সীমানা ঠিক করে নিয়েছে। ঐ নিরাবরণ, নগ্ন জায়গাটুকুর মধ্যে বউ-ঝি, মেয়ে-পুরুষ গাদাগাদি করে পড়ে থাকে। কিছুই গোপন নেই, কোন আব্রু নেই। ওখানেই যুবতী গর্ভিণী হচ্ছে। মানুষ জন্মাচ্ছে, মানুষ মরছে। ওখানেই ঘর সংসার, জীবন মৃত্যু, সব কিছু।

হাজার হাজার যাত্রী দিনরাত পাশ দিয়ে যাতায়াত করছে। তাদের সহানুভূতির উপর করুণভাবে নিজেদের উলঙ্গ জীবনের সমস্ত লজ্জা, সম্ভ্রম আর অসহায়তাকে সঁপে দিয়ে একদল ক্ষুধার্ত্ত, বাস্তুহীন জীব দলা পাকিয়ে আছে।

হারাণও হাত পাঁচেক জায়গা দখল করেছে। তার পাশের জায়গাটা নিত্য ঢালীর।

এই একবছরে সুখে দুঃখে, আশায় নিরাশায় পাশাপাশি থেকে

হারাণদের সঙ্গে নিত্য ঢালীদের যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল, তা বড় অন্তরঙ্গ, বড় ঘনিষ্ঠ।

বাঁচার কথা, ভবিষ্যতের কথা কি জীবনের হাজারটা ধান্দার কথা ভেবে যখন আর থই পায় না, তখন একজন আর একজনের কাছে এসে বসে। পরামর্শ করে। একজন যখন হতাশ হয়ে পড়ে, আর একজন ভরসা দেয়।

স্টীমারে, গোয়ালন্দের স্টীমার ঘাটায় এবং মাঝরাত্রে বর্ডারের ট্রেনে যে তীব্র, অবুঝ এবং অস্বাভাবিক হাসি হারাণ শুনেছিল, শিয়ালদা স্টেশনে প্রায়ই তা শোনা যায়।

এমনিতে নিত্য ঢালীর মেয়ে কাপাসী সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষের মতই কথা বলে। কিন্তু মাঝে মাঝে স্টেশনটাকে চমকে দিয়ে কলকলিয়ে, ঢলে ঢলে, মেতে মেতে হেসে ওঠে। হাসির দাপটে গলার শিরগুলি দড়ির মত পাকিয়ে ওঠে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়ে।

আর সব কিছুই সইতে পারে উজানী বুড়ী। কিন্তু এত বড় বিয়ের যোগ্য মেয়ের এমন হাসাহাসি মাতামাতি তার দু চোখের বিষ।

এর মধ্যেই নিত্য ঢালীদের সঙ্গে একটা সুবাদ গড়ে উঠেছে। এক জায়গায়, পাশাপাশি থাকলে আপনা থেকেই সম্পর্ক হয়।

উজানী বুড়ী বলে, 'মেয়ের হাসন সামলা নিত্য।'

নির্জীব গলায় নিত্য ঢালী বলে, 'কী করুম মাসি? আমি কী করতে পারি? তোমারে তো সগলই কইছি। যত দিন কাপাসী বেঁচে আছে, ওর হাসনও আছে। তুমি আমি, পিরথিমীর কেউ ওর হাসন থামাইতে পারব না।'

নিত্যর বুকটা উথলপাথল করে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

উজানী বুড়ী আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। গাঢ় গলায় বলে, 'সগলই বুঝি নিত্য। আমরা না হয় বুঝলাম কিন্তুক মানুষে তো তা মানব না। মানুষের মনে বড় কু চিন্তা।'

অসহায় মুখে নিত্য বলে, 'তুমিই কইয়া (বলে) দাও, কী করুম?'

উজানী বুড়ীদের সব কথাই বলেছে নিত্য ঢালী। সেই সোনারঙ গ্রামখানার কথা, দামিনী বউর কথা, নিশিরাতে যারা এসে বাপমায়ের বুক থেকে কাপাসীকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের কথা। কোন কথাই সে বাদ দেয় নি।

নিত্য ঢালী আবার বলে, 'কী করুম মাসি?'

জবাব দেবার মত একটা কথাও খুঁজে পায় না উজানী বুড়ী।

মাঝে মাঝে উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে কাপাসী। ঝিম দুপুরে অনেক উঁচুতে চিল ওড়ে। কিংবা সন্ধ্যা হলে ধোঁয়াধুলোর শহরের মাথায় প্রথম তারাটি ফুটতে থাকে। সেদিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে মেয়েটা!

ঠিক সেই সময় হয়ত শিয়ালদা বাজারে ঘেয়ো আনাজ কি পচা মাছ কুড়োতে গিয়েছে উজানী বুড়ী। কিংবা জলের কলের দখল নিয়ে চুলাচুলি বাধিয়েছে।

সুযোগ বুঝে কাপাসীর কাছে এসে বসে হারাণ। ফিস ফিস করে ডাকে, 'কাপাসী—'

আকাশের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে হারাণের মুখের উপর ফেলে কাপাসী। কিছু বলে না। তার চোখে অদ্ভুত একটা ঘোর লেগে আছে।

হারাণ আবার ডাকে, 'কাপাসী—'

'কও—'

খুব আস্তে কথাটা বলল কাপাসী।

'কী ভাবতে আছ ?'

'একখান কথা কী ভাবি। বুঝলা পুরুষ, চিন্তার আমার পার-কুল নাই।'

একটু চুপচাপ।

হঠাৎ হারাণ বলে, 'একখান কথা জিগামু (জিগ্যেস করব) কাপাসী ?'

'একখান ক্যান, দশখান জিগাও (জিগ্যেস কর)—'

এক একদিন কাপাসীর মনটা খুবই ভাল থাকে। সহজ ভাবে কথা বলে। সব কথার ঠিক ঠিক জবাব দেয়।

হারাণ বলে, 'অমুন হাস ক্যান কাপাসী ? অবুঝের মত হাসতে আছে ?'

'বড় সুখে হাসি পুরুষ। কী সুখে যে হাসি, কেউ বুঝব না। পিরথিমীর কেউ না।'

দু হাতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এক একদিন কেঁদে উঠত কাপাসী।

হারাণ অবাক হয়ে যায়। তবে কি তারা যা বুঝেছে, সেটুকুই সত্যি না! কাপাসীর হাসির অনেক পরত নীচে বুঝিবা নিরন্তু, অফুরন্ত দুঃখ জমা হয়ে আছে।

একটু একটু করে একদিন কাপাসীর সেই দুঃখটাকে ছুঁয়ে ফেলল হারাণ। সেই দুঃখ, উন্মাদ হাসির নীচে যা গোপন হয়ে আছে।

প্রায়ই হারাণ বলত, 'অমুন হাইসো (হেসো) না কাপাসী।'

'ক্যান ?'

'মানুষে মোন্দ কয়।'

'মানুষে মোন্দ কয় ?'

'হ।'

কি একটু যেন ভেবে নেয় কাপাসী। হঠাৎ বলে, 'মানুষে মোন্দ কয়, তোমার তাতে কী ?'

'আমার যে কী বোঝ না কাপাসী ?'

হারাণের গলা গাঢ় শোনাত।

'না-না-না—'

ধারাল গলায় সমানে চিল্লাত কাপাসী, 'কও পুরুষ, মানুষে আমারে মোন্দ কইলে তোমার কী হয় ?'

শুধু চিল্লাতই না, অদ্ভুত জিদ ধরত নিত্য ঢালীর মেয়ে।

বিব্রত মুখে কাপাসীর দিকে তাকিয়ে থাকত হারাণ। তারপর চোখ বুঁজে বলে ফেলত, 'তোমারে মোন্দ কইলে আমার যে মোন্দ লাগে।'

'মিছা কথা!'

কাপাসী খেঁকিয়ে উঠত।

'মিছা না কাপাসী।'

কথাটা বলতে হারাণের গলা থরথরিয়ে কেঁপে উঠত।

'সত্য কও পুরুষ ?'

হারাণের পাশে আরো একটু ঘন হয়ে আসত কাপাসী।

নরম গলায় হারাণ আবার বলত, 'সত্য কই (বলি)।'

কাপাসী আর কিছু বলত না। কোন দিন হারাণের একটা হাত আঁকড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত। কোনদিন বা কলকলিয়ে হেসে উঠত।

ফাঁক বুঝে উজানী বুড়ীকে লুকিয়ে চুরিয়ে কাপাসীর কাছে আসত হারাণ।

হাজার লুকালেও এক একদিন উজানী বুড়ী ধরে ফেলত। বলত, 'তোরে না কইছি, কাপাসীর কাছে যাবি না ?'

'গেলে কী হয় ?'

'লক্ষ্মী দাদা আমার, অবুঝ হইস না। শোন, উই কাপাসীর

শরীলখান নষ্ট, মাথাখান খারাপ। তার উপর বয়ের (যুবতী) মেয়ে। ওর কাছে বেশি যাইতে নাই।'

অনেক বয়স হয়েছে উজানী বুড়ীর। অনেক দেখেছে সে, অনেক শুনেছে। দেখাশোনার চেয়ে অনেক বেশি বুঝেছে। আগে থেকেই অনেক কিছুর গন্ধ পায় সে। সব কিছুর আগে আগে তার মন ছোটে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার নাক-চোখ, সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রখর হয়ে উঠেছে।

কথায় বলে যুবতী মেয়ে হ'ল আগুন আর পুরুষ মানুষ হ'ল ঘি। আগুনের কাছ থেকে ঘি'কে যত ফারাকে রাখা যায় ততই মঙ্গল।

তা ছাড়া কাপাসী যদি সুস্থ হত, স্বাভাবিক হত, পাপ যদি তার শরীরটাকে না ছুঁতে পারত, তা হ'লে কথা ছিল না।

কিন্তু এই কাপাসী, যার শরীর নষ্ট, মাথা খারাপ, সে সমাজ সংসারের কোন কাজেই আসবে না।

কাজেই আগে থেকে সাবধান হওয়া ভাল।

কাপাসী আর হারাণের মধ্যে যাতে মাখামাখি না হয়, সে জন্য সব সময় নজর রাখত উজানী বুড়ী। হারাণকে আগলে আগলে রাখত।

তা সত্ত্বেও হারাণকে এবং তার বয়সের ধর্মকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না।

শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পুরা একটা বছর কেটে গেল।

আগে আগে লঙ্গরখানা থেকে খিচুড়ি দিত। একদিন তা বন্ধ হয়ে গেল। তার বদলে সরকারী খয়রাত অর্থাৎ মাথা পিছু পনের টাকা ক্যাশ ডোল দেওয়া শুরু হ'ল।

নিত্য ঢালী বলল, 'পনের টাকায় প্যাটের ভাত পাছার কাপড় জোগান যাইব না। কী করন যায়!'

হারাণও সায় দেয়, 'ঠিক কথা তালুই। চাউলের দর তিরিশ টাকা, একখান মোটা কাপড় ছয় সাত টাকা। পনের টাকায় বাঁচুম কেমনে ?'

'তাই তো—'

নিত্য ঢালীর মুখেচোখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফোটে।

উজানী বুড়ী, নিত্য ঢালী, হারাণ আর কাপাসী—চারজন বসে ছিল। হারাণ আর নিত্য ঢালী কথা বলছিল। উজানী বুড়ী ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করছিল। কাপাসী দুই হাঁটুর মধ্যে থুতনি ঢুকিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল।

হঠাৎ ঘুরে বসল কাপাসী। বলল, 'উই পনের টাকা তো আছেই, আরো কিছু কামাই কর। তা হইলেই সোংসার চলব।'

হারাণ বলল, 'কামাই করনের পথ নাই। কুলীর কাম করতে গেছিলাম। পশ্চিমা কুলীরা মার দিয়া হটাইয়া দিল। এইখানের কিছু জানি না, শুনি না। কেউ আমাগো (আমাদের) চিনে না। কে কাম দিব ?'

'বাঁচনের চেষ্টা করতে হইব না ? কাম দিব না, এই কথা ভাব ক্যান ? মহাজনগো গদীতে বার বার যাও। দুয়ারে দুয়ারে ঘোর। চিনাশুনা হউক। জানাশুনা হইতে হইতেই কাম পাইবা।'

অবাক হয়ে কাপাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে হারাণ। এ যেন আর এক কাপাসী। যে কাপাসী অবুঝ, অস্বাভাবিক হাসিতে মেতে থাকে, এ যেন সে নয়। এই কাপাসী দুঃখের দিনে, বিপদের দিনে, দুশ্চিন্তার দিনে পাশে এসে দাঁড়ায়। পরামর্শ দেয়। দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যোঝার উপায়টা বলে দেয়।

কাপাসীর কথামত ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত হারাণ আর নিত্য ঢালী কাজ জুটিয়ে ফেলল। বিড়ি বাঁধার কাজ।

প্রথম দিন কাজ সেরে কাপাসীর কাছে এসে বসল হারাণ। বলল, 'তোমার লেইগাই (জন্যই) কামটা পাইলাম।'

কাপাসী কিছু বলে না।

হারাণ বলে, 'কথা কও না ক্যান কাপাসী ?'

এবারও কিছু বলল না কাপাসী। উদাস, বিষণ্ণ মুখটা তুলে ধরল। কি যেন সে ভাবছে।

হারাণ আবার বলল, 'দিনরাইত অত কী ভাব কাপাসী ?'

'কী ভাবি শুনতে চাও ?'

'হ।'

'ভাবি, তমস্ত জনম কী এমুন কইরা কাটামু ? কুত্তা বিড়ালের লাখান (মত) কত কাল কাটান যায় ?'

এ প্রশ্নের জবাব হারাণের জানা নেই। ফ্যাল ফ্যাল করে সে কাপাসীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

কাপাসী বলেই চলে, 'আর কী আমরা মাটি পামু না ? আর কী আমরা ঘর দুয়ার সোংসার পাততে পারুম না ?'

'কী জানি।'

অস্ফুট গলায় হারাণ বলল।

'কুনোখানে যদি থিতু হইয়া বসতে পারি, বড় ভাল হয়। তোমরা আমরা পাশাপাশি থাকুম। পাশাপাশি ক্যান, এক লগেই (সঙ্গেই) থাকুম।'

হারাণের একটা হাত ধরে কাপাসী নিজের খুশিতে বলে যায়। আর হারাণের বুকের ভিতরটা বিচিত্র সুখে কাঁপতে থাকে।

এমন করেই দিন যায়, মাস যায়, ঋতুর চাকায় সময় পাক খায়।

কাপাসী কখনও আশার কথা শোনায়। কখনও মেত্তে মেত্তে হেসে উঠে নিরাশ করে। এই আশা, এই নিরাশা। আশার পিছে নিরাশা। নিরাশার পিছে আবার আশা। আশা আর নিরাশা দুটি যমজ ভাই।

আশায় নিরাশায় দোল খেতে খেতে আরো একটা বছর পার হ'ল।

দু বছর পর খবর এল, কালা পানি অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে আন্দামান দ্বীপে গেলে পুনর্বসতি মিলবে। জমি জিরাত, হাল-হালুটি, বাস্তু—বর্ডারের ওপারে তারা যা হারিয়ে এসেছে, সব ফিরে পাবে।

খবরটা নিয়ে এসেছে নিত্য ঢালী।

সেদিন বিড়ি বাঁধার কাজে যায় নি সে। 'রিফুজী' অফিসে ক্যাশ ডোল আনতে গিয়ে এই খবরটা শুনেছে। আর শুনেই সরাসরি প্ল্যাটফর্মে ফিরে এসেছে।

নিত্য ঢালী বলল, 'আন্ধারমান দ্বীপি গেলে সগল মিলব। বাস্তু, চাষের জমিন, বেবাক। অখন কী করন!'

উজানী বুড়ী বলল, 'আন্ধারমান দ্বীপ কুন খানে?'

'হেই কালা পানি, সমুন্দর পাড়ি দিয়া যাইতে হয়। জাহাজে ইস্টিমারে পাঁচ দিন সময় লাগে।'

'কইস কী নিত্যা?'

'ঠিকই কই (বলি)। যা শুনে আসলাম, তাই কই (বলি)।'

'জানি না, শুনি না, এমুন জায়গায় যাওন কী ঠিক হইব নিত্য?'

'হেই কথাখানই তো ভাবি।'

নিত্য ঢালী বলতে থাকে, 'একদিন দুই দিনের পথ না। জলের উপর দিয়া পুরা পাঁচ দিনের পথ। সে কী এইখানে মাসি!'

দু জনেই কথা বলছিল। কাপাসী স্টেশনের বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। হারাণ তখনও কাজ থেকে ফেরে নি।

উজানী বুড়ী বলল, 'না রে নিত্যা, অতদূরে যাওনের কাম নাই। এই বেশ আছি।'

এই দু বছর ইঁট দিয়ে ঘেরা চার পাঁচ হাত বে-আব্রু, উলঙ্গ

জায়গায় আর পনের টাকা ক্যাশ ডোলের মাপে জীবনটাকে আশ্চর্য ভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে উজানী বুড়ীরা। প্রথম প্রথম ভারি অসুবিধা হত, এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এই পাঁচ হাত জায়গার জন্য মায়া বসে গিয়েছে।

আশ্চর্য মানুষের জীবন! আশ্চর্য তার খাপ খাওয়াবার ক্ষমতা!

আগে আগে বাপ-শ্বশুরের বাস্তুর জন্য উজানী বুড়ী বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদত। আজকাল শিয়ালদা স্টেশনের এই পাঁচ হাত জায়গার জন্য তার বড় টান। এ জায়গা ছেড়ে আন্দামান দ্বীপের অনিশ্চিত জীবনে সে ঝাঁপ দিতে চায় না।

অনেক রাত্রে হারাণ ফিরে এল।

উজানী বুড়ী শিয়ালদা বাজারে প্যাকিং বাক্সের টুকরা টাকরা কাঠের খোঁজে বেরিয়েছিল। জ্বালানির কাজে লাগবে। নিত্য ঢালী কোথায় যেন গিয়েছিল।

কাপাসী একা একা বসে ছিল।

কোনদিন নিজে থেকে যেচে কথা বলে না কাপাসী। আজ বলল।

উজানী বুড়ীকে না দেখে হারাণ চলে যাচ্ছিল। কাপাসী ডাকল, 'শোন—'

একটুক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হারাণ। তারপর আস্তে আস্তে কাপাসীর কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'কী কও?'

'বস, কামের কথা আছে।'

হারাণ বসে পড়ল।

কাপাসী বলতে লাগল, 'একখান নয়া খবর আছে।'

'কী খবর?'

উৎসুক চোখে কাপাসীর মুখের দিকে তাকাল হারাণ।

'বাপে খবর আনছে, পাঁচ দিন সমুন্দর পাড়ি দিয়া যাইতে পারলে আন্ধারমান দ্বীপ মিলে। সেইখানে গেলে ঘরদুয়ার, জমিন, হালহালুটি—সগল মিলব।'

খবরটা হারাণও শুনেছে।

শিয়ালদা স্টেশনে তো তারা আর কাপাসীরা, এই দু ঘরই রিফুজী নেই। আরো অনেক বাস্তুহারা, দুর্ভাগা মানুষ গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করে পড়ে আছে। এর মধ্যেই আন্দামান দ্বীপের খবরটা তাদের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছে।

কাজ থেকে ফেরার পথে হারাণ সব শুনে এসেছে।

হারাণ বলল, 'আন্ধারমান দ্বীপির কথা আমি শুনছি।'

কাপাসী শুরু করল, 'বাপে আর তোমার ঠাকুরমায় তো যাইতে চায় না।'

'ক্যান?'

'ডরে।'

কাপাসী বলে, 'জলের উপুর দিয়া পাঁচ দিনের পথ। তার উপুর অচিনা দ্যাশ। ডর তো লাগেই।'

হারাণ কিছু বলে না। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দেয়।

কাপাসী থামে না, 'কিন্তুক ডর লাগলে তো চলব না। এমুন কইরা এই পাঁচ হাত জায়গায় কত কাল থাকা যায়! দুই দিন, দশ দিন। বড় জোর দুই এক বছর। তমস্ত জনম কী চলে!'

হারাণ বলে, 'ঠিকই তো।'

'যদি বোঝ ঠিক, তা হইলে বাপেরে আর ঠাকুরমায়েরে বুঝাও। এমুন ভাবে বাঁচনের থিকা মরণ ভাল। ঘর গেছে, বাস্তু গেছে, আন্ধারমানে গেলে যদি সগল ফিরা পাই, যাইতে দোষ কী?'

'ঠিক—'

হারাণ মাথা নাড়ে। বলে, 'মরে তো আছিই। আন্ধারমান দ্বীপি যদি জমি জিরাত পাই, বাঁচনের চেষ্টা তো করতে পারি।'

'তা হইলে সেই ব্যবস্থাই কর।'

কি যেন একটু ভাবে কাপাসী। বলতে থাকে, 'আমার বাপ আর তোমার ঠাকুরমা কয় দিন বাঁচব? তাগো (তাদের) দিন তো ফুরাইয়া আসছে। কিন্তুক তুমি আমি আরো অনেক বচ্ছর বাঁচুম। এই পাঁচ হাত জমিনে আমাগোর (আমাদের) তমস্ত জনম চলব না।'

'ঠিকই—'

কাপাসীর গলা এবার গাঢ় শোনায়, 'অন্তত একখান ঘর চাই। চার পাশে চার খান বেড়া আর উপুরে চালের আবডাল থাকব। সেই ঘরে তুমি আমি সোংসার পাতুম। এত মানুষের মধ্যে এই আ-ঢাকা, বে-আবডাল (খোলা) জায়গায় কী সোংসার পাতা যায়! তুমিই কও পুরুষ?'

অস্ফুট গলায় হারাণ বলে।

তাকে নিয়ে কাপাসী সংসার পাতবে। কথাটা শুনতে শুনতে বুকের ভিতর সুখের শিহর খেলে হারাণের।

কাপাসীকে যেন কথায় পেয়েছে। সে থামে না, 'সোংসারে কত কিছুই তো গোপন রাখতে হয়। কিন্তুক এইখানে কিছুই গোপন নাই। যা করবা, যা কইবা, সগলই মানুষের চোখে পড়ব, মানুষের কানে যাইব।'

কাপাসীর জিদের ফলেই হারাণরা একদিন জাহাজে উঠল। পদ্মা-মেঘনার দেশ কোথায় পড়ে রইল! মাটির আশায়, বাঁচার আশায় হাজার মাইল বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে তারা আন্দামান দ্বীপে রওনা হ'ল।

বাইরে ফিনিক ফোটা জ্যোৎস্না।

চাঁদের আলোতে পাহাড়-জঙ্গল-টিলা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আবছা আবছা কুয়াশায় বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপটা কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

নাঃ, এখনও ঘুম আসছে না। ঘুম বুঝি আজ আর আসবে না।

বুকের ভিতরটা খা খা করছে।

কাপাসী আশা দিয়েছিল, তাকে নিয়ে সংসার পাতবে। সেই আশায় আশায় বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে এসেছে হারাণ।

কিন্তু সব কথা বুঝি ভুলে গিয়েছে কাপাসী। না হ'লে, তার সায় না থাকলে নিত্য ঢালী কী বিদেশী বিজাতিকে ঘরে এনে তুলতে পারত ?

কথাটা যতই ভাবল, মাথার ভিতরটা গরম হয়ে উঠল। মাথায় অসহ্য তাপ। কপালে তামার তারের মত সরু সরু অসংখ্য রগ চিন চিন করছে।

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস দিয়েছে। সেই বাতাস হারাণের জ্বালা জুড়িয়ে দিতে পারল না।

শিয়রের জানলার ওপারে জোনাকিগুলো এখনও জ্বলছে, নিবছে।

পুরুষ জোনাকিরা মেয়ে জোনাকিদের ফুসলাতে ফুসলাতে জঙ্গলের দিকে নিয়ে চলেছে।

শূন্য, ফাঁকা চোখে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল হারাণ।

গলার কাছটা ভারী ভারী, ব্যথা ব্যথা। বুকের ভিতর থেকে একটা অসহ্য কান্না পাকিয়ে পাকিয়ে গলার কাছে এসে আটকে ছিল। এতক্ষণে সেটা পথ পেয়েছে।

মুখের ভিতর কাপড় গুঁজে হতাশায়, দুঃখে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল হারাণ। কান্নার দমকে শরীরটা থরথর কাঁপতে লাগল।

তেতাল্লিশ

উদ্ধব বৈরাগীর ঘরে কথা হয়েছিল, পোর্ট ব্লেয়ার থেকে পাল সাহাব ফিরে এলে যা হোক একটা বিহিত হবে।

কিন্তু হারাণের তর সইল না। সকালে উঠেই মাথায় অসহ্য তাপ, বুকের ভিতর অফুরন্ত দুঃখ, উত্তেজনা আর ক্ষোভ নিয়ে নিত্য ঢালীর ঘরের দিকে ছুটল সে।

নিত্য ঢালীর ঘরে যেতে হ'লে উতরাই বেয়ে উঠতে হয়। উতরাইটার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটা আধপোড়া প্যাডক গাছ। ডালপালা আর ছাল পুড়ে গাছটা কবন্ধের মত দাঁড়িয়ে আছে।

উতরাই বেয়ে উঠতে উঠতে কবন্ধ গাছটার পাশে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হারাণ। এখান থেকে নিত্য ঢালীর ঘর উঠান পরিষ্কার দেখা যায়।

হারাণ যা ভেবেছিল, ঠিক তাই।

উঠানে সেই পুরু ঠোঁট, কুচকুচে কালো, কোঁকড়ানো চুল লোকটা অর্থাৎ পানিকর ঠ্যাং ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হারাণের ইচ্ছা হ'ল, ছুটে গিয়ে লোকটাকে থাপ্পড় মেরে আসে।

ইচ্ছা হ'লেই তো আর হয় না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হারাণ কি যেন ভাবল। তারপর অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে নিজের ঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

অনেক কথাই ভেবে এসেছিল হারাণ। ভেবেছিল, কাপাসীকে জিজ্ঞাসা করবে, কেন সে বিদেশী বিজাতিকে ঘরে জায়গা দিল? জিজ্ঞাসা করবে, শিয়ালদা স্টেশনে যে কথা কাপাসী বলেছিল, এই দ্বীপে এসে কী সে সব একেবারেই ভুলে গিয়েছে?

ভেবে এসেছিল অনেক কিছুই। কিন্তু বলা আর হ'ল না। টলতে টলতে উতরাই বেয়ে নামতে লাগল হারাণ।

হারাণ যখন ঘরে ফিরল, তখন রোদ বেশ তেতে উঠেছে। জঙ্গলের মাথা টপকে সূর্যটা উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে।

উঠানে পা দিয়েই হারাণ চমকে উঠল।

উঠানের আর এক মাথায় ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে উজানী বুড়ী আর কুমী।

উজানী বুড়ী মেটে পাতিলে জাউ বসিয়েছে। আখার মুখে শুকনা পাতা গুঁজতে গুঁজতে গুজ গুজ করে সে কুমীর সঙ্গে কথা বলে। কি যে বলে, এত দূর থেকে হারাণ বুঝতে পারে না।

কুমীর চোখ দুটো চরকির মত ঘোরে। ইন্দ্রিয়গুলো তার খুবই প্রখর। উজানী বুড়ীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কেমন করে যেন সে টের পেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়টা ঘুরিয়ে তাকায়। ছাখে, উঠানের আর এক মাথায় হারাণ দাঁড়িয়ে আছে।

হারাণকে দেখেই উঠে দাঁড়ায় কুমী। উজানী বুড়ীকে বলে, 'অখন যাই গো মাসি। সুযুগ (সুযোগ) পাইলে আবার আসুম।'

আজ মোহিনী সেজেছে কুমী।

হারাণ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশ দিয়েই পথ। মোহিনী কুমী চিকন মাজার তলে ভারী পাছা দুলাতে দুলাতে হারাণের সামনে এসে একটু দাঁড়াল। সেই হাসিটা হাসল, যাতে ধার আছে কিন্তু শব্দ নেই। তারপর সারা দেহে ঢেউ তুলে আবার চলতে শুরু করল।

কুমী যেই চোখের আড়াল হ'ল, অমনি ঝাউ ফেলে ছুটে এল উজানী বুড়ী। হারাণের হাত ধরে টানাটানি শুরু করল।

হারাণ অবাক হয়ে গিয়েছে।

কাপাসীর ব্যাপার নিয়ে সেদিন ঝগড়া হয়েছিল। তার পর থেকে পারতপক্ষে উজানী বুড়ী তার সঙ্গে কথা বলে না। আজ তার কি হয়েছে, কে জানে। হাত ধরে টানতে টানতে হারাণকে ঝাউয়ের পাতিলটার কাছে এনে বসাল। হাউ হাউ করে খুব এক-চোট কাঁদল। শুকনো, কোঁচকানো গাল বেয়ে টস টস করে ফোঁটায় ফোঁটায় চোখের জল ঝরতে লাগল।

হারাণের গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে উজানী বুড়ী বলতে লাগল, 'লক্ষ্মী, সুনা (সোনা) ভাই। আমার কাছে আয়, আমার বুকে আয়—'

বিস্ময়ের ঘোর খানিকটা কেটে গেলে হারাণ বলল, 'হইছে কী? অত সোহাগ ক্যান?'

'তোরে সোহাগ করুম না তো করুম কারে?'

দু হাতে হারাণের গলাটা জড়িয়ে ধরে উজানী বুড়ী বলে, 'আছে কে আমার? তুই ছাড়া পিরথিমীতে আমার কেও নাই রে হারাইণা (হারাণ)। তুই ছাড়া আমার সগল আন্ধার। তুই আমার চৌখের মণি—'

বলেই ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করে।

'সগলই বুঝলাম। কিন্তুক—'

বিরক্ত গলায় হারাণ বলে, 'অত সোহাগ এই কয়দিন আছিল কুন খানে? মতলব খান কী তোর?'

'মতলব আবার কী রে হারাইণা (হারাণ)? নিজের নাতিরে এট্টু সোহাগ আল্লাদ করতে পারুম না?'

হারাণ জবাব দিল না।

উজানী বুড়ী বলতে থাকে, 'আপন জন কইতে তুই। বান্ধব

কইতে তুই। তুই যদি অমুন বিবাগী হইয়া ঘুরে বেড়াস, আমার ভাল লাগে? তুই ক' (বল)?'

ছু হাতে গলাটা জড়িয়ে ধরেছে উজানী বুড়ী। আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে হারাণ উঠে পড়ল।

মনে সুখ নেই। মনে সুখ না থাকলে হাজার মিঠা কথা, সোহাগ—কিছুই ভাল লাগে না।

উঠানের এক কিনারে একটা প্যাডক গাছ। দুপুরে তার ছায়ায় খেতে বসেছিল হারাণ। হারাণের পাতে জাউ আর মায়া মাছের ঝোল দিতে দিতে উজানী বুড়ী ডাকল, 'সুনা (সোনা) ভাই—'

হারাণ জবাব দিল না। অন্যমনস্কের মত জাউ আর মাছ নাড়া-চাড়া করতে লাগল।

উজানী বুড়ী আবার ডাকল, 'লক্ষ্মী দাদা, আমার কথাখান শোন—'

হারাণ মুখ তুলল। চোখমুখ কুঁচকে বিরক্ত গলায় খেঁকিয়ে উঠল, 'কী ক্যাচর ক্যাচর লাগালি ঠাকুরমা?'

নিদাঁত, ফোকলা মুখে একটু হাসল উজানী বুড়ী। তারপর খুব উৎসাহিত হয়ে বলল, 'একখান খপর শুনছিস ভাই?'

'কী খপর?'

'থাউক থাউক, উই সগল মোন্দ কথা শুনে তোর কাম নাই।'

একটু দম নিয়ে উজানী বুড়ী বলতে থাকে, 'বিহানে (সকালে) কুমী আসছিল। সেই মাগীই সগল কইয়া (বলে) গেল। সত্য-মিথ্যা ভগমান জানে।'

পাত থেকে হাত গুটিয়ে নিল হারাণ। চড়া গলায় বলল, 'কুমী মাগী তোরে কী কইছে?'

হারাণের মারমুখী চেহারার দিকে তাকিয়ে বুড়ী ভয় পেয়ে গেল। ভয় পেল, কিন্তু বুঝতে দিল না। রুক্ষ, কোঁচকানো মুখটাকে মিঠা একটি হাসিতে ভরিয়ে বলল, 'বড় মোন্দ কথা, তোর শোনার কাম নাই। কুমী কইছে—'

'কী কইছে কুমী?'

'উই নিত্য না কি বিদেশী বিজাতিরে ঘরে এনে তুলছে। কুমী কইল—'

বলতে বলতে থেমে গেল উজানী বুড়ী।

'এট্টু কইস, এট্টু প্যাটের ভিতর রাখিস! একলগে (সঙ্গে) সগল কইতে তোর হয় কী?'

হারাণ খেঁকিয়ে উঠল।

ভয় ভয় গলায় উজানী বুড়ী বলে, 'কুমী কয়, নিত্যা নাকি কাপাসীর লগে বিদেশী বিজাতির বিয়া দিব।'

অসহ্য গলায় হারাণ চেঁচিয়ে উঠল, 'মিছা কথা—'

'সাচা (সত্য) হউক, মিছা হউক, তোর আমার কী?'

হারাণের একটা হাত ধরে উজানী বুড়ী বলে, 'তোর খাওয়া তুই খা। নিজের মেয়ে সে অজাত-বিজাত-কুজাত—যার হাতে দিক, তোর আমার কী?'

হারাণ পাতে হাত দেয় না। ঘাড়টা গোঁজ করে বসে থাকে।

উজানী বুড়ী বোঝায়, 'পরের উপুর তো হাত নাই। নিজের মেয়েরে যদি নিত্যা উড়াইয়া দেয়, লুটাইয়া ছায়, পুড়াইয়া ছায়, তোর আমার কী?'

দু হাত ঘুরিয়ে বলে, 'কিছুই না। বুড়া বয়সে নিত্যার মতিগতি খারাপ হইয়া গেছে। না হইলে বিদেশী-বিজাতিরে ঘরে এনে তোলে, না তার লগে মেয়ের বিয়া দিতে চায়? হা ভগমান, কত নীলাই দেখাইলা!'

হারাণ জবাব দেয় না। ঘাড় গোঁজ করে বসে আছে সে। ঘাড়টা তুলে উজানী বুড়ীর দিকে একবার তাকায়ও না।

উজানী বুড়ী নিজের খেয়ালে বকে যায়, 'উই লষ্ট শরীল, মাথা খারাপ মাগীটার লেইগা (জন্য) মন খারাপ করিস না দাদা। অজাতি-বিজাতি-কুজাতি—যারে মনে ধরে তার হাতেই কাপাসীরে দিক নিত্যা। উই মেয়ে নিয়া কী হইব? সোমাজ-সোংসারের কোন কামেই আসব না। ওরে যদি ঘরের বউ কইরা আনি, সগলে গায়ে ছ্যাপ (থুথু) দিব। কাপাসীর চিন্তা তুই ছাড় হারাইণা (হারাণ)।'

একসঙ্গে অনেকক্ষণ বকেছে। উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে উজানী বুড়ী। নাকের ডগায়, কপালে কণা কণা ঘাম দেখা দেয়। হাঁপানির তালে তালে শুকনা বুকের ঢিলা স্তনদুটি দুলতে থাকে।

টেনে টেনে দম নেয় উজানী বুড়ী। হাঁপানির দাপট একটু কমলে আবার শুরু করে, 'আমার সুনা (সোনা) ভাইর আবার বিয়ার চিন্তা! উই লষ্ট মাগী ছাড়া পিরথিমীতে যেন আর মেয়ে নাই! ভগমান যেন ঐ একখান মেয়েই বানাইছে!'

গোয়ালন্দের স্টীমারে কাপাসীর হাসি শুনে মনটা বিরূপ হয়ে গিয়েছিল। এতদিনেও মনের সেই বিরূপ ভাবটা কিছুতেই ঘুচল না উজানী বুড়ীর। তার উপর যেদিন শুনল, কাপাসীর শরীর নষ্ট, মাথাটা খারাপ, সেদিন থেকেই হারাণকে তার সঙ্গে বেশি মিশতে দেয় নি। সব সময় আগলে আগলে রেখেছে।

মাথা খারাপ হোক আর যাই হোক, বয়সের একটা ধর্ম তো আছে। কথায় বলে, ডাকাবুকা যুবতী হ'ল আগুন। আর পুরুষ মানুষের হ'ল ঝাঁপ দেবার স্বভাব। সেই আগুনে ঝাঁপ দিলে তো পুড়তেই হবে। কিছু জ্বালা তো সইতেই হবে। জগতে এই-ই তো নিয়ম।

কিন্তু ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, যে মেয়ের শরীর নষ্ট হয়ে

গিয়েছে, সমাজে ধর্মে সে তো অচল। তার দাম কানাকড়িও না। তাকে নিয়ে কী করবে উজানী বুড়ী ?

হঠাৎ হারাণ ডাকল, 'ঠাকুরমা—'

'কী কইস ?'

'তুই সত্যই জানস, নিত্য তালুই বিদেশীর লগে কাপাসীর বিয়া দিব ?'

'কুমী তো তাই কইল (বলল)।'

উজানী বুড়ী বলে, 'উই ভাবনা ছাড় দাদা। অঘ্রাণ মাসে ধান উঠলে আমিও তোর বিয়া দিমু। চন্দরের কাছে আমি আজই যামু। তার মেয়ে পাখি বড় সোন্দর, বড় ভাল। তোর পাশে যা মানাইব। যুগল মিলন হইব।'

ফোকলা মুখে হাসে উজানী বুড়ী।

হঠাৎ পাতের সামনে থেকে লাফ মেরে উঠে দাঁড়ায় হারাণ চেঁচাতে থাকে, 'থাম বুড়ী। পাখির লগে আমার বিয়া দিতে চায়! আল্লাদ কত!'

চেঁচাতে চেঁচাতেই হারাণ ঘরে গিয়ে উঠল।

প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল উজানী বুড়ী। একটু ধাতস্থ হয়ে চিলের মত ধারাল গলায় চিল্লাতে শুরু করল, 'জানি জানি, উই লষ্ট মাগী তোর মাথা খাইছে। ওর মধ্যে কি মধু পাইছিস, তুইই জানিস! তোর ধম্মই জানে! উই পেত্নী তোর ঘাড় থিকা না নামা ইস্তক (পর্যন্ত) তোর মতিগতি কী ভাল হইব? হইব না। উই মাগী তোরেও সোয়াস্তি দিব না, আমারেও না। হা ভগমান—'

নিজের শুকনা, অস্থিসার বুকে দুম দুম করে কীল মারতে থাকে উজানী বুড়ী।

চুয়াল্লিশ

দিন তিনেকের মধ্যে মোটামুটি একখানা ঘর তুলে ফেলল নিত্য ঢালী। প্যাডক কাঠের খুঁটি, কঁ্যাচা বাঁশের বেড়া আর বেতপাতার চাল।

চালটা এখনও পুরাপুরি ছাওয়া হয় নি।

এখন সকাল।

উঠানের এক কিনারে কাঁচা বেতপাতা স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে।

নিত্য ঢালী চাল ছাইছে। পানিকর নীচ থেকে বেতপাতার গোছ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

উঠানের আর এক কিনারে একটা ঝাঁকড়া চুগলুম গাছ। তার ছায়ায় বসে সিপি সাফ করছে লা তে।

টার্বো, ট্রোকাস, নটিলাস, নী-ক্লাম—নানা জাতের সমুদ্রচর কড়ি আর শামুক। তাদের শক্ত খোলের উপর চুন আর নুন জমাট বেঁধে আছে।

লা তে সিপিগুলোর গায়ে এ্যাসিড ঢালে। সঙ্গে সঙ্গে নুন আর চুনের কঠিন আবরণটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেঁজে উঠতে থাকে। এ্যাসিডে-পোড়া নুন আর চুনের উগ্র, উৎকট গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

নিত্য ঢালীকে বেতপাতা জোগান দিতে দিতে ফুরসত বুঝে লা তে'র কাছে আসে পানিকর। তাকে তালিম দেয়, 'জেয়াদা এ্যাসিড ঢালবি না লা তে। সমঝালি ?'

'হাঁ—'

ঘাড় কাত করে লা তে বলে।

'ইয়াদ রাখবি, জেয়াদা এ্যাসিড ঢাললে সিপি টুটাফাটা হয়ে যাবে।'

একটুক্ষণ লা তে'র কাছে বসেই উঠে পড়ে পানিকর। অস্থির হয়ে উঠানময় পায়চারি করে। চনমন করে এদিক সেদিক তাকাতে থাকে।

ঘরের মাথা থেকে নিত্য ঢালী ডাকে, 'পানিকর বাবা—'

'হাঁ হাঁ—'

পানিকর ছুটে আসে।

'পাতা ছ্যান—'

একসঙ্গে পানিকর অনেকগুলো বেতপাতার গোছা ছুঁড়ে দেয়, যাতে নিত্য ঢালী বেশ কিছুক্ষণ তাকে ডাকতে না পারে।

বেতপাতা দিয়ে এসেই উঠানময় আবার ছটফট করে বেড়ায় পানিকর। এদিক সেদিক কাকে যেন খোঁজে।

ঘাড় গুঁজে সিপি সাফ করছিল লা তে। হঠাৎ সে ফিস ফিস করে ডাকল, 'মালেক—'

'কী-কী-কী—'

এক দৌড়ে লা তে'র কাছে চলে এল পানিকর। বলল, 'অত ডাকছিস কেন রে হারামী ? হয়েছে কী ?'

বর্মী লা তে'র চাপা চাপা কুতকুতে চোখে, থ্যাবড়া নাকে, পুরু পুরু তামাটে ঠোঁটে একটা ধূর্ত, সূক্ষ্ম হাসি খেলে বেড়ায়।

পানিকর খেঁকিয়ে উঠল, 'কুত্তা হাসছিস কেন ?'

নিপাট ভাল মানুষের মত লা তে জবাব দেয়, 'হাসছি না তো মালেক—'

'ডাকছিলি কেন?'

পানিকরের কানে মুখটা গুঁজে খুব আস্তে লা তে বলে, 'কাকে খুঁজছেন?'

পানিকর ক্ষেপে উঠল, 'যাকেই খুঁজি, তোর তাতে কী রে হারামীর বাচ্চা?'

'কুছু না, কুছু না—'

লা তে খেঁকিয়ে খেঁকিয়ে হাসতে লাগল। হাসিটা থামিয়ে হঠাৎ বলল, 'এ ভাল না মালেক, ভাল না—'

পানিকর গর্জে উঠল, 'কী ভাল না রে শালে—'

লা তে জবাব দেবার আগেই ঘরের চাল থেকে নিত্য ঢালী ডাকল, 'পানিকর বাবা—'

'কী?'

পানিকর ছুটল। বলল, 'এই তো বেতপাত্তি দিয়ে গেলাম। আবার ডাকছ কেন?'

'দড়ি ছ্যান।'

এক লাছি নারকেল দড়ি ছুঁড়ে দিল পানিকর।

এক দিকে নিত্য ঢালী, আর এক দিকে লা তে। তাঁতের মাকুর মত দু জনের মধ্যে পানিকর ছোটাছুটি করে। ছোটাছুটি করতে করতেই এক সময় তার নজরে পড়ে যায়।

চাল ধুতে কিলপণ্ড নদীতে গিয়েছিল কাপাসী। এই মাত্র ফিরেছে। উতরাই বেয়ে বেয়ে সে উপরে উঠে আসছে।

এখন উঠানের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে পানিকর। তার চোখ দুটো ছুরির ফলার মত ঝকমক করছে।

চালের পাতিল নিয়ে পানিকরের পাশ দিয়ে পাকের ঘরের দিকে চলে গেল কাপাসী। একটু পর ফাঁক বুঝে হুঁকো-কলকি—তামাকের সরঞ্জাম নিয়ে কাপাসীর কাছে এল পানিকর।

উঠানের শেষ মাথায় কঁ্যাচা বাঁশের বেড়ায় ঘিরে একটা

দোচালা তুলে দিয়েছে নিত্য ঢালী। এটাই কাপাসীর পাকের ঘর।

পাকের ঘরটার সামনে উবু হয়ে বসল পানিকর।

প্রথমে পানিকরকে দেখতে পায় নি কাপাসী। পিছন ফিরে বসে আখার মুখে শুকনা পাতা আর সরু সরু ডাল গুঁজে দিচ্ছে সে। মেটে পাতিলে ভাত ফুটছে। সরার ফাঁক দিয়ে হাল্কা, সাদা ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে উড়ে যাচ্ছে।

উদাস চোখে পাতিলটার দিকে তাকিয়ে নিজের খেয়ালে কি যেন বিড় বিড় করে বকে কাপাসী।

ফিস ফিস করে পানিকর ডাকল, 'কাপাসী—'

'কে ?'

চমকে ঘুরে বসল কাপাসী। হঠাৎ ডাকটা শুনে সে বুঝি ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে তার চোখমুখ থেকে ভয়ের ভাবটা কেটে যায়। খুব নরম গলায় সে বলে, 'পানিকর ভাই—'

'হাঁ—'

'বসেন বসেন—'

কাপাসী বলতে থাকে, 'তামুক খাইবেন। আগুন চাই ? এই তো—'

পানিকর মাথা নাড়ে। হাসে। এতক্ষণ সে উবু হয়ে বসে ছিল। এবার মাটির উপর পা ছড়িয়ে জুত করে বসল।

তামাক পুরে কলকিটা কাপাসীর হাতে দেয় পানিকর। কাপাসী আখার ভিতর থেকে খানিকটা গনগনে আগুন তাতে তুলে দেয়।

তামাক খাওয়ার অভ্যাস কোন কালেই ছিল না পানিকরের। নিত্য ঢালীই তাকে তামাকের নেশা ধরিয়েছে। নেশা ধরা সোজা, কিন্তু ছাড়া কঠিন। আজকাল তামাক ছাড়া পানিকরের চলে না। সময়মত এক ছিলিম না পেলে গলাটা কেমন যেন খুচখুচ করে।

হুঁকো টানতে টানতে মৌতাত ধরে যায়। তামাকটা বেশ কড়া। যত কড়াই হোক এমনি তামাকে পানিকরের শানায় না। তাতে খানিকটা আফিম মিশিয়ে নিয়েছে সে।

আফিম মেশানো তামাকের গুণ আছে। নেশাটা যখন চরমে ওঠে, মাথার সরু সরু রগগুলি চিন চিন করতে থাকে। তখন চোখের সামনের দুনিয়াটা আসল রং হারিয়ে ফেলে, ঘোর ঘোর নেশাময় এক রংএ রংদার হয়ে ওঠে।

হুঁকো টানে আর ভক ভক করে ধোঁয়া ছাড়ে পানিকর। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জড়ানো গলায় ডাকে, 'কাপাসী—'

'কী ক'ন (বলেন) পানিকর ভাই ?'

'তুমি মাদ্রাজ শহরে গেছ ?'

'না, গেলাম আর কই ?'

'তুমি যাবে ?'

'কে নিয়া যাইব ?'

পানিকর এবার উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'কেন, আমি তোমাকে নিয়ে যাব।'

'সাচা ক'ন (বলেন) ?'

ঘাড়টা বাঁকিয়ে অদ্ভুত চোখে তাকায় কাপাসী।

'হাঁ হাঁ, জরুর সচ্।'

পানিকর আরো একটু ঘন হয়ে বসে। আস্তে আস্তে বলে, 'মাদ্রাজ শহরে গেলে তোমার বহুত ভাল লাগবে। যাবে কাপাসী ?'

পাকের ঘরের সামনেটা জুড়ে বসে আছে পানিকর। তার মাথার উপর দিয়ে দৃষ্টিটাকে বাইরে, অনেক অনেকদূরে পাহাড়-টিলা-জঙ্গল পেরিয়ে কোথায় যেন পৌঁছে দেয় কাপাসী। আকাশটা আশ্চর্য নীল। মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। শুধু একঝাঁক সাগর-পাখি ডানা মেলে বাতাসে ভাসছে।

অনেকদূরে দৃষ্টিটাকে হারিয়ে কী দেখছে কাপাসী ? আকাশ ?

সাগর-পাখি? টিলা-জঙ্গল-পাহাড়? কাপাসীর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল পানিকর। কিন্তু পারল না। কাপাসীর চোখদুটো বড় দুর্বোধ্য।

পানিকর ডাকল, 'কাপাসী—'

কাপাসী জবাব দিল না।

পানিকর নিজের খেয়ালে বকে যায়, 'দো মাহিনার (মাসের) অন্দর সিপি সাফ হয়ে যাবে। সিপিগুলো এজেণ্টের কাছে বেচে তোমাকে আর নিত্য চাচাকে মাদ্রাজ নিয়ে যাব। হাঁ—জরুর—'

এবারও কিছু বলে না কাপাসী। খিসখিসিয়ে হেসে ওঠে।

পানিকর থতমত খায়। থতিয়ে থতিয়ে বলে, 'হাসছ কেন? তোমার বুঝি বিশোয়াস হচ্ছে না?'

খিস খিস করে হাসছিল কাপাসী। হঠাৎ হাসিটা কলকলিয়ে মেতে উঠল। বরাবর যেমন হয়, হাসির দাপটে তার শরীরটা বেঁকে দুমড়ে দলা পাকিয়ে যেতে থাকে।

পাকের ঘরের একটা খুঁটি ধরে টাল সামলায় কাপাসী।

কী বুঝল, পানিকরই জানে। বেজার মুখে উঠে পড়ল। মনে মনে কী একটা গূঢ় মতলব ভাঁজতে ভাঁজতে উঠানে চলে এল।

চুগলুম গাছটার মাথায় একটা ভীমরাজ পাখি ডেকে ডেকে খুন হচ্ছে। আর নীচে ঘাড় গুঁজে সিপি সাফ করছে লা তে।

হঠাৎ লা তে মুখ তুলল। ডাকল, 'মালেক—'

কাছে এসে পানিকর বলল, 'কী বাত?'

'একটাই বাত।'

পানিকর দেখল, বর্মী লা তে'র চাপা, কুতকুতে চোখদুটো ঝিক ঝিক করছে। থ্যাবড়া নাকটা ফুলে ফুলে উঠছে। খাড়া চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে।

একটু যেন ভয়ই পেল পানিকর। কাঁপা গলায় বলল, 'কী বাত, জলদি বল।'

'বলব, জরুর বলব মালেক। থোড়া বসুন তো।'

অগত্যা কি ভেবে যেন পানিকর লা তে'র পাশে বসেই পড়ে। বলে, 'বল—'

কাপাসীর হাসি এখনও থামে নি। পাকের ঘরে তীব্র, অস্বাভাবিক শব্দ করে মেতে মেতে ঢলে ঢলে সে হেসেই চলেছে।

লা তে ফিস ফিস করে বলে, 'মালেক, নিত্য ঢালীর লেড়কী এ্যায়সা হাসছে কেন ?'

পানিকর খেঁকিয়ে উঠল, 'হাসছে কেন, আমি তার কী জানি রে কুত্তা ?'

গালাগালিটা গায়ে মাখে না লা তে। দাঁত বার করে টেনে টেনে কেমন করে যেন হাসে। পানিকরের বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে।

লা তে বলে, 'সচ্ বলছেন, আপনি জানেন না ?'

'না রে হারামী, না।'

পানিকর গজরাতে থাকে।

'তামাকের আগ (আগুন) আনতে গেলেন আর নিত্যর লেড়কী হাসতে লাগল। আমি সোচলাম (ভাবলাম) জরুর আপনি কুছ বলেছেন কাপাসীকে। না হ'লে হাসবে কেন ?'

পানিকর আর কিছু বলে না। গজরাতে গজরাতে উঠে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে লা তে'ও উঠে পড়ে। পানিকরের কানে মুখটা গুঁজতে গুঁজতে বলে, 'এ ভাল না মালেক, ভাল না। বহুত বুরা (খারাপ) কাম।'

একদিন নিত্য ঢালী ঘর বানানো শেষ করে সিপি সাফের কাজে লাগে।

আজকাল চুগলুম গাছটার ছায়ায় বসে তিন জনে সিপি সাফ করে। লা তে, পানিকর আর নিত্য ঢালী।

সিপি সাফ করতে করতে ফুরসত পেলেই উঠে পড়ে পানিকর। কাপাসীর কাছে গিয়ে বসে। তাকে মাদ্রাজ শহরের গল্প শোনায়। বলে, 'কাঞ্জিভরম শাড়ি কিনে দেব। মাদ্রাজী কাঙনা আর হাঁসলী কিনে দেব।'

এ-কথা সে-কথা এবং হাজারটা লোভের ফাঁদ পাতে পানিকর। তার কথা শুনতে শুনতে কোনদিন কাপাসীর চোখদুটো চক চক করে। সে বলে, 'সত্যই আমাগোর (আমাদের) মান্দ্রাজ নিয়া যাইবেন পানিকর ভাই? না মিছা আশা ছ্যান?'

পানিকর বলে, 'না না, মিছা বাত আমি বলি না। আমি যখন আছি, নিত্য চাচাকে আর কাম করতে হবে না। বুড্ঢা মানুষ। কাম করতে কত তখলিফ হয়!'

একটু থেমে বলে, 'মাদ্রাজ শহরে আমার কোঠি আছে। সিপি-গুলো সাফ করে নি। তারপরেই মাদ্রাজের জাহাজে উঠব।'

কোনদিন বা পানিকরের কথা শুনে কলকলিয়ে, শরীরটাকে বাঁকিয়ে হুমড়ে হেসে ওঠে কাপাসী।

কাপাসীর কাছ থেকে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে লা তে পানিকরকে ডাকে। তার কানে মুখটা ঢুকিয়ে ফিস ফিস করে বলে, 'এ ভাল না মালেক, ভাল না। বহুত বুরা কাম।'

এমন করেই দিন যায়।

পঁয়তাল্লিশ

পোর্ট ব্লেয়ারের কাজ চুকিয়ে দিন কয়েক পর পাল সাহাব ফিরে এসেছে।

এটা মধ্যম ঋতুর বিকাল।

এখন রোদে তাপ কম, জেল্লা বেশি। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপটা তাপহীন, উজ্জ্বল রোদে ঝকমক করছে।

ঝুপড়ির সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে পাল সাহাব।

সামনের জঙ্গলের মাথায় এক ঝাঁক কাটৌরা পাখি উড়ছে। নাচছে। পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে। বড় বড় ডানায় ঘা মেরে বাতাস তোলপাড় করছে।

এই দ্বীপে এর আগে কোনদিন কাটৌরা পাখি দেখেছে কী? পাল সাহাব মনে করতে পারল না। না পারার জন্য অবশ্য তার মাথাব্যথাও নেই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাখিদের নাচানাচি, ওড়াওড়ি দেখতে লাগল সে।

এমন সময় তারা এসে পড়ল।

তারা অর্থাৎ রসিক শীল, বুড়ী বাসিনী, হারাণ, যোগেন, উদ্ধব— ডিগলিপুর সেটেলমেন্টের প্রায় তিরিশ চল্লিশ জন বাসিন্দা।

পাল সাহাব খুশি খুশি গলায় বলল, 'আও, আরে আও শালে লোগ—'

সকলে কাছে এসে পড়ল।

পাল সাহাব আবার বলল, 'তোরা ভাল আছিস তো? দিল-তবিয়ত আচ্ছা?'

'কই আর ভাল রইলাম সাহেব বাবা? ভাল থাকনের কী জো আছে?' বুড়ো রসিক শীলের গলাটা বেজার শোনাল।

পাল সাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'আবার কী হ'ল তোদের? কী রে কুত্তার পাল?'

পাল সাহাবের মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল রসিক শীল।

পাল সাহাব আবার চিল্লাল, 'কী রে, কথা কইছিস না কেন?'

ভয়ে ভয়ে রসিক শীল বলল, 'কী কমু (বলব) সাহেব বাবা? আপনেরে কিছু কইতে ডর লাগে।

এবার পাল সাহাব হেসে ফেলল। নরম গলায় বলল, 'বল বল, ডর নেই।'

হাত বাড়িয়ে রসিক শীলকে নিজের দিকে টেনে নিল সে।

সাহস পেয়ে রসিক শীল বলল, 'সাহেব বাবা, আপনে পুট বিলাস (পোর্ট ব্লেয়ার) গেছিলেন, এই ফাঁকে নিত্য ঢালী বিদেশী-বিজাতি ঘরে এনে তুলছে। ঘরে তার বিয়ার যুগ্য মেয়ে।'

পাল সাহাব কয়েকদিন পোর্ট ব্লেয়ারে ছিল। আজ খানিকটা আগে ফিরে এসেছে। এর মধ্যে ডিগলিপুরের সেটেলমেণ্টে কী ঘটেছে, কিছুই জানে না। আস্তে আস্তে সে বলল, 'নিত্য বুড্ঢা বিদেশী-বিজাতিকে ঘরে এনে তুলেছে?'

'তবে আর কী কই সাহেব বাবা—'

নতুন উদ্যমে শুরু করে রসিক শীল, 'ডর নাই, নিত্যার পরান-খানে এতটুক ডর নাই। সোমাজ-সোংসার, শরম-ভরম—কোন কিছুর ডর নাই।'

একটু থামে। কী যেন ভেবে আবার বলে, 'ঘরে ডাকাবুকা পাগল মেয়ে, তার উপুর দুই দুইটা জুয়ান বিদেশীরে ঘরে এনে

রাখছে। ভাবলেই তো বুক কাঁপে। নিত্যার মনে কী আছে, নিত্যাই জানে।'

অস্ফুট একটা শব্দ করে পাল সাহাব। বিড় বিড় করে কী যে বলে, ঠিক বোঝা যায় না।

ভিড়ের মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল হারাণ। রসিক শীল আর পাল সাহাবের কথা শুনছিল। এবার কনুই দিয়ে সবাইকে ঠেলে গুঁতিয়ে সামনে এসে দাঁড়ল। বলল, 'এর একখান বিহিত করতে হইব পাল সাহেব। কোলোনিতে এই সগল চলব না।'

'কোন সব ?'

এই ক'দিন রাগ, দুঃখ, হতাশা—অসহ্য এক যন্ত্রণার মধ্যে কাটছে হারাণের। ভাল করে খায় না, ঘুমায় না, কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না। সাতবার জিগ্যেস করলে একটা কথার হয়ত জবাব মেলে। মাথার চুল উড়ু উড়ু, রুক্ষ। চোখদুটো টকটকে লাল। চোখের নীচের হনুদুটো ফুঁড়ে বেরিয়েছে।

কাপাসীর চিন্তায় এই ক'টা দিন অস্থির, বিকল এবং জর্জর হয়ে আছে হারাণ।

হারাণ বলল, 'মোন্দ, বদ মতলব নিত্য তালুইর মনে। আমরা সগল জানি। ক্যান উই বিদেশীরে ঘরে জায়গা দিছে, সগল বুঝি। কিন্তুক পাল সাহেব, কোলোনিতে এই বদ কাম চলব না। হ—সিধা কথা। আপনের কাছে এর বিহিত চাই।'

খানিকটা চুপচাপ।

একসময় পাল সাহাব বলল, 'সবই তো শুনলাম। লেকিন বিদেশী-বিজাতিটা কোন কুত্তা ?'

'উই পানিকর আর লা তে।'

'ও। আভী সমঝা।'

পাল সাহাব বলতে লাগল, 'যার কাছে নিত্য বুড্ঢা কাম করত, সেই পানিকর ?'

'হু।'

চোখ বুঁজে কী যেন ভাবে পাল সাহাব। গাঢ়, নরম গলায় বলে, 'ছাখ হারাণ, নিত্য বুড্‌ঢা বড় দুঃখী। ওর দিলে জিন্দগীতে সুখ নেই। এক রোজ আমাকে সব বলেছে নিত্য। ওর বিবি মরেছে, ওর লেড়কী পাগল বনে গেছে।'

গলা ধরে যায় পাল সাহাবের। কেসে গলাটা সাফ করে সে বলতে থাকে, 'বিদেশীকে ডেরায় রেখে ও যদি খুশি হয় তো হোক না। তবে হাঁ, যদি বেচাল করে, শালের বাচ্চার জান তুড়ব। হাঁ— জরুর—'

নিত্য ঢালীর সম্বন্ধে পাল সাহাবের অদ্ভুত এক দুর্বলতা আছে।

সাত পুরুষের ভিটামাটি খুইয়ে হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই দ্বীপের নতুন মানুষগুলি উপনিবেশ গড়তে এসেছে। বাস্তু তো সবাই হারিয়েছে। কিন্তু নিত্য ঢালীর মত বউ হারিয়েছে কে? মেয়ে পাগল হয়েছে কার?

এখনও যে নিত্য ঢালীর মাথাটা ঠিক আছে, এই কথাটা ভেবে ভেবে মাঝে মাঝে তাজ্জব বনে যায় পাল সাহাব।

যে মানুষ বাস্তু, ভিটা এবং বউকে হারিয়ে, সর্বস্ব-খোয়ানো একটা পাগল মেয়েকে নিয়ে বাঁচার আশায় এতদূরে, এই দ্বীপে আসতে পারে, তার জন্য পাল সাহাবের অশেষ, অফুরন্ত মমতা।

পাল সাহাব বলল, 'এখন তোরা যা, আমি নিত্য ঢালীর সাথ মুলাকাত করব।'

সবাই চলে গেল।

বড় আশা নিয়ে পাল সাহাবের কাছে এসেছিল হারাণ। ভেবেছিল, বিহিত একটা কিছু হবেই। তার বিশ্বাস ছিল, শোনা মাত্রই পাল সাহাব নিত্য ঢালীর ডেরায় ছুটবে। বিদেশী-বিজাতিদের কলোনি থেকে তাড়িয়ে দেবে।

কিন্তু না, কিছুই হ'ল না।

রসিক শীলেরা চলে গিয়েছে।

একা একা টলতে টলতে চড়াই আর উতরাই বেয়ে কখন যে হারাণ কিলপণ্ড নদীর পারে এসে দাঁড়িয়েছিল, নিজেরই হুঁশ ছিল না।

মধ্যম ঋতুর দিনটা মরতে বসেছে। এখন রোদের তাপ নেই, তেজ নেই, জেল্লা নেই। কেমন যেন বিষণ্ণ, করুণ, উদাস।

গাছের যে পাতাগুলি এতক্ষণ ঊর্দ্ধমুখ হয়ে রোদের আসব শুষছিল, তারা ঢলে পড়েছে। যে পাখিরা সমুদ্রে গিয়েছিল, তারা দ্বীপে ফিরতে শুরু করেছে।

নদীর পারে বাদামী রঙের ছোট ছোট নুড়ি পাথর। তার উপর দুই হাঁটুতে মাথা গুঁজে চুপচাপ বসে রইল হারাণ।

পানিকররা নিত্য ঢালীর ডেরায় আসার পর কত বার যে কেঁদেছে হারাণ। একটু যেই নিরালা হয়, যেই কাপাসীর কথা মনে আসে, সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতর থেকে আকণ্ঠ, অসহ্য একটা কান্না পাকিয়ে পাকিয়ে, হুড়মুড় করে, গলা-নাক-মুখ-চোখ ফাটিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

চুপচাপ বসে বসে কাঁদছে হারাণ। কান্নার দমকে শরীরটা ফুলে ফুলে উঠছে। সুঁচের মুখের মত একটা তীক্ষ্ণ, ধারাল যন্ত্রণা তাকে ক্রমাগত বিঁধছে। টস টস করে চোখ থেকে লোনা জল ঝরছে।

হারাণ কাঁদে আর ভাবে।

আশ্চর্য! এখন সে কাপাসীর কথা ভাবছে না। সে ভাবছে, মানুষের বুকে কত কান্না জমে আছে? মানুষের চোখের তারার পিছনে কত লোনা জল আছে?

কান্নার বুঝি শেষ নেই। চোখের জল হয় ত কোন দিনই ফুরায় না।

হাঁটুতে মাথা গুঁজে কতক্ষণ যে হারাণ বসে ছিল !

তার খেয়াল নেই, জঙ্গলের মাথা থেকে মরা রোদটুকু কখন মুছে গিয়েছে। কখন ফিকে ধোঁয়া রঙের সন্ধ্যা নেমেছে। আর ফিকে সন্ধ্যাটা কখন গাঢ় হয়ে রাত্রি হয়ে গিয়েছে।

'হারাণ, হারাইণা রে—'

সমস্ত সেটেলমেণ্টে তাকে খুঁজতে খুঁজতে উজানী বুড়ী কখন যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, হারাণ জানে না।

তার প্রথম ডাকটা হারাণের কানে যায় নি। ঘাড় গুঁজে যেমন ছিল, তেমনি বসে রইল হারাণ।

এবার হারাণের কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিল উজানী বুড়ী। আবার ডাকল, 'হারাইণা—'

আস্তে আস্তে মাথা তুলল হারাণ। নাতিকে মাথা তুলতে দেখেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল উজানী বুড়ী, 'আমার কী সব্বনাশ হইল রে ! হা ভগমান, রাক্ষসী ডাকিনী মাগী হারাইণার মাথা খাইল। আমার কী হইব !'

কাঁদতে কাঁদতেই হারাণকে টেনে তুলল উজানী বুড়ী। বলল, 'ঘরে চল সুনা (সোনা) ভাই, আমার লক্ষ্মী দাদা।'

আগে আগে চলেছে উজানী বুড়ী। পিছনে হারাণ।

উজানী বুড়ী হাঁটে আর বুক থাপড়ায়। বিড় বিড় করে বলে, 'সব্বনাশী, তোর মনে এই আছিল ! তোর পরানে এত বিষ, এত মারপ্যাঁচ। ভাল হইব না। আমি রাঢ়ী হইয়া কই, তোর ভাল হইব না। জ্বইলা পুইড়া মরবি। আমার ভাল নাতিটারে তুই বিবাগী করলি। এই অধম্ম সইব না। ভগমান এর বিচার করব। হ লো কালসাপের ছাও—'

•

ছেচল্লিশ

খিলাফৎ পাঠান সেই যে এসেছিল, আর তার যাওয়া হ'ল না। উত্তর আন্দামানের এই সেটেলমেণ্টেই সে থেকে গেল।

মানুষের প্রতি চরম অবিশ্বাস নিয়ে আন্দামানে দ্বীপান্তরী সাজা খাটতে এসেছিল খিলাফৎ খান।

তারপর পঞ্চাশ ষাটটা বছর পার হয়ে গিয়েছে।

এই পঞ্চাশ ষাট বছরে মানুষের প্রতি খিলাফতের অবিশ্বাস, ঘৃণা, সন্দেহ একটু একটু করে বেড়েই চলেছিল। মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে সে আশ্রয় নিয়েছিল।

আন্দামানের জঙ্গলে কত বছর যে কাটিয়ে দিল, সে হিসাব কী খিলাফৎ নিজেই জানে? শুধু এটুকু জানে, জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে দিদু, চুগলুম, প্যাডক কি পাপিতার মত সেও একটা গাছ হয়ে গিয়েছে।

ফরেস্টের কুলী হয়ে খিলাফৎ দক্ষিণ আন্দামানের জঙ্গলে ঢুকেছিল। সেখান থেকে এল মধ্য আন্দামানের লং আইল্যাণ্ডে। লং আইল্যাণ্ড থেকে মায়াবন্দর। মায়াবন্দর থেকে ইদানীং এই ডিগলিপুরের জঙ্গলে।

আজকাল খিলাফৎ ফরেস্টের কুলী নয়, গার্ড। পঞ্চাশ ষাট

বছরে একবার মাত্র পারমোশ বা প্রোমোশন হয়েছে। কুলী থেকে গার্ড। এ জন্য দুঃখ, আপসোস বা ক্ষোভ নেই তার।

ক্রমাগত দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলেছে খিলাফৎ পাঠান।

নিছক প্রয়োজনটুকু ছাড়া মানুষের সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই। সম্পর্ক নেই। যখনই সে বোঝে, মানুষ তার কাছাকাছি এসে পড়েছে, তখনই জঙ্গলে গিয়ে ঢোকে খিলাফৎ। জঙ্গলের মত ইমানদার, সাচ্চা দোস্ত তার আর নেই।

মানুষকে এড়িয়ে এড়িয়ে প্রায় পুরা জিন্দগীটা কাটিয়ে ফেলল খিলাফৎ।

দক্ষিণ আন্দামানের জঙ্গল কাটতে কাটতে একদিন সে দেখল, পেনাল কলোনি বসেছে। মানুষ বেড়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সফার নিয়ে সে এল মধ্য আন্দামানে। জঙ্গল 'ফেলিং' হবার পর সেখানেও মানুষ এল। খিলাফৎ ছুটল মায়াবন্দর। মায়াবন্দরেও মানুষ এল। খিলাফৎ ছুটল ডিগলিপুর। ডিগলিপুরের জঙ্গল সাফ করে রিফুজী সেটেলমেণ্ট বসেছে।

মানুষের তাড়া খেতে খেতে দক্ষিণ থেকে উত্তরে ছুটছে খিলাফৎ পাঠান। ডিগলিপুরের নতুন বাসিন্দাদের দেখে সে ঠিক করেছিল, উত্তরে, আরো উত্তরে যেখানে কোনদিন কোন মানুষ যাবে না, সেই ল্যাণ্ডফল দ্বীপে চলে যাবে সে।

তার সাদি-করা আওরত আর চাচাতো ভাই তাকে ঠকিয়েছে। জীবনে এই দু'জনের কাছে চরম মার খেয়ে মানুষ সম্বন্ধে খিলাফতের ধারণাটা হয়ে গিয়েছে একরোখা, ভয়ানক। তার বিশ্বাস, দুনিয়ার সমস্ত মানুষই দুশমন, বেইমান। মানুষ সম্বন্ধে এই ধারণাটা খিলাফতের জীবনে একটা সংস্কারের মত হয়ে গিয়েছে।

ল্যাণ্ডফল দ্বীপেই চলে যেত খিলাফৎ। কিন্তু তার আগেই ব্যারামে কাবু হয়ে পড়ল।

খিলাফৎ খান তার জিন্দগীতে মানুষের প্রীতি, ভালবাসা বা বন্ধুত্বের তাপ কোনদিনই পায় নি। জিন্দগীর বাকী দিনগুলি ল্যাণ্ডফল দ্বীপে, প্রীতিহীন, নীরস এবং নিঃসঙ্গ ভাবেই তার কেটে যেত। কিন্তু ব্যারামটা সব হিসাব গোলমাল করে দিল। জীবনটাকে যে ছকে খিলাফৎ বেঁধেছিল, সেই ছকটাই একদিন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

পাল সাহাব সেই যে তাকে রামকেশবের বউ ক্ষিরির কাছে রেখে গিয়েছিল, তার পর থেকেই মানুষ সম্বন্ধে তার ধারণাটা বদলাতে শুরু করেছে।

রামকেশবের বউ ক্ষিরির মাথাটা একরকম খারাপই হয়ে গিয়েছে। মাথাটা ঠিক থাকাই তো অস্বাভাবিক। যার ছেলে মরে, দেশভাগ কারসাজি করে যার মেয়েকে মারে, তার মাথা ঠিক থাকে কেমন করে ?

শুধু মাথাই খারাপ হয় নি, পরী আর সুবলকে হারিয়ে মানুষের প্রতি স্নেহ, মমতা, করুণা—জীবনের সমস্ত মূল্যবোধ সে খুইয়ে ফেলেছিল।

দিনরাত সে উকুন বাছত আর মানুষকে শাপাশাপি করত। নিজে ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার করতে পারে নি। অন্য কারুকে সংসার করতে দেখলে সে ক্ষেপে উঠত। বিড় বিড় করে বলত, 'অত সুখ সইব না। ভরা ভোগে ছাই পড়ব। আমি পুতের সুখ, মেয়ের সুখ পাইলাম না। তোরা ক্যান পাবি ? পাবি না—কিছুতেই না।'

আশ্চর্য ! সেই ক্ষিরি খিলাফৎ পাঠানকে পেয়ে মেতে উঠল। তার উকুন বাছা ঘুচল। শাপাশাপি বন্ধ হ'ল।

সাতচল্লিশ

পাল সাহাবের জীবন থেকে সেই কৃষাণ গ্রামের ঠিকানাটা একেবারেই হারিয়ে গিয়েছে।

কোথায়, কবে যেন দুপুরটাকে উদাস করে ঘুঘু ডাকত। তক-তকে করে নিকানো উঠানে জাম গাছের ছায়া পড়ত। বসুধারা-আঁকা মাটির দেওয়াল, নাদুস-নুদুস গোলগাল শিশু, কপালে মেটে সিঁদুর, পায়ে মল একটি বউ—কতকাল আগের সেই ছবিটা ধূ-ধূ হয়ে গিয়েছে।

একটু যেই নিরিবিলি হয়, সেই ছবিটা সামনে এসে দাঁড়ায়। সেই শিশু, সেই বউ, বসুধারা-আঁকা সেই ঘর, ঘুঘুর ডাক—কোথায় যে তারা হারিয়ে গিয়েছে, কে তার হদিস দেবে।

যতবার পাল সাহাব তাদের কথা ভাবে, চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করে। বুঝিবা সজল হয়েই ওঠে। বুকের ভিতরটা বোবা ব্যথায় টনটন করতে থাকে।

নিজের মনেই খেঁকিয়ে ওঠে পাল সাহাব, 'শালে বেদর্দ কিসমৎ—'

সকালে উঠেই দুলতে দুলতে ধানক্ষেতের দিকে চলেছে পাল সাহাব।

এখনও ঠিকমত রোদ ওঠে নি।

পুব দিকের আকাশে আবছা আবছা, বড় নরম একটু আলো ফুটেছে। জঙ্গলের মাথায় এখনও ফিকে ফিকে, সাদা কুয়াশা ঝুলছে।

কোনদিকে খেয়াল নেই পাল সাহাবের।

সকালের প্রথম নরম আলো, ফিকে কুয়াশা, জঙ্গল, চড়াই-উতরাই, পাহাড়-টিলা—এই দ্বীপের কিছুই যেন সে দেখছে না। তার চোখের সামনে সেই ধূ-ধূ কৃষাণ গ্রাম, সেই মল-বাজানো বউ, সেই দুপুর, নাদুস নুদুস ছেলে—অনেক দিন আগে হারিয়ে যাওয়া একটি ছবি ভেসে উঠেছে।

বিড় বিড় করে বকতে বকতে চলেছে পাল সাহাব।

এক সময় ধানক্ষেতে এসে পড়ল সে।

জঙ্গলের কাছ থেকে যে মাটিকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সবুজ সতেজ ধানে সে এখন ছেয়ে গিয়েছে। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপ ফসলের প্রাণের ভারে পুলকময়ী হয়ে উঠেছে।

ধান থেকে সবে মাত্র শিষ বেরুতে শুরু করেছে। দু এক মাসের মধ্যেই শিষে শিষে ক্ষেত ভরে যাবে। সবুজ তুঁষের ভিতর দুধ আসবে। এক দিন দুধ ঘন হয়ে পুষ্ট, নিটোল এক দানা শস্য হয়ে যাবে। সবুজ তুঁষে হলুদ রং ধরবে।

ধানবনের উপর দিয়ে মৌসুমী বাতাস সির সির করে বয়ে যায়।

ধানের দিকে চেয়ে থাকে পাল সাহাব। ধান দেখতে দেখতে জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া সেই কৃষাণ গ্রামের স্বপ্নে বিভোর হয়ে যায়।

'পাল সাহেব—'

কে যেন ফিস ফিস করে পিছন থেকে ডাকল।

চমকে ঘুরে দাঁড়াল পাল সাহাব। চোখের সামনে থেকে কৃষাণ গ্রামের ছবিটা হারিয়ে গেল।

ঠিক পিছনে কুমী এসে দাঁড়িয়েছে। আজ সে যোগিনী সেজেছে।

কুমীর কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিলির সোয়ামী হরিপদ বারুই। অশক্ত, দুর্বল দেহটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বুকে একটা হাত চেপে টেনে টেনে হাঁপাচ্ছে। অনেকখানি চড়াই-উতরাই ভেঙে এসেছে হরিপদ। উত্তেজনায়, ক্লান্তিতে বুকটা তোলপাড় করে শ্বাস পড়ছে। কপালে, নাকের ডগায় কণা কণা ঘাম ফুটে বেরিয়েছে।

কুমী চতুর ঠোঁটে অস্ফুট শব্দ করে হাসে। তার ধূর্ত চোখ দুটো ঝিক ঝিক করতে থাকে।

পাল সাহাব বলল, 'কী রে মুহিনী যুগিনী, মতলব কী ? সকালে উঠেই হরিপদ কুত্তাটাকে নিয়ে এসেছিস যে ?'

কুমীর ঠোঁটের হাসি মরে না। আস্তে আস্তে সে বলে, 'ক্যান আসছি, হরিপদ ভাইরে জিগান (জিগ্যেস করুন) পাল সাহেব।'

পাল সাহাব বলল, 'কী রে হরিপদ কুত্তা, কী হয়েছে ?'

বুকে হাত চেপে এতক্ষণ টেনে টেনে হাঁপাচ্ছিল হরিপদ। পাল সাহাবের কথার জবাব না দিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

কান্নার দাপটে তার গলার শিরগুলি দড়ির মত পাকিয়ে ওঠে। ঘোলা ঘোলা চোখ থেকে টস টস করে লোনা জল ঝরতে থাকে।

খুব জোরে কাঁদার মত বুকের জোর নেই হরিপদর। গেঙিয়ে গেঙিয়ে, দুর্বল শব্দ করে সে কাঁদে। যত না কাঁদে, তার চেয়ে অনেক বেশি হাঁপায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'আমার কি সব্বনাশ হইল সাহেব বাবা! কারো কাছে যে আমার মুখ দেখানের জো নাই। আমারে মারেন, শ্যাষ করেন। না মরা ইস্তক (পর্যন্ত) আমার শান্তি নাই।'

পাল সাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'কাঁদো মাত কুত্তা।'

অন্য দিন হ'লে থেমে যেত হরিপদ। কিন্তু আজ সে মরিয়া হয়ে কাঁদছে।

বিরক্ত গলায় পাল সাহাব বলল, 'শালে খালি কাঁদবি, না আসল কথা বলবি ?'

'কী আর কমু সাহেব বাবা ? সগলই অদ্দিষ্ট—'

অস্থির, অবুঝ শব্দ করে কাঁদতেই থাকে হরিপদ। কপাল থাপড়ায়। চুল ছেঁড়ে। উন্মাদের মত চিল্লায়, 'আমারে মারেন সাহেব বাবা। না মরলে এই জ্বালা আমার জুড়াইব না। হা ভগমান।'

একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল কুমী। হাসছিল। হরিপদর কান্নাটা যতই বাড়ছিল, তার হাসি ততই ধূর্ত, চতুর হচ্ছিল।

এবার সে মুখ খুলল, 'পাল সাহেব, আমার কথা তো বাসি হইলে মিঠা হয়। সেইবার খপর দিতে আসছিলাম, আপনে তো বিশ্বাসই করলেন না।'

'কিসের খবর রে হারামীর বাচ্চী ?'

চোখের তারা দুটো নাচাতে নাচাতে কুমী বলে, 'আন্দাজ করেন দেখি, কিসের খপর ?'

'শালী তামাসা করবি, না বলবি—'

'কই (বলি) পাল সাহেব। অত উচাটন হইলে চলে! রসের কথা রসাইয়া রসাইয়া কইতে হয়। রসাইয়া রসাইয়া শুনতে হয়।'

একটু চুপ। কেমন করে কথাটা পাড়বে, মনে মনে ভেঁজে নেয় কুমী। তারপর ফিস ফিস গলায় শুরু করে, 'সেই দিন আপনেরে একখান কথা কইয়া (বলে) গেছিলাম। মনে আছে ?'

'কী কথা ?'

'তিলি আর জামাইর কথা।'

'হাঁ।'

প্রথম প্রথম খুব একটা কাছে ঘেঁষত না ক্ষিরি। দূর থেকে খিলাফৎকে দেখত।

সত্তর না আশী, তার সঠিক বয়স যে কত, খিলাফৎ খান নিজেই জানে না। অনেক বছর আন্দামানের জঙ্গলে জঙ্গলে কাটিয়ে কখন যে দেহটা অশক্ত, জীর্ণ এবং পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল, হুঁশ নেই।

সামান্য একটু ব্যারামে বেজায় কাবু হয়ে পড়েছে খিলাফৎ।

দিবারাত্রি রামকেশবের ঘরের মাচানে শুয়ে থাকে সে। দুর্বল বুকটা শ্বাস টানার তালে তালে তোলপাড় হয়, ওঠানামা করে। চোখ দুটো অর্ধেক বোঁজা, মুখটা অল্প হাঁ হয়ে আছে।

দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত ক্ষিরি।

শ্বাস টানতে বড় কষ্ট হত খিলাফতের। গলার মধ্য দিয়ে অনুচ্চ, ঘড়ঘড়ে, হাঁপির টানের মত শব্দ বেরুত।

কান খাড়া করে শুনত ক্ষিরি।

এই অসহায়, বুড়ো, পঙ্গু মানুষটাকে দেখতে দেখতে পাগলী ক্ষিরি হঠাৎ একদিন এক কাণ্ড করে বসল।

ছুটে গিয়ে দু'হাতে খিলাফতের মুখটা তুলে ধরে ককিয়ে উঠল, 'আমার সুবলা রে, তুই কই গেলি রে বাপ! আমার পরী লো, তুই কই গেলি মা! আমার বুক যে খা খা করে, আমার পুরী যে আন্ধার।'

ফিস ফিস, দুর্বল গলায় খিলাফৎ বলে, 'বহুত তখলিফ মাঈ, বহুত তখলিফ, আমার শির ফেটে যাচ্ছে, বুক টুটে যাচ্ছে।'

মাথাটা টিপে দেয় ক্ষিরি, বুকে হাত বুলায়।

যন্ত্রণা একটু কমলে আস্তে আস্তে চোখ বোঁজে খিলাফৎ খান।

শুধু মাথাই টেপে না, বুকেই হাত বুলায় না। এই দুর্বল, পঙ্গু, অসহায় মানুষটাকে নিয়ে কী করবে, ভেবেই পায় না ক্ষিরি।

এই ব্যারামী বুড়ো মানুষটা তার সুবলের চেয়ে অসহায়। একে খাইয়ে না দিলে খেতে পারে না। হাত ধরে না ওঠালে উঠতে পারে না।

বুক কি মাথায় যন্ত্রণা হ'লে কিংবা খিদে পেলে মানুষটা শিশুর মত গেঙিয়ে গেঙিয়ে কাঁদে।

কান্নার শব্দটা শুনতে শুনতে কখনও বিরক্ত হয় ক্ষিরি। কখনও সস্নেহে হাসে। বলে, 'কান্দে না বুড়া বাবা। অমুন অবুঝ হয় না।'

আস্তে আস্তে একদিন ব্যারাম সারল। ক্ষিরির কাঁধে ভর দিয়ে বাইরে এল খিলাফৎ খান। বলল, 'মাঈ আমি তুমার কাছ থেকে যাব না।'

'এই শরীল নিয়া কই যাইবেন বুড়া বাবা?'

ক্ষিরি বলতে থাকে, 'কুনো খানে যাইতে হইব না আপনের। এই বয়সে এই শরীলে গিয়া কী মরবেন? তার থিকা আমার কাছেই থাকেন।'

কথা ক'টা বলেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ক্ষিরি। উদাস, বিষণ্ণ চোখে অনেক দূরে তাকিয়ে বিড় বিড় করতে থাকে, 'আমার সুবলা রে, আমার পরী রে, তোরা কুন খানে গেলি? আমার বুক যে খা খা করে।'

খিলাফৎ খান বলে, 'কী বলছ মাঈ?'

'না বাবা, কিছু না, আপনেরে কিছু কই না। কই আমার অদ্দিষ্টের কথা।'

বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে যায় ক্ষিরি।

সত্যিই খিলাফতের যাওয়া হ'ল না।

যাবেই বা কোথায়? কেনই বা যাবে?

একে বয়স হয়েছে। তার উপর শরীরটা পঙ্গু, জীর্ণ, অশক্ত। এই শরীর নিয়ে ল্যাণ্ডফল দ্বীপের নিদারুণ, বন্য জীবনে যেতে আজ সে ভরসা পায় না।

একটা কথা এতকাল বুঝতে পারে নি খিলাফৎ। মানুষের মমতা, মহব্বৎ পায় নি বলেই তো সে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু এ সব যদি পেত ?

মানুষের কাছ থেকে ক্রমাগত পালাতে চেয়েছে খিলাফৎ। আশ্চর্য! পালাতে পালাতে জীবনের সত্তর আশীটা বছর পার হয়ে শেষ পর্যন্ত মানুষের কাছেই ফিরে এসেছে।

মানুষকে এতকাল সন্দেহ করেছে, ঘৃণা করেছে, অবিশ্বাস করেছে খিলাফৎ।

আশ্চর্য! ক্ষিরির সেবা, স্নেহ এবং প্রাণের উত্তাপ পেয়ে মানুষ সম্বন্ধে তার ধারণাটা বদলাতে শুরু করেছে। মানুষের মধ্যে আবার বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছে সে।

আরো খানিকটা সুস্থ হয়ে একদিন ফরেস্টের নোকরি ছেড়ে দিয়ে এল খিলাফৎ। রামকেশবের ডেরাটার পাশে একটা ঝুপড়ি তুলে নিল।

এতকাল জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে খিলাফৎ পাঠান একটা গাছ হয়ে গিয়েছিল। একটা প্রাচীন, বয়স্ক গাছ। মানুষের প্রাণের তাপ পেয়ে সেই গাছটা আবার মানুষ হয়ে গিয়েছে।

ক্ষিরিও অনেক কিছুই ফিরে পেয়েছে।

পরী কি সুবলকে সে পায় নি। কিন্তু তাদের হারিয়ে যা সে খুইয়েছিল, সেগুলি ফিরে পেয়েছে। একটা অসহায়, বুড়ো, রুগ্ন মানুষের সেবা করতে করতে স্নেহ, মমতা, করুণা—জীবনের মূল্যবোধগুলি আবার ক্ষিরির মধ্যে ফিরে এসেছে।

ঘুরতে ঘুরতে অনেক দিন পর রামকেশবের ডেরায় এল পাল

সাহাব। অবাক হয়ে দেখল উঠানের এক কিনারে একটা নতুন ঝুপড়ি উঠেছে। ঝুপড়িটার সামনে বসে রয়েছে খিলাফৎ পাঠান আর ক্ষিরি।

পাল সাহাবকে দেখে খিলাফৎ ডাকল, 'আ যা দোস্ত্—'

পাল সাহাব সামনে এগিয়ে এল। বলল, 'কী করছ খান সাহাব ?'

'এই মাঈর সাথ থোড়া বাতচিত করছি।'

'তোমার বুখার সেরেছে ?'

'আরে হাঁ-হাঁ—'

খিলাফৎ বলতে লাগল, 'এই মাঈর জন্তেই তো এবার বেঁচে গেলাম। নইলে জরুর ফৌত হয়ে যেতাম।'

'বুখার সেরেছে। এবার ল্যাণ্ডফল জাজিরায় (দ্বীপে) যাবে তো ?'

'নেহী।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাতে থাকে খিলাফৎ খান।

'কাঁহে ?'

'এই মাঈকে ছেড়ে যেতে পারব না। এই ছাখ না পাল সাহাব, নয়া ঝোপড়ি তুলে নিয়েছি।'

পাল সাহাব অল্প অল্প হাসে। বিচিত্র সুখে তার বুকের ভিতরটা কাঁপে। কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলে, 'তুমি না বলতে, মানুষ বেইমান দুশমন।'

'সব মানুষ না রে পাল সাহাব।'

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছে খিলাফৎ খান। পাল সাহাব যতবার কথাটা ভাবল, অদ্ভুত এক খুশিতে বুকটা তার ভরে গেল।

তার গর্ভিণী হওয়ার খবর কুমীর মারফত ডিগলিপুরের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই তিলির।

পাল সাহাবের গজরানি, ফোঁসানি, শাসানি—কিছুই পরোয়া করে না সে। লজ্জা-নিন্দা-ভয়-ধিক্কার—সব কিছু তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে ডাকাবুকা মেয়েটা বসে আছে।

পাল সাহাব তাজ্জব বনে যায়।

হোক নিন্দার, হোক লজ্জার, হোক ধিক্কারের—তবু তো গর্ভিণী হয়েছে তিলি। আর সেই গৌরবে পৃথিবীর কোন কিছুকে, এমন কি পাল সাহাবকে পর্যন্ত গ্রাহ্যেই আনছে না।

আশ্চর্য! মনের এতখানি জোর কোথা থেকে পেল তিলি!

একদৃষ্টে তিলির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল পাল সাহাব।

তীব্র, রিনরিনে শব্দ করে হেসে উঠল তিলি। বলল, 'কী দ্যাখেন পাল সাহেব? সোয়ামী থাকতে পরের পুত প্যাটে ধরলে মেয়েমানুষরে কেমুন দেখায়, তাই বুঝি দ্যাখেন?'

পাল সাহাব থতমত খায়। কী করা উচিত, কী বলা উচিত —ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

তিলি বলে, 'কথা ক'ন (বলেন) না ক্যান পাল সাহেব? মুখে বুঝি কথা জোগায় না?'

একটু চুপ।

হঠাৎ খুব নরম, খুব গাঢ় গলায় পাল সাহাব বলল, 'তুই এ্যায়সা বদ কাম করলি কেন তিলি?'

তিলি হাসছিল। হাসি থামিয়ে বলল, 'বসেন পাল সাহেব, বসেন। আমি সগল কমু। কিছু লুকামু না।'

তিলির পাশে ঘন হয়ে বসল পাল সাহাব।

কুমী দাঁড়িয়ে ছিল। পাল সাহাবের দেখাদেখি সেও বসে পড়ল।

তিলি বলতে লাগল, 'এক দিন না, দুই দিন না, পনের বচ্ছর আমাগোর (আমাদের) বিয়া হইছে। এই পনের বছরে সোয়ামির

মুখ থিকা একখান মিঠা কথা শুনি নাই। সোয়ামী-সুখ কারে কয়, কুনো দিন বুঝলাম না। ভাবছিলাম, পুতের সুখ দিয়া সোয়ামীর দুঃখু ভুলুম। আশায় আশায় বুক বানছিলাম (বেঁধেছিলাম)। কিন্তুক ভগমান সেই আশায় ছাই দিছে।'

তিলির গলাটা ভাঙা-ভাঙা, কাঁপা-কাঁপা, আবেগে অস্থির।

তিলি থামে না, 'পনের বচ্ছর ঘর কইরা (করে) সোয়ামীর কাছ থিকা পাইলাম কী ? না একখান মিঠা কথা, না একটা পুত, না একটু সুখ। জীবনে সুখের মুখ কুনো দিন দেখলাম না পাল সাহেব।'

বিড় বিড় করে পাল সাহাব কি যেন বকে, বোঝা যায় না।

তিলি আবার শুরু করে, 'আমি জানি, সোমাজের কাছে, সোংসারের কাছে, পিরথিমীর সগলের কাছে আমি যা করছি, তা হইল বদ, মোন্দ। কিন্তুক এ ছাড়া আমার যে বাঁচনের পথ নাই।'

'কাঁহে ?'

ভিজা-ভিজা, ধরা-ধরা গলায় তিলি বলে, 'অখন না পাল সাহেব, অন্য সময় কমু (বলব)। অখন মন আমার বশে নাই।'

সূর্যটা দ্বীপের মাথায় এসে উঠেছে।

মধ্যম ঋতুর দিনটা বড় স্নিগ্ধ, কোমল, নরম। এখন রোদে তাপ নেই, তেজ নেই, জ্বালা নেই।

যতদুর তাকানো যায়, বিপুল আকাশের কোথাও এক টুকরা মেঘ নেই। শুধু নীল ; অফুরন্ত, আদিগন্ত, সীমাহীন নীল।

আকাশের নীল এখন আশ্চর্য ঝকঝকে। ঝকঝকে, অথচ বড় কোমল, বড় নরম।

বিড় বিড় করে পাল সাহাব বকে, 'দুনিয়ার সব শালের পিছনে এক কিস্‌সা। দরদের, দুঃখের কিস্‌সা।'

আটচল্লিশ

পুরা দিনটা গেঙিয়ে গেঙিয়ে কাঁদল হরিপদ। নিজেকে আঁচড়াল, কামড়াল। টেনে টেনে চুল ছিঁড়ল।

খেল না, শুল না, কারো কথা কানে তুলল না।

পাল সাহাব অনেক বোঝাল, মা-তিন বোঝাল। কিন্তু যে জিদ ধরেছে কিছুই শুনবে না বুঝবে না, তাকে বোঝানো শোনানো সহজ কথা নয়।

পাল সাহাব বলে, 'যা হবার তা হবে। আভী কুছ খেয়ে নে হরিপদ। নিজেকে তখলিফ দিয়ে কুছ ফায়দা নেই।'

'না-না—না পাল সাহেব, আমার খাওনের সাধ নাই, শোওনের সাধ নাই, বাঁচনের সাধ নাই। আমি মরুম, মরা ছাড়া আমার গতি নাই। না মরলে আমার জ্বালা ঘুচব না।'

হরিপদ যেন উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।

রুক্ষ, ফেঁসোর মত চুল উড়ছে। নিজেকে আঁচড়ে কামড়ে ফালা ফালা করে ফেলেছে হরিপদ। সারা দেহে রক্ত জমাট হয়ে আছে। চোখ দুটো ঘোলা ঘোলা, লালচে।

হরিপদ কপাল থাপড়ায় আর সরু, দুর্বল গলায় চেঁচায়, 'হা ভগমান, আমার কী হইব? মানুষের কাছে কেমনে বাইর হমু? কেমনে মানুষেরে মুখ দেখামু?'

হাজার বুঝিয়েও ফল হ'ল না।

পাল সাহাবের ঝুপড়ির বারান্দায় সমস্ত দিন উথল-পাথল, অস্থির হয়ে কাঁদল হরিপদ। তার রুগ্ন, জিরজিরে শরীরটা নিঙড়ে গোঙানির মত ক্ষীণ, অবুঝ এবং একটানা আওয়াজ বেরুতে লাগল।

অনেক বুঝিয়েও যখন কাজ হ'ল না, তখন হরিপদর পাশে চুপচাপ বসে রইল তুজনে। মা-তিন আর পাল সাহাব। হরিপদর মত তাদেরও আজ খাওয়া হ'ল না।

মধ্যম ঋতুর দিনটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে, নিবে নিবে ফুরিয়ে গেল। রাত হ'ল। রাতটাও একসময় শেষ হ'ল।

দিন ফুরায়। রাতেরও শেষ আছে। কিন্তু কান্না ফুরায় না। কান্নার শেষ নেই।

তু দিন কিছুই খেল না হরিপদ। পাল সাহাবের ঝুপড়ির বারান্দায় বসে সমানে কাঁদল।

আশ্চর্য!

তৃতীয় দিনের সকালে উঠে পাল সাহাব দেখল, বারান্দার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে চুপচাপ বসে আছে হরিপদ। কাঁদছে না, ককাচ্ছে না। মুখেচোখে—কোথাও তার এতটুকু অস্থিরতা নেই।

পাল সাহাবের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই অল্প একটু হাসল হরিপদ। হাসিটা কেমন যেন বিষণ্ণ, করুণ, উদাস দেখাল।

আস্তে আস্তে হরিপদর পাশে এসে দাঁড়াল পাল সাহাব। তার কাঁধে একটা হাত রেখে সস্নেহ, গাঢ় গলায় বলল, 'কুছ বলবি?'

'হ পাল সাহেব—'

হরিপদ মাথা নাড়ল। বলল, 'তুই দিন কিছু খাই নাই। বড় খিদা পাইছে।'

'খাবি?'

'সেইদিন আপনে বিশ্বাস করলেন না। আমারে খেদাইয়া দিলেন। কিন্তুক অখন—'

'এখন কী ?'

কুমী বলে, 'সেইদিন কইছিলাম, যেদিন ফল ফলব, সেদিন আপনের কাছে আস্‌মু। অখন সত্যই ফল ফলছে গো পাল সাহেব।'

তীব্র, ধারাল শব্দ করে কুমী হাসতে লাগল।

'কী বলছিস কুত্তী ?'

কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না পাল সাহাব। হরিপদর কান্না আর তিলির রকম সকম দেখে সে তাজ্জব বনে গিয়েছে।

কুমী বলল, 'তা হইলে সিধা কথাখান সোজা করেই কই (বলি)। আপনে তো সেদিন আমার কথায় গা দিলেন না। বিশ্বাস করলেন না। যদি বিশ্বাস করে বিহিত করতেন, তিলি পোয়াতী হইত না। তিলির প্যাটে ছাও আসত না।'

'কী বলছিস শালী ! শাদি-হওয়া লেড়কির পেটে বাচ্চা আসবে না ? এ তো দুনিয়ার কানুন।'

'ঠিক কথা পাল সাহেব। তবে—'

'তবে আবার কী ?'

'তিলির প্যাটের ছাও হরিপদ ভাইর না।'

'তবে কার ?'

'জামাইর—উই যুগেনের।'

'ঝুট।'

পাল সাহাব গজরে উঠল।

'মিছা আমি কই না পাল সাহেব। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, হরিপদ ভাইরে জিগান (জিগ্যেস করুন)।'

হরিপদর কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিল পাল সাহাব। বলল, 'কী রে কুত্তা, কথাটা সচ্‌ না ঝুট ?'

দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল হরিপদ। ভাঙা ভাঙা, ভেজা ভেজা স্বরে বলল, 'হ বাবা, সত্যই।'

'তুই ঠিক জানিস, তিলির পেটের বাচ্চা তোর না!'

হরিপদ ককিয়ে উঠল, 'না-না-না, ঐ ছাও আমার না। আজ পাঁচ মাস আমরা এক ঘরে থাকি না। তা ছাড়া—'

বলতে বলতে সে থেমে গেল।

'সাহেব বাবা, আমি ব্যারামী মানুষ। ছেলের সাধ আমার আছে। কিন্তুক সাধখান মিটানের উপায় নাই।'

আগেই হাত দিয়ে মুখ ঢেকেছিল হরিপদ। এবার বসে পড়ল। ফোঁপানির দমকে তার দুর্বল, রুগ্ন শরীরটা থরথর কাঁপতে লাগল।

ক্ষুমী বলল, 'এইবার বিশ্বাস হইল তো বাবা?'

'থাম মাগী।'

পাল সাহাব গর্জে উঠল।

চোখের তারা দুটো জ্বলতে থাকে। নাকের পাঁশুটে রোঁয়াগুলো নড়তে থাকে।

ফেল্ট হ্যাটটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে একটা জখমী জানোয়ারের মত সে ফোঁসে আর গজরায়, 'ঐ কুত্তা আর কুত্তীর জান তুড়াব। জরুর।'

বেলা অনেকটা বেড়েছে। রোদ চড়েছে। নোনা জলের মাঝখানে মিঠে মাটির দ্বীপ তেতে উঠতে শুরু করেছে।

গজরাতে গজরাতে ফুঁসতে ফুঁসতে একসময় হরিপদর দিকে তাকাল পাল সাহাব। দু হাতে তাকে টেনে তুলল। বলল, 'চল, শালীকে তুড়ে আসি।'

'না বাবা, আমি আর ঐ পুরীতে যামু না। আমি মরতেই চাই। মরণের লেইগাই (জন্যেই) আমি বাইর হইছি। যেইদিকে দুই চোখ যায়, আমি চলে যামু। ঐ শ্মশানে আর ফিরুম না।'

হরিপদর গলাটা দৃঢ় শোনায়।

পাল সাহাব তার উপর জোর খাটাল না। নরম, সস্নেহ গলায় বলল, 'ঠিক হায়, তিলির কাছে তোর যেতে হবে না। আমিই যাব। তুই আমার ঝুপড়িতে চল, সেখানেই থাকবি।'

হরিপদ আর কুমীকে নিয়ে নিজের ঝুপড়িতে ফিরল পাল সাহাব।

হরিপদকে মা-তিনের জিম্মায় রেখে কুমীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পাল সাহাব।

সেটেলমেন্ট ঢুঁড়ে যোগেনকে পাওয়া গেল না। উদ্ধব বৈরাগী বলল, যোগেন নাকি সকালে উঠে এরিয়াল উপসাগরে মাছ মারতে গিয়েছে।

যোগেনকে না পেয়ে তিলির কাছে এল পাল সাহাব।

এখন তুপুর।

সূর্যটা সরাসরি দ্বীপের মাথায় এসে উঠেছে।

তিলি উঠানের এক কিনারে চুপচাপ বসে ছিল। পাল সাহাবকে দেখে খুব শান্ত গলায় বলল, 'আমি জানতাম, আপনে আসবেন। আসেন আসেন।'

পাল সাহাব সামনে এসে দাঁড়াল। পিছু পিছু কুমীও এল।

একদৃষ্টে তিলির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল পাল সাহাব।

আশ্চর্য! সে মুখে ভয়-ডর, লজ্জা-সরম, চিন্তা-ভাবনা—কোন কিছুর চিহ্ন নেই। একেবারেই নিরেখ, নির্বিকার, কঠিন একটি মুখ।

পাল সাহাব বলল, 'আমি কিসের জন্যে এসেছি, জানিস্ মাগী?'

'জানি।'

'শালী তোর ডর নেই?'

'কিসের ডর ?'

ঘাড়টা বাঁকিয়ে তাকাল তিলি।

'মাগী রেণ্ডি—কিসের ডর, পুছতে সরম লাগে না ?'

'না।'

বেপরোয়া গলায় বলে তিলি, 'কোন কিছুতে আমার ডর নাই।'

পাল সাহাব ভেবে অবাক হয়ে যায়। সোয়ামী থাকতে পরের ছেলে নিজের পেটে ধরে এতখানি ডাকাবুকা হবার সাহস কেমন করে পায় তিলি !

'জানিস, তুই যে কামটা করেছিস বহুত বুরা (খারাপ) ?'

'জানি।'

'সব জেনেশুনে এ্যায়সা কাম করলি হারামীর বাচ্চী ?'

'করলাম।'

তিলির কটা চোখের তারায় অদ্ভুত একটু হাসি চিক চিক করে। তীক্ষ্ণ, ধারাল গলায় সে বলে, 'করলাম তো।'

'শালী রেণ্ডি, করলি তো !'

পাল সাহাব ফুঁসে উঠল। নাকের পাঁশুটে রোঁয়াগুলো নড়তে লাগল।

লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়চারি করতে করতে সে গজরায়, 'মাগী, এ হ'ল ডিগলিপুর, আমার এলেকা। এখানে বদ কাম চলবে না। হাঁ—'

পায়চারি করতে করতে তিলির সামনে এসে দাঁড়ায় পাল সাহাব। তার দিকে তাকিয়েই থাকে।

আশ্চর্য !

নিজের সোয়ামী বেঁচে থাকতে পরের পুত পেটে ধরেও তিলির এতটুকু অনুতাপ নেই।

তিলি গর্ভিণী হয়েছে কিন্তু এই গর্ভিণী হওয়ায় গৌরব নেই, মহিমা নেই। তবু তার বুক কাঁপে না।

'খামু না ? না খাইলে বাঁচুম কেমনে ?'

খুক খুক শব্দ করে কেমন যেন হাসে হরিপদ।

তীক্ষ্ণ চোখে, একদৃষ্টে কিছুক্ষণ হরিপদর দিকে তাকিয়ে থাকে পাল সাহাব।

যে হরিপদ এই দু দিন সমানে মরতে চেয়েছে, সে-ই এখন বাঁচতে চায়!

পাল সাহাব ভাবতে চেষ্টা করল, হরিপদর মাথাটা আদৌ ঠিক আছে তো।

হরিপদ বলল, 'কী গ্যাখেন পাল সাহেব ?'

'কুছু না, কুছু না, তুই খাবি তো। থোড়া ঠার, আমি তোর খানা আনছি।'

পাল সাহাব ঝুপড়িতে গিয়ে ঢুকল। একটু পর কাঠের বর্তনে খান দুই রুখা রোটি আর খানিকটা শুখা ভাজি নিয়ে বেরিয়ে এল। হরিপদর সামনে বর্তনটা রেখে বলল, 'খা।'

খাবার পর হরিপদ বলল, 'একখান কথা কমু পাল সাহেব ?'

'বল।'

হরিপদর পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল পাল সাহাব।

কেসে গলা সাফ করে নিল হরিপদ। শুরু করল, 'পাল সাহেব, আমি অনেক ভাবলাম। এ ভালই হইল, এ-ই বুঝি ভগমানের মাইর (মার)। এই তার বিচার।'

'কী বলছিস ?'

কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল পাল সাহাব।

'পাল সাহেব, কুনোদিন তিলিরে একখান মিঠা কথা কই নাই। এট্টু সুখ কি একখান পুত, কিছুই দিতে পারি নাই। পনের বচ্ছর তিলি আমার লগে (সঙ্গে) ঘর করছে। এই পনের বচ্ছর আমি সমানে ভুগছি। তিলি আমার সেবা করছে। সে আমারে খালি

দিছেই, আমি নিছি। বদলে তারে আমি সন্দ করছি, দিন রাইত খিচির খিচির করছি, গালি দিছি, ঘরের বাইর করে দিছি।'

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলার ধকলে খুব একচোট হাঁপায় হরিপদ। বলে, 'কিছুই তারে দিতে পারি নাই। না একখান ভাল মন, না একখান ভাল শরীল। কিছুই না, কিছুই না। ব্যারামই আমারে শ্যাষ করল। আমার শরীলে ব্যারাম, মনে ব্যারাম। ব্যারাম আমার সবখানে।'

অস্ফুট একটা শব্দ করে পাল সাহাব।

আশ্চর্য!

হরিপদর স্বরে আবেগ নেই, অস্থিরতা নেই, কাঁপুনি নেই। শান্ত, স্থির, উদাসীন গলায় সে বলে যায়, 'এ-ই ভাল হইল পাল সাহেব, এ-ই ভাল হইল।'

'কী ভাল হ'ল রে হরিপদ?'

'আমি তো মরেই আছি। আমার কুনো আশা নাই। যে কাল ব্যারাম শরীলে বাসা বানছে (বাঁধছে), তা কুনোদিনই সারব না। আমি মরুমই। কিন্তুক তিলি বাঁচুক। উর ভরা শরীল, ভরা যৈবন, ভরা মন। আমার লেইগা (জন্য) তিলি ক্যান মরব? না না, তিলি বাঁচুক। আপনে তার বিহিত করে দ্যান।'

'আমি কী করব?'

'তিলির লগে যুগেনের বিয়া দ্যান। উরা একজন আর এক-জনেরে ভালবাসে। উয়াগো (ওদের) অনেক কালের পিরীত, অনেক কালের জানাশুনা, অনেক কালের বুঝাপড়া। উরা বিয়া করলে সুখী হইব, ভরে উঠব।'

'লেকিন তুই?'

'আমি কী? আমি—'

ঠোঁট দুটো থরথর কাঁপে। ঘোলাটে চোখের কোল বেয়ে লোনা জল টস টস করে ঝরতে থাকে। গলাটা বুঁজে আসে হরিপদর।

ভাঙা, কাঁপা, ফিস ফিস স্বরে সে বলে, 'আমি কিছু না পাল সাহেব। কেউ না। আমার লেইগা (জন্য) আপনে ভাববেন না। আমি—আমি চিরটা কাল তিলির বুকে কাঁটার মত আটকাইয়া আছি। আর না। এইবার আমি—'

বলতে বলতে গলাটা ধরে যায়। দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদে হরিপদ। কান্নাভরা, অবুঝ, অস্ফুট গলায় বিড় বিড় করে কি যে বলে, বোঝা যায় না।

হরিপদর পিঠে একটা হাত রেখে চুপচাপ বসে থাকে পাল সাহাব। সকাল বেলাতেই আজ তার মনটা ভারি খারাপ হয়ে যায়।

বিকালের দিকে যোগেনের খোঁজে বেরিয়েছিল পাল সাহাব। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

মধ্যম ঋতুর দিন বেশ খানিকটা আগেই মরেছে। জঙ্গলের ভিতর অন্ধকার গাঢ় হতে শুরু করেছে। আর সেই অন্ধকারকে বিঁধে বিঁধে হাজারটা জোনাকি জ্বলছে, নিবছে। নিবছে, জ্বলছে।

ঝুপড়িটার সামনে একটা ঢালু খাদ। খাদটার এপাশ থেকে পাল সাহাব ডাকতে শুরু করল, 'মা-তিন, এ মা-তিন—'

জবাব মিলল না।

পাল সাহাব গলা চড়াল, 'এ মাগী, জলদি লালটিন (লণ্ঠন) নিয়ে আয়।'

এবারও জবাব নেই।

পাল সাহাব গজ গজ করতে লাগল, 'মাগীর সব ভাল। লেকিন নিদটা বহুত খারাব। দিন যেই খতম হ'ল, আন্ধার যেই নামল, অমনি কুত্তীটা বিস্তারায় (বিছানায়) গিয়ে পড়ল।'

আরো কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করে পাথরের খাঁজে খাঁজে পা ফেলে খাদে নামল পাল সাহাব। একসময় খাদটা পার হয়ে ঝুপড়িতে এসে ঢুকল।

আশ্চর্য!

ঝুপড়িতে মা-তিন নেই। হরিপদও নেই।

পাল সাহাব চিল্লাতে লাগল, 'এ মা-তিন কুত্তী, এ হরিপদ কুত্তা—'

অনেকক্ষণ চিল্লাচিল্লি করে হয়রান হয়ে বসে পড়ল পাল সাহাব। সেই বিকাল থেকে মেজাজটা বদখত হয়ে রয়েছে।

অনেক খুঁজেও যোগেনকে পায় নি পাল সাহাব। সেই যে দিন দুই আগে ডিগলিপুরের খালে মাছ মারতে বেরিয়েছিল যোগেন, আজও ফেরে নি।

অথচ তাকে না পেলে কোন আসানই হবে না।

তিলি, যোগেন আর হরিপদ—তিনটি মানুষের মধ্যে যে সম্পর্কটা জটিল এবং অস্বাভাবিক হয়ে রয়েছে, যোগেনকে পেলে তা সহজ, স্বাভাবিক হতে পারে।

কিন্তু যোগেনকে পাওয়া যাচ্ছে না।

পাল সাহাব একা একা বসে বিড় বিড় করতে লাগল।

রাত বাড়ছে। অন্ধকার আরো ঘন, আরো গাঢ় হচ্ছে। জোনাকিরা সমানে জ্বলে আর নেবে। জ্বলা আর নেবায় তাদের ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই।

এখন রাত্রির বয়স কত, কে বলবে।

জঙ্গলের দিক থেকে গান্ধী আর বাড়িয়া পোকা ঝাঁকে ঝাঁকে উঠে আসছে। চামড়ায় হুল ফুটিয়ে পাল সাহাবকে অস্থির করে তুলছে।

জঙ্গলের মাথায় সিন্ধুসারসগুলো ডানা ঝাপটায়। মাঝে মাঝে কর্কশ শব্দ করে ডেকে ওঠে, 'ক্বক—ক্বক—ক্বক—'

হঠাৎ পাল সাহাবের চোখে পড়ল, সামনের খাদ বেয়ে একটা মশাল উঠে আসছে।

পাল সাহাব হাঁকল, 'কৌন রে?'

'আমি—'

গলার স্বরেই বোঝা গেল, মা-তিন।

একসময় মা-তিন আর মশালটা পাল সাহাবের সামনে এসে পড়ল।

পাল সাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'কোথায় গিয়েছিলি মাগী?'

'হরিপদকে ঢুঁড়তে।'

'হরিপদকে ঢুঁড়তে!'

পাল সাহাব চমকে উঠল। বলল, 'হরিপদ কোথায়?'

'কোথায়, আমি কী জানি।'

মা-তিন বলতে লাগল, 'বিকালে তুই বেরুবার পর আমি নদীতে পানি আনতে গেলাম। ফিরে এসে দেখি, কুত্তাটা নেই। ইধরের উধরের জঙ্গলে বহুত ঢুঁড়লাম, লেকিন হারামীটাকে পেলাম না।'

মা-তিনের গলাটা হতাশ শোনাল, 'কোথায় যে ভাগল হরিপদ!'

'চল্-চল্—'

লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল পাল সাহাব। মশাল-সুদ্ধ মা-তিনের একটা হাত ধরে টানতে টানতে সেটেলমেন্টে চলে এল। হারাণকে ডাকল, চন্দ্র জয়ধরকে ডাকল, উদ্ধব বৈরাগী, রসিক শীল—জন বিশেককে ডেকে বিশটা মশাল ধরিয়ে চারপাশের জঙ্গলে খোঁজা-খুঁজি শুরু করল।

বিশজন মানুষ সমস্ত রাত খুঁজল। কিন্তু হরিপদকে পাওয়া গেল না। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে কোথাও তার চিহ্ন নেই।

ভোরের দিকে যে যার ঘরে ফিরল।

মা-তিনকে নিয়ে টলতে টলতে নিজের ঝুপড়িতে ফিরে এল পাল সাহাব। বারান্দার পাটাতনে ঝিম মেরে বসে রইল।

সমস্ত রাত জঙ্গলে জঙ্গলে, পাহাড়ের চড়াই-উতরাইতে ঘুরেছে। কাঁটা আর গোঁজের খোঁচা খেয়ে চামড়া ফেঁসে গিয়েছে। খাবলা খাবলা মাংস উঠে গিয়েছে। পাথরে টক্কর খেয়ে পায়ের নখ থেঁতলে গিয়েছে। সারা দেহে রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

চোখা চোখা দাড়িগোঁফে মুখটা কর্কশ হয়ে আছে। লম্বা লম্বা, তামাটে চুল কপাল, চোখ এবং গালের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। চোখ দুটো টকটকে লাল। মনে হয়, দু পিণ্ড তাজা রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

এখনও ঠিকমত সকাল হয় নি।

রোদ ওঠার ঠিক আগের মুহূর্তে আকাশটা এখন আবছা আবছা, অস্পষ্ট। আলো আর আঁধারিতে দুর্বোধ্য।

আকাশের দিকে তাকিয়ে গাঢ়, মন্থর এবং দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলল পাল সাহাব। হরিপদর জন্য অদ্ভুত এক দুঃখ তাকে অস্থির, অভিভূত করে ফেলেছে।

রুগ্ন দেহ আর রুগ্ন মন নিয়ে জীবনকে আদৌ ভোগ করতে পারল না হরিপদ। জীবন তার আয়ত্তের বাইরেই থেকে গেল। ব্যারামের জন্য এই পৃথিবীতে কেউ তার আপন না। এমন কি নিজের বউ পর্যন্ত তাকে অগ্রাহ্য করে পরের ছেলে পেটে নিয়ে গর্ভিণী হয়ে বসেছে। তিলির কাছে চরম মার খেয়ে, অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে নিজের ক্ষীণ, অসহায় অস্তিত্বকে সে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলেছে।

কোথায় যে হরিপদ চলে গিয়েছে, কে বলবে।

ডিগলিপুরের সেটেলমেণ্ট থেকে এই প্রথম একটা মানুষ হারিয়ে গেল।

বারান্দার পাটাতনে ঝিম মেরে বসে ছিল পাল সাহাব। দুঃখ তার হয়েছে ঠিকই। হরিপদর জন্ম দুঃখ হওয়াই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু আশ্চর্য! দুঃখকে ছাপিয়ে বিচিত্র এক অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

পাল সাহাব ভাবছিল, এ বুঝি ভালই হ'ল।

হরিপদকে নিয়ে সে কি করবে?

যে মানুষ এক পরল মাটি কোপাতে পারবে না, একটা ঘর ছাইতে পারবে না, জাল বাইতে পারবে না, উর্বরা নারীর গর্ভে সন্তান আনতে পারবে না, তাকে নিয়ে কী করবে পাল সাহাব?

হরিপদ চলে গিয়েছে। এ বুঝি ভালই হ'ল।

বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে উপনিবেশ গড়ার ব্যাপারে যার কোন ভূমিকাই নেই, তার চলে যাওয়াই ভাল।

যে মানুষ কোন কাজেই লাগবে না, কোন প্রয়োজনেই আসবে না, শুধু রুগ্ন, বিষাক্ত অস্তিত্ব দিয়ে পাল সাহাবের এই দ্বীপকে বিষিয়ে রাখবে, তার চলে যাওয়াই মঙ্গল।

পাল সাহাবের এই দ্বীপে সুস্থ, সবল, তাজা মানুষ ছাড়া আর কারো ভূমিকা নেই, প্রয়োজনও নেই।

উনপঞ্চাশ

হারাণ হন্মে হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় ঋতুর শুরুতে পানিকররা সেই যে ডিগলিপুর এসেছিল, এখনও যায় নি। নিত্য ঢালীর ঘরে তারা জঁাকিয়ে বসেছে।

এখন আশ্বিন মাস যায় যায়।

রোজই একবার নিত্য ঢালীর বাড়ি যায় হারাণ। ঠিক বাড়িতে ঢোকে না। দূরে, সেই ডালপালা-পোড়া কবন্ধ গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।

উঠানে বসে সিপি সাফ করে তিন জন—লা তে, নিত্য ঢালী আর পানিকর।

সিপি সাফ করতে করতে ফাঁক বুঝে পানিকর উঠে পড়ে। পাকের ঘরের সামনে গিয়ে বসে। রসের কথা রঙ্গের কথা বলে কাপাসীকে রসিয়ে তোলে, মজিয়ে রাখে।

ঢলে ঢলে মেতে মেতে হেসে ওঠে কাপাসী।

দূর থেকে কাপাসীর ঢলানি আর মাতামাতি দেখে বুকের ভিতরটা যেন কেমন করে ওঠে হারাণের। দুঃখ-যন্ত্রণা-কান্নায় মেশা অসহ্য এক অনুভূতি পাকিয়ে পাকিয়ে গলার কাছে এসে আটকে যায়। হাজার ঢোক গিলেও সেটাকে নামানো যায় না। হাজার চেষ্টা করেও বার করা যায় না। অনড় হয়ে সেটা চেপে থাকে।

চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করে। এক সময় নিত্য ঢালীর উঠান,

ঘর, পানিকর, লা তে, কাপাসী—কিছুই দেখতে পায় না হারাণ। দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়ে যায়।

কবন্ধ গাছটার আড়াল থেকে টলতে টলতে কোনদিন নিজের ঘরে ফেরে, কোন দিন বা যেদিকে দু চোখ যায়, সে দিকে চলে যায় হারাণ।

রোজই তাকে তাকে থাকে হারাণ। কিন্তু না, ঠিক সুবিধামত একদিনও কাপাসীকে ধরতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে উঠল হারাণ।

কী একটা কাজে আজ সকালে তিন জনে অর্থাৎ পানিকর, লা তে আর নিত্য ঢালী, মায়া বন্দর গিয়েছে। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

সুবিধা বুঝে হারাণ এল।

উঠানে পা ছড়িয়ে বসে ছেঁড়া একটা শাড়ি সেলাই করছিল কাপাসী। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল। বলল, 'তুমি—'

'হ আমি। চিনতে অসুবিধা হয় নাকি?'

কাপাসী জবাব দিল না। মুখ নামিয়ে শাড়িতে ফোঁড় দিতে লাগল।

নীরস, কঠিন গলায় হারাণ বলল, 'শোন—'

মুখ না তুলেই কাপাসী বলল, 'কও—'

'মুখ তোল।'

'মুখ দিয়া তো শুনুম না। শুনুম কান দিয়া। তুমি কও—'

'ভাল কথা।'

কাপাসীর মুখোমুখি বসে পড়ল হারাণ। বলল, 'তোমার লগে আমার বুঝাপড়া আছে।'

'কিসের বুঝাপড়া?'

দাঁতে সুতা কাটতে কাটতে বার তিনেক একই কথা বলে কাপাসী, 'কিসের আবার বুঝাপড়া ? তুমি আমাগোর (আমাদের) পিছে লাগছ। আমরা নাকি বদ মতলবে পানিকর ভাইগো ঘরে এনে তুলছি ! কোলোনির সগল মানুষের কাছে তুমি আমাগোর নামে মোন্দ কথা রটাইয়া বেড়াও। সগলই কানে আসে।'

একটু থেমে কী যেন ভাবে কাপাসী। আবার বলে, 'তোমার লগে কিসের কথা ! কুনো কথা নাই, কুনো বুঝাপড়া নাই।'

ভারী, থমথমে গলায় হারাণ বলল, 'কী দুঃখে যে তোমাগোর পিছে লাগছি, তা যদি বুঝতা কাপাসী ! তা বোঝনের মন যদি তোমার থাকত !'

'কী কও তুমি !'

অবাক হয়ে হারাণের দিকে তাকায় কাপাসী।

'ঠিকই কই।'

গাঢ় গলায় হারাণ বলতে থাকে, 'তুমি সগল ভুলছ কাপাসী। সেই দিনগুলার কথা তোমার মনে নাই।'

ফিস ফিস করে কাপাসী বলে, 'কিছুই ভুলি নাই পুরুষ, ভুলি নাই। সগল কথা মনে আছে।'

'ভুলেই যদি না থাক, তবে আমার উপুর এমুন বৈমুখ (বিমুখ) হইছ ক্যান ? আমার লেইগা (জন্য) তোমার সেই টান নাই, সেই তাপ নাই।'

'আছে, আছে।'

মুখ নামিয়ে অস্ফুট, কাঁপা গলায় কাপাসী বলতে থাকে, 'তাপ আছে, টান আছে। তোমার লেইগা আমার সগল আছে।'

'ও তো মুখের কথা।'

'না গো, পরানের কথা।'

'বিশ্বাস হয় না।'

'ক্যান ?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হারাণ বলে, 'আমার উপুর তোমার টান যদি থাকতই, বিদেশী-বিজাতিরে ঘরে জায়গা দিতে না। মন দিতে না।'

'বিদেশী-বিজাতি আবার কে আসল!'

'রঙ্গ কইরো না কাপাসী।'

রুক্ষ গলায় হারাণ বলে, 'উই পানিকর আর লা তে বুঝি তোমাগোর স্বজাতি! কুন কালের বান্ধব?'

সহজ, স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছিল দু জনে। হারাণ আর কাপাসী, পরস্পরের প্রাণের তাপ পাচ্ছিল। একই আবেগ দু জনের বুকের ভিতর তির তির করে কাঁপছিল।

হঠাৎ তাল কাটল।

ভুরু দুটো কুঁচকে, চোখের তারা দুটো স্থির করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল কাপাসী। বলল, 'পানিকর ভাই স্বজাতির থিকা বড়। আত্ম বান্ধবের থিকা বড়।'

হারাণ ভেঙিয়ে উঠল, 'তা হইলে যা শুনছি মিছা না।'

'কী শুনছ?'

'পানিকর নাকি আর তোমার ভাই থাকব না। অন্য কিছু হইব।'

'বাহারের কথাই তো শুনছ।'

আচমকা হারাণকে ভয়ানক ভাবে চমকে দিয়ে মেতে মেতে ঢলে ঢলে হেসে উঠল কাপাসী।

লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল হারাণ।

হাসতে হাসতে কাপাসী বলল, 'চললা?'

'হ চললাম।'

দুঃখে, ক্ষোভে মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে হারাণের। রূঢ়, ভীষণ গলায় সে বলল, 'তোমার কাছে আর কুনো দিন আসুম না।'

সামনের উতরাই বেয়ে তর তর করে নামতে লাগল হারাণ।

হাসির দাপটে শরীরটা ছুমড়ে যাচ্ছে। ছুমড়াতে ছুমড়াতে কাপাসী বলল, 'যাইও না। আমি পাগল মানুষ, কী কইতে কী কইছি!'

হারাণ খেঁকিয়ে উঠল, 'তুমি যদি পাগল হও, ছুনিয়ার সগল মানুষ পাগল।'

হারাণ চলে গেল।

উঠানের নরম মাটিতে নখ দিয়ে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে কাপাসী বিড় বিড় করে, 'বুঝলা না, আমারে বুঝলা না পুরুষ।'

বলে আর ঢলে ঢলে হাসে কাপাসী।

পঞ্চাশ

যে মতলব নিয়ে পানিকর ডিগলিপুরের সেটেলমেণ্টে এসেছিল, পুরাপুরি তা হাসিল হ'ল না। অথচ এখানে থাকার মেয়াদও তার ফুরিয়ে এসেছে।

বর্ষার মুখে মুখে সিপি আর লা তে'কে নিয়ে নিত্য ঢালীর ঘরে উঠেছিল পানিকর।

এখন তৃতীয় ঋতু যায় যায়।

এর মধ্যে সিপি সাফ হয়ে গিয়েছে।

সিপি সাফ করাটা ছিল অছিলা। এই অছিলায় যতদিন ডিগলিপুর থাকা যায়।

পানিকররা অনেক দিনই রইল ডিগলিপুরের সেটেলমেণ্টে। সিপি সাফ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের থাকার মেয়াদও ফুরিয়ে এসেছে।

মেয়াদ ফুরিয়েছে কিন্তু যে মতলবে এখানে এসেছিল, তা হাসিল হচ্ছে না।

পানিকর অনেকবার বলেছে, 'নিত্য চাচা, কলোনির সবার সাথ আমার জান পয়চান করিয়ে দাও।'

নিত্য ঢালী বলেছে, 'ঐ কথা মুখেও আনবেন না পানিকর বাবা।'

'এ বাত বলছ কেন চাচা?'

'সাধে কী আর এই কথা মুখে আনি বাবা, বড় দুঃখে আনি।'

বেজার গলায় নিত্য ঢালী বলতে থাকে, 'আপনে বিদেশী-বিজাতি, আপনেরে কেও দুই চোখে দেখতে পারে না।'

পানিকর বলেছে, 'আমার কসুর কী?'

'তা জানি না বাবা। আপনেরে ঘরে এনে তুলছি, তাতেই কোলোনির সগল মানুষ আমার উপুর ক্ষেপে আছে।'

অস্ফুট শব্দ করে পানিকর কি বলেছে, বোঝা যায় নি।

নিত্য ঢালী থামে নি, 'কাম নাই পানিকর বাবা, কারো লগে আলাপ পরিচয় করনের কাম নাই। যারা আপনেরে চায় না, তাগো (তাদের) কাছে গিয়া কী লাভ? আপনে আমার কাছেই থাকেন।'

অগত্যা চুপ করে গিয়েছে পানিকর।

নিত্য ঢালীর কথাই ঠিক। ডিগলিপুর সেটেলমেণ্টের কেউ যে তাকে পছন্দ করে না, এই সাদামাঠা, সহজ কথাটা আঁচ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি পানিকরকে।

নিত্য ঢালীর উঠানে বসলে সামনের ঢালু পথটা দেখা যায়। পথটা দুটো টিলার মাথায় পাক খেয়ে কিলপঙ নদীর দিকে চলে গিয়েছে।

সকাল-বিকাল ডিগলিপুরের যুবতী বৌ-ঝিরা সেই পথটা ধরে কিলপঙ নদীতে জল আনতে যায়।

একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখে পানিকর। চোখে পাতা পড়ে না। চোখের তারা দুটো সাপের চোখের মত ঝিক ঝিক করতে থাকে।

ডিগলিপুরের বৌ-ঝিদের দেখে আর হতাশায়, নিরুপায় আক্রোশে হাত-পা কামড়ায় পানিকর। তাদের কাছে ঘেঁষার জো নেই। হাত-পা কামড়ানো ছাড়া পানিকরের উপায়ই বা কী?

আধারকর বলেছিল, এক একটা জোয়ানী লেড়কি বাগিয়ে আনতে পারলে এক এক হাজার রুপেয়া মিলবে।

আধারকরের কথা ভাবতে ভাবতে উন্মাদের মত হয়ে ওঠে পানিকর।

এখন দুপুর।

আকাশে দু চার টুকরা হানাদার মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। নৈঋ'ত কোণ থেকে মেঘগুলি উঠে এসে বায়ু কোণে চলেছে।

মেঘের সঙ্গে যুঝে যুঝে যেটুকু রোদ এই দ্বীপে আসতে পেরেছে, তাতে জেল্লা নেই, তাপ নেই। কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে, নিস্তেজ।

জঙ্গলের মাথায় কুক দিয়ে দিয়ে একটা কাটৌরা পাখি থেকে থেকে ডেকে উঠছে।

তৃতীয় ঋতুর দুপুরটা কেমন যেন উদাস হয়ে রয়েছে।

উঠানের এক কিনারে সিপি শুছাচ্ছে লা তে। আর এক কিনারে ঘেঁষাঘেঁষি করে বড় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে দুই মূর্তি। পানিকর এবং নিত্য ঢালী।

পানিকর বলল, 'সিপি তো বিলকুল সাফ হয়ে গেল।'

'হ, তা হইল।'

নিত্য ঢালী তামাক সাজছিল। কলকির খোলে তামাক পুরতে পুরতে বলল, 'সিপি সাফ করতে আর কয়দিন লাগে ?'

পানিকর জবাব দিল না। অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

নিত্য ঢালীর তামাক সাজা হয়ে গিয়েছিল। হুঁকোটা পানিকরের হাতে গুঁজতে গুঁজতে বলল, 'ধরেন পানিকর বাবা, জুত করে টানেন।'

হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা ধরল পানিকর। ভুক ভুক করে টানতে টানতে সেই কথাটাই ভাবতে লাগল।

মতলব তার হাসিল হ'ল না। ডিগলিপুরের বাসিন্দারা তাকে পছন্দ করে না। তা না করুক।

এই যে ক'মাস সে নিত্য ঢালীর বাড়িতে রইল, তাতে কম টাকা খরচ হয়েছে? মায়াবন্দর থেকে সিপি এনেছে, তার খরচ। সিপি নিয়ে যাবে, তার খরচ। নিত্য ঢালীর বাড়িতে একটা নয়া ঝুপড়ি তুলেছে, তার খরচ। এই ক'মাসে নিত্য ঢালীরা দু-জন আর তারা দু-জন— মোট চারজনের খাই খরচ; সবই তো তার গাঁট থেকে গিয়েছে।

পানিকর ধূর্ত, ব্যবসাদার মানুষ। দরাজ হাতে পয়সা ছড়াতে তার আপত্তি নেই, যদি সেই পয়সা দুগুণ তিনগুণ হয়ে ফেরে।

কিন্তু ডিগলিপুরে যে টাকা সে ছড়িয়েছে, তা পুরা ফিরে আসবে কিনা সন্দেহ। কথাটা যতই ভাবল, মাথাটা গরম হয়ে উঠল পানিকরের।

অবশ্য তার মুঠার ভিতর কাপাসী আছে।

কাপাসী! একটা আধা পাগল মেয়ের কীম্মৎ কত? যতই হোক, আধারকরের হাতে তাকে তুলে দেবে পানিকর। লাভ না থাক, কাপাসীদের পিছনে যে টাকা সে ঢেলেছে, অন্তত তা-ও যদি উঠে আসে!

ভাবতে ভাবতে যেন মরিয়া হয়ে উঠল পানিকর। ফিস ফিস করে ডাকল, 'নিত্য চাচা—'

পানিকরের হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে টানছিল নিত্য ঢালী। আয়েশ করে একমুখ গাঢ় ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'কী ক'ন পানিকর বাবা?'

'সিপি সাফ হয়ে গেল। এবার তো আমাদের যেতে হবে।'

'তা হইব।'

নিত্য ঢালী আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

পানিকর বলে, 'লেকিন একটা বাত—'

'কী?'

'কাপাসীকে পাগলদের সিকমেনডেরায় (হাসপাতালে) নিয়ে যাব।'

'কবে নিয়া যাইবেন?'

'দো-চার রোজের অন্দর।'

'ভালই হইব। তা হইলে গোছগাছ আরম্ভ করি।'

পানিকর বলে, 'তুমিও যেতে চাও নাকি চাচা?'

'বাঃ, মেয়ে যাইব আর যামু না! কেমুন কথা ক'ন পানিকর বাবা? একে পাগল মানুষ, তার উপুর বয়েৱ (যুবতী) মেয়ে। তারে কী একা একা ছাড়তে পারি?'

কী একটু যেন ভাবে পানিকর। হঠাৎ সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'ওই দ্যাখ, শিরটা আমার বিলকুল গড়বড় হয়ে গেছে। কী বলতে কী বলছি! তুমিও যাবে, জরুর যাবে। তুমি না গেলে চলবে না। আমি সোচলাম তুমি গেলে এই কোঠি কে দেখবে? তাই—'

একটু চুপ। নিত্য ঢালী বলে, 'আচ্ছা পানিকর বাবা, কাপাসী ভাল হইব? আগের লাখান (মত) হইব? পাগলামি ঘুচব?'

বিড় বিড় করে বকতে বকতে উঠে পড়ে পানিকর। কি যে সে বকে, ঠিক বোঝা যায় না।

বকতে বকতে পাকের ঘরের দিকে চলে যায় পানিকর।

আরো কিছুক্ষণ হুঁকো টানল নিত্য ঢালী। তারপর কলকিটা উপুড় করে পোড়া তামাক আর ছাই ঢেলে দিল।

উঠানের আর এক কিনারে ঘাড় গুঁজে সিপি গুছাচ্ছে লা তে। হঠাৎ মুখ তুলে সে ডাকল, 'নিত্য চাচা—'

পানিকরের দেখাদেখি সে-ও নিত্যকে চাচা ডাকে।

নিত্য ঢালী বলল, 'কী কইস?'

'ইধর এসো।'

হুঁকো-কলকি রেখে লা তে'র পাশে এসে বসল নিত্য ঢালী। লা তে বলল, 'মালেক তোমাকে কী বলল?'

'কী আর কইব ? আমারে আর কাপাসীরে নিয়া পানিকর বাবায় পাগলগো হাসপাতল যাইব।'

লা তে বলল, 'এ্যায়সা কাম করো না চাচা। বহুত মুশকিলে পড়ে যাবে।'

'কী কইস তুই ?'

'একটা বাতই বলি। তুমি মালেকের সাথ যেও না চাচা।'

নিত্য ঢালী ভেঙিয়ে উঠল, 'আমার ভাল হয়, পিরথিমীর কেউ চায় না। কাপাসী ভাল হউক, কেউ চায় না। সগলে আমার শত্তুর। পানিকর বাবার লগে আমি যামু, একশত বার যামু। সিধা কথা।'

বলতে বলতে লাফ মেরে উঠে দাঁড়ায় নিত্য ঢালী।

একান্ন

হারাণ যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

সেদিন কাপাসীকে বলে এসেছিল, আর কোনদিন সে তার কাছে যাবে না। কিন্তু প্রতিজ্ঞাটা বেশিদিন স্থায়ী হ'ল না।

হঠাৎ একদিন ডিগলিপুরের বাসিন্দাদের অর্থাৎ রসিক শীল, বুড়ী বাসিনী, উদ্ধব বৈরাগী—এমনি দশ বারো জনকে জুটিয়ে, তাদের তাতিয়ে, নিত্য ঢালীর বাড়িতে এসে উঠল হারাণ।

দু-একদিনের মধ্যে নিত্য ঢালীরা পানিকরের সঙ্গে রওনা হবে। তাই বোঁচকা-বুঁচকি বাঁধার কাজ চলছিল।

পানিকর আর লা তে উঠানে বসে বিরাট বিরাট টিনের বাক্সে সিপি সাজিয়ে রাখছিল। লোকজন দেখে তারা নতুন ঘরটায় গিয়ে ঢুকল।

বুড়ী বাসিনী ডাকাডাকি শুরু করল, 'নিত্যা, নিত্যা রে—'

'কে ?'

বোঁচকা বাঁধা স্থগিত রেখে বাইরে বেরিয়ে এল নিত্য ঢালী। একসঙ্গে এতগুলি মানুষকে দেখে একটু যেন ভয়ই পেয়ে গেল। কাঁপা গলায় বলল, 'তোমরা এতজনে—'

বাসিনী বলল, 'হ, এতজনে আসলাম।'

'কী মনে কইরা (করে) আসছ ?'

'আসলাম রঙ্গ দেখতে। তুই তো আর ডেকে আনলি না। আমাগোরই (আমাদেরই) আসতে হইল।'

অল্প একটু হাসল বুড়ী বাসিনী।

'কী কও খুড়ী ?'

'ঠিকই কই।'

বুড়ী বাসিনী বলতে থাকে, 'শোনলাম, বিজাতি-বিদেশীর লগে কুটুম্বিতা পাতাবি।'

'কে কইল (বলল) ?'

'কে না কইল। ডিগলিপুরের সগলেই এই খপর জানে।'

এতক্ষণে খানিকটা ধাতস্থ হয়েছে নিত্য ঢালী। করুণ গলায় সে বলল, 'তোমরা কী আমারে ইট্টু শান্তিতেও থাকতে দিবা না ? তোমাগোর (তোমাদের) কী করছি আমি ?'

'তোরেই বা আমরা কী করছি ?'

নিত্য ঢালী জবাব দিল না।

বুড়ী বাসিনী বলতে লাগল, 'তোর লগে আমরা কী শত্তুরতা করলাম ?'

বিড় বিড় করে নিত্য ঢালী বলল, 'কিসের আবার শত্তুরতা ?'

'হ, নিচ্চয় আমরা তোর শত্তুর হইছি। না হইলে স্বজাতির লগে কেউ সম্পক্ক ঘুচায় ? তুই যে এমুন হবি, আমরা কুনো কালে ভাবি নাই নিত্যা।'

বুড়ী বাসিনীর গলায় দুঃখের, আক্ষেপের স্বর ফোটে, 'আমরা তোর পর হইলাম, শত্তুর হইলাম। যত আপন হইল বিদেশী-বিজাতি, যত বান্ধব হইল তারা !'

নিত্য ঢালী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল।

তার আগেই সবাইকে ঠেলে গুঁতিয়ে সামনে এগিয়ে এল হারাণ। বলল, 'কথা থাউক তালুই, তাগো (তাদের) দেখাও।'

'কাগো (কাদের) দেখামু ?'

'কুটুম, তোমার সাধের কুটুমগো দেখাও। আমরা নয়ন ভরে দেখে যাই।'

টেনে টেনে হাসে হারাণ। সেই হাসিতে জ্বালা এবং ক্ষোভ মিশে আছে।

বুড়ী বাসিনী বলে, 'হ-হ, তাই দেখা।'

রসিক শীল বলে, 'দেখারে নিত্যা, দেখা।'

বাকী সকলে তাড়া দেয়, 'তরাতরি কর। কুটুমের মুখ দেখে ঘরে ফিরি। এইদিকে বেলা হইয়া যায়।'

নিত্য ঢালীর মাথাটা বুঝি খারাপ হয়ে যাবে। গলা ফাটিয়ে সে চিল্লায়, 'কী কও তোমরা? কে কার কুটুম? কিসের কুটুম?'

হারাণ বলে, 'রঙ্গ কইরো না তালুই। ডিগলিপুরের সগলে জানে, কে কার কুটুম।'

'না-না, আমার কুটুম নাই। তোমরা যাও।'

নিত্য ঢালী সমানে চেঁচায়।

'যামু যামু, কুটুমের মুখ না দেখে যাই কেমনে? বড় সাধ নিয়া তোমার কাছে আসছি।'

হারাণ খেঁকিয়ে খেঁকিয়ে হাসে।

'তোগো (তোদের) পায়ে ধরি, তোরা যা। তোগো কাছে কী অপরাধ করছি, যে আমারে অমুন দুঃখু দিস!'

হারাণ বলে, 'যামু যামু। তার আগে কুটুম দেখাও। চক্ষের দেখা দেখে চলে যামু। আর তোমারে জ্বালামু না।'

'কতবার কমু (বলব), আমার কুটুম নাই?'

'কুটুম না থাউক, জামাই তো আছে। জামাই দেখাও।'

'জামাই!'

নিত্য ঢালীর গলাটা কেঁপে গেল, 'কে জামাই?'

'হাসাইলা তালুই, হাসাইলা।'

হারাণ বলতে লাগল, 'পিরথিমীর সগলে জানে। আর তুমিই নিজের জামাইরে জান না?'

'না-না, জানি না।'

পাগলের মত চিৎকার করে নিত্য ঢালী।

'জান না যখন, তখন আমিই কই, কে তোমার জামাই।'

একটু থামে হারাণ। রসিক শীল, বুড়ী বাসিনী, উদ্ধব বৈরাগী —সকলের মুখের উপর দিয়ে চোখ দুটো ঘুরিয়ে নিয়ে যায়। তারপর খুব আস্তে, ফিস ফিস করে বলে, 'শোনলাম, পানিকরই নাকি তোমার জামাই হইব।'

হারাণের কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল নিত্য ঢালী। দৌড়ে নতুন ঘরটায় গিয়ে ঢুকল। পানিকরের হাত ধরে টানতে টানতে আবার বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর চিল্লাতে লাগল, 'গ্যাখ হারাইণা (হারাণ), দেখ তোমরা, সগলে দেখ, আমার কুটুম দেখ। লয়ন ভরে দেখ। পরান ভরে দেখ। খালি কুটুম না, আমার জামাই। দিমু, আমার কাপাসীরে পানিকর বাবার হাতেই দিমু।'

একটু থামে। টেনে টেনে দম নেয়। চিলের মত ধারাল গলায় চেঁচাতে থাকে, 'হারাইণা, তোর সাধ মিটছে তো?'

খুব শান্ত গলায় হারাণ বলে, 'মিটছে।'

'জামাইর মুখ দেখলি, এইবার যা।'

'হ, তাই যামু।'

রসিক শীলদের নিয়ে হারাণ চলে গেল।

বাহান্ন

রাত থাকতে থাকতেই তারা রওনা হ'ল।

তারা চারজন। অর্থাৎ পানিকর, লা তে, নিত্য ঢালী এবং কাপাসী।

এখনও বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপটা গাঢ় ঘুম আর ঘন অন্ধকারে তলিয়ে আছে।

একটা মানুষ কি একটা পাখিও এখন পর্যন্ত জাগে নি।

এই দ্বীপ এখন নিঝুম, নিঃশব্দ।

তারা চলেছে।

বোঁচকা বুঁচকি মাথায় চাপিয়ে সবার আগে আগে যাচ্ছে লা তে। মাঝখানে কাপাসী। পিছনে নিত্য ঢালী আর পানিকর।

পা ফেলতে ঠোক্কর, মাথায় টক্কর আর চারপাশ থেকে কাঁটা এবং গোঁজের খোঁচা লাগছে। জোঁক, বাড়িয়া পোকা আর গান্ধী পোকার উৎপাত তো আছেই।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে তারা এগুচ্ছে।

ফিস ফিস করে নিত্য ঢালী ডাকে, 'পানিকর বাবা—'

পাশ থেকে পানিকর বলল, 'হাঁ—'

'আমার বড় ডর করে।'

'কিসের ডর ?'

'এই যে সগলেরে ছেড়ে আসলাম। কারো এট্টা যুক্তি নিলাম না। কারো লগে পরামশ্য (পরামর্শ) করলাম না।'

রাত থাকতে থাকতে তারা ডিগলিপুরের সেটেলমেণ্ট ছেড়ে এসেছে। কারো সঙ্গে, এমন কি পাল সাহাবের সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করে আসে নি নিত্য ঢালী।

কারো সঙ্গে যুক্তি করল না, পরামর্শ করল না, ঝোঁকের মাথায় সেটেলমেণ্ট ছেড়ে চলে এল !

হাজার বান্ধব হোক, পানিকর বিদেশী-বিজাতি। মাত্র কয়েক মাস হ'ল, তার সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে। তার কথায় ভরসা করে কাপাসীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়া বুঝি ঠিক হ'ল না।

গাঢ় অন্ধকার ফুঁড়ে এগুতে এগুতে নিত্য ঢালীর মনে হ'ল, পানিকরের সঙ্গে না বেরুলেই ভাল হত। মনে হ'ল, চারপাশ থেকে অদ্ভুত এক ভয় একটু একটু করে তাকে ঘিরে ধরছে।

কাঁপা গলায় নিত্য ঢালী বলল, 'কারোরে না কইয়া (বলে) ঝোঁকের মাথায় বাইর হইয়া পড়লাম। এই কী ভাল হইল ?'

পানিকর কিছু বলল না।

নিত্য ঢালী ডাকল, 'পানিকর বাবা—'

'হাঁ—'

'আপনে কিছু ক'ন (বলেন) না যে ?'

'কী বলব ?'

'এই যে ঘরদুয়ার, আত্মবান্ধব, স্বজাতি-স্বদেশীগো ছেড়ে আসলাম, এ কী ভাল হইল ?'

অন্ধকারে পানিকরের মুখ দেখা যায় না। তার চোখের ভাষা পড়া যায় না।

নিত্য ঢালী বুঝতে পারল, কাঁধের উপর একটা হাত এসে পড়েছে। পানিকরের হাত।

নিত্যর কানের ভিতর মুখটা গুঁজে পানিকর বলল, 'চাচা, ঘাবড়াও মাত—'

নিত্য ঢালী জবাব দিল না।

পানিকর আবার বলল, 'ডিগলিপুরের কলোনিতে পড়ে থাকলে তোমার লেড়কি কী ভাল হত ?'

'না।'

অস্ফুট একটা শব্দ করে মাথা নাড়ে নিত্য ঢালী। মাথা নাড়তে নাড়তেই সামনের দিকে পা বাড়ায়।

জঙ্গল আর পাহাড় ফুঁড়ে ঠাণ্ডা, জলো বাতাস উঠে আসছে।

এটা বছরের মধ্যম ঋতু।

এখন বাতাসে হিম মিশতে শুরু করেছে।

নিত্যরা যত এগুচ্ছে, বাতাস তত জলো হয়ে উঠছে। বোঝা গেল, তারা এরিয়াল উপসাগরের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

হঠাৎ নিত্য ঢালী বলল, 'পানিকর বাবা, আমার মনে একখান সাধ আছে। শুনবেন ?'

'বল।'

'সেইদিন নিজের চোখেই তো সগল দেখলেন। আপনেরে ঘরে এনে তুলেছি, তাতে ডিগলিপুরের কেউ খুশি না।'

'হাঁ, ও তো দেখলাম।'

'সেইদিন রাগের মাথায় ওগো (ওদের) কইছিলাম, আপনে আমার জামাই। কইছিলাম, আপনের হাতেই কাপাসীরে দিমু। মনে আছে ?'

'আছে। সব কুছ ইয়াদ আছে।'

আস্তে আস্তে বলে পানিকর।

'আপনে গোসা হন নাই তো পানিকর বাবা ?'

'আরে না না চাচা।' পানিকর শব্দ করে হাসে। বলে, 'গোসা হব কেন ? না না, আমি গোসা হই নি।'

পানিকরের কথা শেষ হবার আগেই বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপটাকে ভীষণ ভাবে শিউরে দিয়ে কলকলিয়ে হেসে উঠল কাপাসী।

হাসিটা একটু একটু করে মাততে লাগল।

নিত্য ঢালীরা এরিয়াল উপসাগরের পারে এসে যখন পৌঁছল, তখন সকাল হয়েছে।

সকাল হয়েছে কিন্তু কুয়াশা ঘোচে নি।

ফিকে, সাদা কুয়াশার একটা পর্দা উপসাগরটার উপর ঝুলছে।

এখন কিছুই খুব স্পষ্ট নয়।

পিছনের স্যাডল পাহাড়, সামনের ছোট ছোট নির্জন দ্বীপ, উপসাগরের নীল জল, পারের ম্যানগ্রোভ বন, ক্ষয়িত পাথর—সব কিছু কুয়াশায় একাকার হয়ে আছে।

অনেক উঁচুতে আকাশটা ঘষা ঘষা, বিরাট এক টুকরা নীল কাচের মত দেখাচ্ছে।

দেখতে দেখতে পুব দিকটা ফরসা হয়ে গেল।

মধ্যম ঋতুর কুয়াশায় গাঢ়তা নেই। দিনের আলোর সঙ্গে বেশিক্ষণ সে যুঝতে পারল না। ফিকে কুয়াশা ছিঁড়ে ছিঁড়ে উড়ে উড়ে যেতে লাগল।

সামনের ছোট ছোট দ্বীপ, পিছনের স্যাডল পাহাড়, ম্যানগ্রোভ বন—যা ছিল অস্পষ্ট, সব ফুটে বেরুল।

একসময় উপসাগরের মাথায় সাগরপাখি দেখা দিল। নীল জল ফুঁড়ে, ফিন ফিনে রুপালী ডানায় দিনের প্রথম রোদ মেখে উড়ুক্কু মাছেরা উড়তে লাগল।

এরিয়াল উপসাগর এখন খুব শান্ত, নিস্তরঙ্গ। তার নীল জলে মাতামাতি নেই, ক্ষ্যাপামি নেই। এখন ঢেউ ওঠে কি ওঠে না।

'নটিলাস' বোটটা এক কিনারে একটা ম্যানগ্রোভ গাছের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। বাতাসের বাড়ি খেয়ে অল্প অল্প দুলছে।

বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে আগে উঠল লা তে। তারপর কাপাসী। কাপাসীর পর নিত্য ঢালী। সবার শেষে উঠল পানিকর।

মাঝখানে শেড।

শেডের এপারে বসেছে লা তে। ওপারে তিন জন অর্থাৎ পানিকর, নিত্য ঢালী আর কাপাসী।

মোটর বোটটার ইঞ্জিনে কি যেন গোলমাল হয়েছে। ছোট একটা হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে কলকব্জা সারাচ্ছে পানিকর। ঠুক ঠুক আওয়াজ হচ্ছে।

জলের দিকে ঝুঁকে ঝিম মেরে বসে আছে লা তে।

পারের কাছটা অগভীর। এক বুক জল হবে। স্বচ্ছ, টলটলে জল। উপসাগরের নীচে লাল নীল অসংখ্য ছোট ছোট পাথর চিকমিক করছে। দিনের প্রথম রোদ লেগে বাদামী রঙের বালু-কণাগুলি জ্বলছে।

জলের নীচের বালিতে সিপি চলার সরু মোটা, কত যে দাগ আঁকা হয়েছে, লেখাজোখা নেই।

শেডের ওপাশে সমানে হাতুড়ি ঠুকছে পানিকর।

লা তে'র কান রয়েছে হাতুড়ির আওয়াজে। চোখ রয়েছে উপসাগরের নীচে।

জলের দিকে আরো ঝুঁকে একটা কথাই ভাবছে লা তে। অনেক, অনেক বার সে বারণ করেছিল। তবু পানিকরের সঙ্গে এল নিত্য ঢালী।

সে বলেছিল, পানিকরের মতলব ভাল না। তার কথা কানেই তোলে না নিত্য ঢালী। তাকে গ্রাহ্যেই আনে না।

জলের দিকে চেয়ে ছিল লা তে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল। বিরাট আকারের একটা সান ডায়াল উপসাগরের তলার বালিতে গুটি গুটি এগুচ্ছে।

দেখতে দেখতে চোখের ঈষৎ কটা তারা ছুটো নেচে উঠল।

এই মরশুমে অর্থাৎ মধ্যম ঋতুতে সিপিরা বড় একটা উপসাগরে আসে না। বর্ষার আগে আগেই তারা দরিয়ায় নেমে যায়।

কুতকুতে, চাপা চোখে সান ডায়ালটা দেখতে লাগল লা তে। শুধু সান ডায়ালই না। তার চারপাশে বিরাট একটা হাঙর ঘুরছে। মাঝে মাঝে হাঙরটা হাঁ করে। সারি সারি হিংস্র দাঁতগুলি ঝকমক করে। বিচিত্র উল্লাসে হাঙরটা ডিগবাজি খায়।

চাপা চোখের কটা তারা ছুটো স্থির হয়ে গেল লা তে'র। সান ডায়াল তার খুব প্রিয় সিপি। এ্যাসিড দিয়ে সাফ করে নিলে সান ডায়াল চিক চিক করে।

অভ্যাসবশে কোমরের খাঁজে হাত দিল লা তে। খুঁজে খুঁজে ছোরার বাঁটে থাবা বসাল।

মোটর বোটের কলকব্জা সারানো হয়ে গিয়েছিল। ম্যানগ্রোভ গাছ থেকে কাছি খুলে ফেলল পানিকর। বোটটা ছুলে উঠল।

পানিকর স্টার্ট দিতে যাবে, চাপা গলায় লা তে ডাকল, 'মালেক—'

'কী বলছিস ?'

'থোড়া সবুর।'

'কাঁহে— ?'

'একটা সান ডায়াল সিপি। সিপিটা আগে তুলে নি। পরে বোট ছাড়বেন।'

বিরক্ত গলায় পানিকর গজ গজ করতে লাগল, 'শালে পানির পোকা। সিপি দেখলে পাগলা বনে যায়।'

পানিকর আর স্টার্ট দিল না। 'নটিলাস' বোট উপসাগরের শান্ত, নিস্তরঙ্গ জলে ভাসতে লাগল।

খানিকটা চুপ।

ও পাশ থেকে পানিকর ফিসফিসিয়ে উঠল, 'সিপিটা উঠাচ্ছিস না যে লা তে? দেরী হয়ে যাচ্ছে। দুপুরের আগে মায়াবন্দর যেতে হবে।'

লা তে বলল, 'বহুত বড় একটা হাঙর সিপিটার পাশে পাশে চলছে।'

শব্দ করে হাসল পানিকর। বলল, 'তোর আবার হাঙরের ডর! হাঙরই তো তোকে ডরায়।'

'আঁ, হাঁ-হাঁ, হাঙর আমাকে ডরায়!'

লা তে'র গলায় অদ্ভুত স্বর ফুটল।

পানিকর আবার বলল, 'জলদি কর। হাঙরটা মেরে সান ডায়ালটা তোল।'

'তুলব, তুলব। থোড়া সবুর।'

লা তে'র গলাটা দুর্বোধ্য শোনায়।

দুই খাড়া হাঁটুর ফাঁকে থ্যাবড়া থুতনি ঢুকিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল লা তে। একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, বিরাট হাঙরটা চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে সান ডায়ালটাকে ঠুকরে ঠুকরে আদর করছে।

উপসাগরের স্তব্ধ জলে 'নটিলাস' বোটটা তির তির করছে।

দূরের ধূসর রঙের স্যাডল পাহাড়, এরিয়াল উপসাগর, ম্যানগ্রোভ বন, আকাশ, সামনের ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দ্বীপ—কিছুই দেখছিল না লা তে।

তার চোখ, তার মন, তার সমস্ত চেতনা জুড়ে এখন রয়েছে একটা সান ডায়াল আর একটা হাঙর।

হাঙর! হ্যাঁ, বিরাট, মস্ত এক হাঙর।

শেডের ওপাশে তিন জন বসে ছিল।

'নটিলাস' বোটের ইঞ্জিনটার কাছে পানিকর। মাঝখানের শেডটার গা ঘেঁষে নিত্য ঢালী আর কাপাসী।

একদৃষ্টে জলের দিকে চেয়ে ছিল কাপাসী।

এখানে, এই এরিয়াল উপসাগরের জল নীল। দূরে সমুদ্রের জল কালো। যতদূর তাকানো যায়, নোনা অফুরন্ত সীমাহীন জল।

জল, জল আর জল।

দেখতে দেখতে বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে কাপাসীর।

এতক্ষণ বাতাস ছিল। হঠাৎ বাতাসটা পড়ে গেল।

উপসাগরের জলে কাঁপুনি নেই, মাতন নেই। পারের ম্যানগ্রোভ বনের মাথা নড়ে কি নড়ে না। 'নটিলাস' বোটটা স্থির হয়ে রয়েছে।

উড়ুক্কু মাছগুলি ফিন ফিনে, রুপালী ডানায় উড়ছিল। এখন তারা জলের তলায় চলে গিয়েছে। আকাশের কোথাও একটা সাগরপাখি নেই।

দিনের প্রথম রোদে উপসাগরটা জ্বলছিল। হঠাৎ কোথা থেকে এক টুকরা বিরাট মেঘ এসে রোদটাকে ছেয়ে ফেলেছে।

উপসাগরটা এখন ধূসর, আবছা আবছা, অস্পষ্ট।

যতদূর তাকানো যায়, কোথাও কোনদিকে গতি নেই, শব্দ নেই, তাপ নেই, আলো নেই। সব কিছু স্তব্ধ, নিরালোক, জড়, মৃত। একটা হঠাৎ মৃত্যু যেন উপসাগরটাকে ছেয়ে ফেলেছে।

চারদিকে তাকিয়ে বিচিত্র এক ভয়কে দেখতে পেল কাপাসী। শুধু দেখলই না, তার মনে হ'ল ভয়টা বুকের ভিতর সিরসির করছে।

'কাঁপা', ফিস ফিস গলায় কাপাসী ডাকল 'বাবা—'

পাশ থেকে নিত্য ঢালী বলল, 'কী?'

তার গলাটা সহজ, স্বাভাবিক শোনাল না। কেমন যেন কাঁপা কাঁপা শোনাল। কাপাসীর ভয়টা যেন নিত্যর মধ্যেও রয়েছে।

কাপাসী বলল, 'আমরা কোথায় যাইতে আছি ?'

'আমি জানি না। পানিকর বাবায় জানে।'

একটু চুপ।

কাপাসীর ভয়টা বাড়তেই লাগল।

মধ্যম ঋতুর মেজাজ বিচিত্র। এই হয়ত রোদ, এই আবার মেঘ।

যে মেঘের টুকরাটা রোদ ছেয়ে ফেলেছিল, সেটা আরো ঘন হয়েছে। চারপাশের ছোট ছোট মেঘের টুকরাগুলিকে টেনে এনে, ফুলে ফেঁপে পুবের আকাশটা ঢেকে ফেলেছে।

এরিয়াল উপসাগর আরো ধূসর, আরো আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে।

যে ভয়টা বুকের ভিতর সির সির করছিল, সেটা চারপাশ থেকে কাপাসীকে ঘিরে ধরেছে। শ্বাস টানতে, ঢোক গিলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। দম আটকে আটকে আসছে। তালুতে একরাশ শুকনা, ধারাল বালি যেন আটকে আছে। ঢোক গিলতে গেলেই সেগুলো বিঁধছে।

গলার কাছটা ব্যথা ব্যথা। অসহ্য, নিদারুণ এক যন্ত্রণা বুকের ভিতর থেকে পাক খেতে খেতে উঠে আসছে।

সামনের দ্বীপ, উপসাগর, পাহাড়, দূরের সমুদ্র—সব আবছা, ঝাপসা, নিরাকার হয়ে যাচ্ছে। কোথায়ও যেন আলো নেই। সব কিছু অন্ধকার। একটা নিরন্ত কালো পর্দা সমস্ত কিছুকে ঢেকে ফেলেছে।

কিছুই যেন শুনছে না কাপাসী, দেখছে না, বুঝছে না।

অনেক, অনেকদিন, ঠিক কতদিন আগে, হুবহু মনে করতে পারল না কাপাসী। দুর্বল, আচ্ছন্ন, ভয়াতুর মনে এখন কোন ক্রিয়াই চলছে না।

তবে এটুকু কাপাসী মনে করতে পারল। কোথায় যেন একটা ছোট নদী ছিল, অন্ধকার ছিল। টুকরা টুকরা, শিথিল কয়েকটা ছবি। কয়েকটা ঘটনা। সবগুলো জোড়া লাগালে যা দাঁড়ায়, তা

হ'ল, সেই অন্ধকারে কারা যেন বাপ-মায়ের বুক থেকে তাকে ছিনিয়ে, মশাল জ্বালিয়ে, ছিপ নৌকায় নদী পাড়ি মেরে চলে গিয়েছিল।

তারপর?

কোথায় যেন একটা চর ছিল। ছোট একটা দোচালা ঘরে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। একদিন, দু'দিন, দু মাস, এক বছর—কতদিন যে সে সেখানে আটক ছিল, মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে, কারা যেন তার কাছে আসত। তারা এলেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত।

এখন, এই মুহূর্তে পানিকরের মোটর বোটে বসে কেন যেন তার মনে হ'ল, সেই সাঙ্ঘাতিক রাত্রিটার মত আজও তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কথাটা যতই ভাবল, হাতের পাতা দুটো ঘামে ভিজে উঠল। একটা ঠাণ্ডা, কনকনে স্রোত মেরুদাঁড়া বেয়ে নামতে লাগল। গলা শুকিয়ে গেল। দম আটকে আসতে লাগল।

চেতনাটা বুঁজে আসার ঠিক আগে চেঁচিয়ে উঠল কাপাসী, 'যামু না, কিছুতেই যামু না।'

চেঁচিয়ে উঠল কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। ঠোঁট দুটো তির তির করে কাঁপল মাত্র।

মোটর বোটের শেডটা ধরে শরীরের সব জোর গলায় এনে আবার চেঁচাল কাপাসী। এবার আওয়াজ বেরুল, 'আমি যামু না, যামু না—'

যে স্তব্ধতা এরিয়াল উপসাগরটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেটা খান খান হয়ে গেল।

বোটের ইঞ্জিনটার পাশে বসে ছিল পানিকর। চমকে কাপাসীর মুখের দিকে তাকাল। তারপরই ঘুরে বসে স্টার্ট দিল।

এতক্ষণ এরিয়াল উপসাগরে গতি ছিল না, চাঞ্চল্য ছিল না, বেগ ছিল না। এমন কি এতটুকু শব্দ পর্যন্ত না।

আচমকা মোটর বোটটা ভট্ ভট্ করে উঠল।

শান্ত, নিস্তরঙ্গ জলে ঢেউ উঠল, মাতন জাগল। উড়ুক্কু মাছেরা জলের নীচে চলে গিয়েছিল। রুপার তীরের মত তারা উড়তে লাগল।

আকাশে সাগরপাখি দেখা দিল।

এতক্ষণ এরিয়াল উপসাগরটা মৃত, নিস্পন্দ, স্তব্ধ হয়ে পড়ে ছিল। হঠাৎ সেখানে বেগ এল, শব্দ এল, গতি এল, চাঞ্চল্য এল।

মৃত উপসাগরটা বেঁচে উঠল।

হঠাৎ ব্যাপারটা ঘটে গেল।

স্টার্ট দেবার সঙ্গে সঙ্গে 'নটিলাস' বোটটা নড়ে উঠল। আর নড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলুথালু হয়ে চিৎকার করে জলে লাফ দিল কাপাসী, 'যামু না, যামু না, কিছুতেই যামু না।'

উপসাগরে ঝপাং করে শব্দ হ'ল। লোনা জল ছিটকে এসে লাগল 'নটিলাসে'র গায়ে।

পানিকর বোট থামিয়ে দিয়েছে। ইঞ্জিনটার সামনে দাঁড়িয়ে সে সমানে চিল্লায়, 'গেল গেল, সব কুছ বরবাদ হয়ে গেল। কাপাসী—কাপাসী—'

বুক থাপড়ায় আর হাউ হাউ করে কাঁদে নিত্য ঢালী, 'গেল গেল, আমার সগল গেল। হা ভগমান।'

শেডের ওপাশে চুপচাপ বসে ছিল লা তে। হাঙর আর সিপি-টাকে দেখছিল।

আচমকা ঘটনাটা ঘটল। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল লা তে। চোখের পাতা পড়ছিল না। স্নায়ু-গুলো অবশ হয়ে গিয়েছিল। নিজের উপর নিজের কোন ইচ্ছাই কাজ করছিল না।

লা তে দেখছে, উপসাগরের জলে হাবুডুবু খেতে খেতে কাপাসী ডুবে যাচ্ছে। তবুও নড়ল না সে, নড়তে পারল না। আড়ষ্টের মত বসে রইল।

একবার ভেসে উঠল কাপাসী। প্রাণফাটা চিৎকার করল, 'বাঁচাও, আমারে বাঁচাও—'

লা তে দেখল, সান ডায়ালটাকে ছেড়ে দিয়ে বিরাট হাঙরটা কাপাসীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তার বিরাট শরীরটা জলের নীচে স্থির হয়ে রয়েছে। আন্দামান উপসাগরের ক্ষুধার্ত হাঙর শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ওত পেতেছে।

কাপাসীর মাথা আবার ভাসল। আবার সে চেঁচাল, 'বাঁচাও—বাঁচাও—মরলাম—মরলাম—'

তীব্র একটা ঝাঁকানি খেয়ে সব আড়ষ্টতা সরে গেল। কোমরের খাঁজ থেকে ছোরার ফলাটা সাঁ করে বার করল লা তে। তারপর উপসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

হাঙরটা একটু ঘুরে দাঁড়াল। হিংস্র, ভীষণ চোখে দেখতে লাগল, আরো একটা শিকার একেবারে মুখের সামনে এসে পড়েছে। হাঙরটার লাল ঘের-দেওয়া চোখ দুটো ঝকমক করছে।

বাঁ হাত দিয়ে কাপাসীর শরীরটা জলের উপর ভাসিয়ে রাখল লা তে। ডান হাতে ছোরাটা বাগিয়ে ধরা।

একসঙ্গে একজোড়া শিকার বাগে পেয়ে হাঙরটা মেতে উঠেছে। ডিগবাজি খাচ্ছে। উল্টে পাল্টে কত ধরনের কসরতই না দেখাচ্ছে। মুখ ভরে জল নিয়ে হুস করে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

একসময় মাতামাতি থামিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল হাঙরটা। তারপর তীব্রবেগে ছুটে এল। কাপাসীকে ভাসিয়ে রেখে একটু সরে গেল লা তে। হাঙরটা ওপাশে বেরিয়ে গেল। দাঁত বার করে সঙ্গে সঙ্গে আবার তেড়ে এল। দরিয়ার সব অন্দিসন্ধি, হাঙরের স্বভাব—সবই লা তে'র জানা। চক্ষের পলকে একপাশে

সরে হাঙরটার ঘাড়ের কাছে ছোরা বসিয়ে দিল সে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে উপসাগরের জলে মিশল।

ছোরার খোঁচা খেয়ে হাঙরটা ভয়ানক হয়ে উঠল।

'নটিলাস' বোটের মাথায় সমানে চিল্লাচ্ছে পানিকর, 'হাঙরটাকে মার লা তে। দশ রুপেয়া দেব। কাপাসীকে তুলে দে লা তে। বখশিস মিলবে।'

একটু দূরে গিয়ে হিংস্র চোখে চেয়ে আছে হাঙরটা। শিকার-টাকে যত সহজে বাগানো যাবে ভেবেছিল, আদপেই ব্যাপারটা তত সহজ নয়।

বাঁ হাতে কাপাসীর পুরা দেহের ভার উপরের দিকে ঠেলে রেখেছে লা তে। যন্ত্রণায় হাতটা ছিঁড়ে পড়ছে।

দম ছাড়ার জন্য একবার ভুস করে মাথা তুলেছিল লা তে। সেই সুযোগে হাঙরটা ধারাল দাঁতের কামড় বসিয়ে লা তে'র উরু থেকে খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

হাঙরের ঘাড় থেকে রক্ত ঝরছে। লা তে'র উরু থেকে রক্ত ঝরছে। মানুষ আর হাঙরের রক্তে উপসাগর লাল হয়ে উঠেছে।

লোনা জলে উরুর ক্ষতটা ভীষণ জ্বলছে। সেদিকে লা তে'র খেয়াল নেই। এখন একটু অসাবধান হ'লে আর উপায় থাকবে না। হাঙরের ধারাল দাঁত তাকে আর কাপাসীকে চিরে ফেলবে।

আবার ডুব দিল লা তে। তার জানা আছে, জখমী হাঙর বড় মারাত্মক! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হাঙরটার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল লা তে।

এর মধ্যে আর এক বিপত্তি ঘটল। জল খেয়ে খেয়ে আর ভয়ে কাপাসী জ্ঞান হারিয়েছে। তার অসাড় দেহটা বাঁ হাতে আর ঠেলে রাখতে পারছে না লা তে।

হঠাৎ মাথায় একটা মতলব খেলে গেল তার।

শ' দুই হাত দূরে উপকূল। সেখানে ক্ষয়িত শিলা আর

ম্যানগ্রোভ বন। উপকূলে উঠতে পারলে নিরাপদ আশ্রয় মিলবে।

ডুব দিয়ে কাপাসীর অসাড় দেহটা ভাসিয়ে রেখে রেখে উপকূলের দিকে সরতে লাগল লা তে।

হাঙরটা লা তে'র মতলব বুঝল। সঙ্গে সঙ্গে সাঁ করে তার দিকে ছুটে এল। ছোরার ডগা দিয়ে পেটের কাছটা চিরে দিল লা তে। হাঙরটা পিছিয়ে গেল। হয়ত বুঝল, শিকারটা নেহাতই নিরীহ না, সাঙ্ঘাতিক। আদতে ওটা শিকারই না, ভয়ানক এক প্রতিপক্ষ।

দরিয়া আর হাঙরের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে উপকূলের অনেক কাছে এসে পড়ল লা তে। এখানে জল অনেক কম, বুক সমান। কিন্তু নীচের ভাঙা ভাঙা, ক্ষয়া ক্ষয়া পাথরে হাজার বছরের শ্যাওলা জমে রয়েছে। সেখানে পা রাখা যায় না, পিছলে যায়।

জখমী হাঙরটাও সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। শ্যাওলা জমা পাথরে পা রাখতে গিয়ে পিছলে গিয়েছিল লা তে। সেই ফাঁকে পায়ের গোছা থেকে একখণ্ড মাংস কেটে নিয়ে গেল হাঙরটা।

সামনে বিরাট হাঙর, বাঁ হাতে কাপাসীর অসাড় দেহ, পায়ের তলায় পিছল পাহাড়—এমন মারাত্মক অবস্থায় জীবনে পড়ে নি লা তে। পা থেকে উরু থেকে রক্ত ঝরছে। নোনা জলে ক্ষতগুলো জ্বলছে। ভীষণ এক যন্ত্রণা শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে। শরীরটা অবশ, বিকল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু না, অত সহজে হার মানলে চলবে না। দরিয়ার অতল থেকে হিংস্র জলচর জানোয়ারের মুখ থেকে সিপি কুড়ায় লা তে। কোন কালে দরিয়ার লড়াইতে হার মানে নি সে। আজও মানবে না। লা তে মরিয়া হয়ে উঠল।

উপকূলের দিকে আরো অনেকটা সরে এসেছে লা তে। জল এখানে কোমর সমান। এখানে শ্যাওলাহীন একটা বড় পাথর মিলল। বাঁ হাতে কাপাসীকে জড়িয়ে ধরে, ডান হাতে ছোরাটা বাগিয়ে রাখল সে।

'নটিলাস' বোট থেকে পানিকর সমানে উৎসাহ দেয়, 'বিশ রুপেয়া বখশিস দেব লা তে। ওপরে উঠে যা।'

নিত্য ঢালী কিছুই বলে না। গেঙিয়ে গেঙিয়ে কাঁদতে থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার্ত্ত, জখমী জানোয়ারটাও এসেছিল। কিছুক্ষণ প্রতিপক্ষের মতিগতি ঠাওর করে দেখল। তার পর দাঁত মেলে সোজা ছুটে এল।

পায়ের তলায় কঠিন পাথরের আশ্রয়। পিছলে যাবার বিপদ নেই। এক পাশে একটু কাত হয়ে দীর্ঘ ছোরাটা পুরাপুরি হাঙরের পেটে ঢুকিয়ে টেনে দিল লা তে। অন্তিম আক্রোশে লক্ষ্যহীন গতিতে খানিকটা ছুটে গেল হাঙরটা। জলের মধ্যে উল্টে পাল্টে কিছুক্ষণ আছাড় পিছাড়ি খেল। তারপর স্থির হয়ে গেল।

হাঙরের সঙ্গে লা তে'র যোঝাযুঝি দেখছিল পানিকর। দেখতে দেখতে চিৎকার করতে ভুলে গেল সে। হঠাৎ বিচিত্র এক ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। শেষ পর্যন্ত দুর্ধর্ষ হাঙরটাকে শেষই করে ফেলল লা তে!

মরা হাঙর, রক্তমাখা উপসাগর, লা তে'র ছোরা পানিকরের বুকের ভিতর অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়া ঘনিয়ে তুলল।

টলতে টলতে ধুঁকতে ধুঁকতে কাপাসীকে নিয়ে খুব সাবধানে পাথরের খাঁজে খাঁজে পা ফেলে ম্যানগ্রোভ বনে উঠে গেল লা তে। উত্তেজনায়, অবসাদে, হাঙরের সঙ্গে লড়াইর ক্লান্তিতে ঘন ঘন শ্বাস পড়তে লাগল।

পানিকর ফিস ফিস গলায় বলল, 'দাঁড়া লা তে, আমি আসছি।'

'নটিলাস' বোটটা উপকূলের কিনারে ঘেঁষিয়ে হাঁটুখানেক জল ভেঙে পানিকর আর নিত্য ঢালী এল।

লা তে'র বুকে বেঁহুশ হয়ে পড়ে রয়েছে কাপাসী।

পানিকর দেখল, লা তে'র ছোরার ফলায় এখনও হাঙরের তাজা রক্ত লেগে রয়েছে। টপ টপ করে সেই রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায়

ঝরছে। একবার লা তে'র চোখের দিকে তাকাল পানিকর। লা তে'র চাপা, কুতকুতে, কপিশ চোখদুটোতে কি দেখল, পানিকরই জানে। একটা কথাও আর বলল না। উপসাগরের হাঁটু জল ভেঙে যেমন এসেছিল, ঠিক তেমনি 'নটিলাস' বোটে গিয়ে উঠল।

একটু পর এরিয়াল বে'র শান্ত জলে বড় বড় ঢেউ জাগিয়ে ভট্ ভট্ শব্দ তুলে 'নটিলাস' বোট খোলা দরিয়ায় পালিয়ে গেল।

এবার বেহুঁশ কাপাসীর দিকে তাকাল লা তে। কেন যেন তার মনে হ'ল, আন্দামানের-দরিয়া থেকে হাঙরের মুখ থেকে এমন সিপি সারা জিন্দগীতে আর তুলতে পারে নি।

নিত্য ঢালী সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল।

লা তে অল্প একটু হাসল। বলল, 'তোমার লেড়কি নাও চাচা—'

নিত্য ঢালী কেঁদে উঠল, 'লা তে'রে তুই না থাকলে মেয়েরে বাঁচাইতে পারতাম না। আমি তোর গুলাম হইয়া রইলাম।'

লা তে জবাব দিল না। নিত্য ঢালী কাঁদতেই লাগল।

খানিকটা পর কাপাসীর জ্ঞান ফিরে এল। আলুথালু হয়ে সে চেঁচায়, 'আমি যামু না, যামু না।'

নিত্য ঢালী মেয়ের একটা হাত ধরল। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'না মা, তোর যাইতে হইব না। চল, অখন আমরা কোলোনিতে ফিরুম।'

কাপাসীকে নিয়ে উঠে পড়ল নিত্য ঢালী। লা তে'র দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল লা তে, আমাগোর (আমাদের) লগে চল।'

'না।'

মাথা নাড়তে নাড়তে লা তে বলল, 'আমি মায়া বন্দর যাব।'

'যাবি কেমনে ? পানিকর বাবায় তো বোট লইয়া গেল।'

'দেখি, যদি ফরেস্টের বোট পাই। ও তোমার ভাবতে হবে না চাচা।'

বলেই উপকূলের পার ধরে হাঁটতে শুরু করল লা তে। খানিকটা গিয়ে কি ভেবে ঘুরে দাঁড়াল। ডাকল, 'শোন চাচা।'

নিত্য ঢালী এগিয়ে এল।

লা তে বলল, 'এই জাজিরাতে তোমরা নয়া এসেছ। এখানকার হালচাল জান না। তোমার লেড়কিকে একটা হাঙরের কাছ থেকে বাঁচালাম। এখানে আরো বহুত হাঙর আছে। খুব হুঁশিয়ার।'

আবার চলতে শুরু করল লা তে।

উপসাগরের পার দিয়ে হেঁটে চলেছে লা তে।

পাশেই সমুদ্র—কালো, নিঃসীম, দুর্জ্ঞেয়।

পনের বছর আন্দামানের সমুদ্র থেকে সিপি কুড়াচ্ছে লা তে। আশ্চর্য! এতদিনেও সমুদ্রকে, তার মেজাজকে, তার চরিত্রকে আদৌ বুঝে উঠতে পারে নি।

আজ, একটু আগে হাঙরের সঙ্গে যুঝে যুঝে কাপাসীকে বাঁচিয়েছে। লা তে ভাবল, সাধ্য কি তার কাপাসীকে বাঁচায়। দরিয়াই মেহেরবানি করে কাপাসীকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

আজ প্রথম দরিয়ার চরিত্র একটু একটু বুঝতে পারল লা তে। দরিয়ার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে গেল তার।

চুয়ান্ন

নিত্য ঢালীর ঘরের সামনে একটা উতরাই। উতরাইটার ছু পাশে ধানক্ষেত।

জঙ্গলের কাছ থেকে যে মাটিকে আদায় করা হয়েছিল, লাঙলের ফলায় ফলায় যে মাটি চৌরস হয়েছিল, বর্ষায় যে মাটিতে বীজদানা পড়েছিল, সেই মাটিই বছরের চতুর্থ ঋতুতে ফসলবতী হয়ে উঠেছে।

যতদূর তাকানো যায়, শুধু ধান আর ধান। সোনালী লাবণ্যে ক্ষেতের ঝাঁপি ভরে আছে।

ছু' জন মাত্র মানুষ। হোক ছু' জন, তবু তো একটা সংসার।

সারাদিন সংসারের কাজ সারে কাপাসী। রাঁধে বাড়ে, ঘর পরিষ্কার করে। কিলপঙ নদী থেকে জল আনে। বাপকে খাওয়ায়, নিজে খায়। তারপর বিকাল যখন হয়, সূর্যটা যখন জঙ্গলের ওপারে চলতে শুরু করে, ঠিক সেই সময় বারান্দার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে। উদাস চোখে সামনের ধানক্ষেতটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় চোখছুটো জলে ভরে যায়। টস টস করে গাল বেয়ে লবণাক্ত, উষ্ণ জল ঝরতে থাকে।

আজকাল আর কাপাসী কলকলিয়ে হাসে না। যতক্ষণ কাজে

মেতে থাকে, মোটামুটি একরকম কাটে। কিন্তু কাজ যখন আর থাকে না, যখনই একটু ফুরসত পায়, কাপাসী কাঁদতে বসে। আশ্চর্য! যে কাপাসী কলকলিয়ে হাসত, সে এখন কাঁদে। সে কান্নার শব্দ নেই।

সেদিন এরিয়াল উপসাগরে লাফ দিয়ে পড়েছিল কাপাসী। হাঙর দেখে ভয়ে, উত্তেজনায় তার অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়গুলো তীব্র ঝাঁকানি খেয়েছিল।

বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল কাপাসী।

অনেক কাল আগে গাঢ় অন্ধকারে মশাল জ্বালিয়ে কারা যেন ছিপ নৌকায় পাড়ি মেরে তাকে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন থেকেই অবুঝ, অস্থির গলায় মেতে মেতে ঢলে ঢলে হাসছে কাপাসী। সেদিন জীবনের সব সুস্থতা হারিয়ে ফেলেছিল সে।

এরিয়াল উপসাগরে লাফ মেরে, হাঙর দেখে তার অস্বাভাবিক স্নায়ু আর ইন্দ্রিয়গুলি তীব্র ঝাঁকানি খেয়েছিল। এই ঝাঁকানিটাই তাকে আবার সুস্থ, স্বাভাবিক করে দিয়েছে।

সন্ধ্যার ঠিক মুখে মুখে হারাণ আর পাল সাহাব আসে।

যেদিন হাঙরের মুখ থেকে বাঁচিয়ে নিত্য ঢালীর সঙ্গে তাকে ডিগলিপুর পাঠিয়ে দিয়েছিল লা তে, সেদিন থেকেই পাল সাহাব আর হারাণ আসছে।

আজও তারা এল।

পাল সাহাব বলল, 'আজও তুই কাঁদছিস?'

'হ সাহেব বাবা।'

'তোকে না বলেছি, কাঁদবি না?'

'পারি না বাবা, কিছুতই কান্দনেরে ঠেকাইয়া রাখতে পারি না।'

একটু থেমে কাপাসী বলে, 'যখন হাসতাম তখন কইতেন 'হাসবি না।' অখন কান্দি। কানতেও (কাঁদতেও) দিবেন না ?'

'না না—'

গাঢ় গলায় পাল সাহাব বলল, 'তুই যে হাসি হাসিস, যে কান্না কাঁদিস, তা এই ডিগলিপুরে চলবে না। জরুর না।'

পাল সাহাব ঘন ঘন মাথা নাড়ে।

কাপাসী বলে, 'তা হইলে কোন হাসন কোন কান্দন চলব ?'

'যে হাসিতে যে কান্নায় দিল জুড়োবে, তাই হাসবি, তাই কাঁদবি। যে হাসিতে যে কান্নায় দিল টুটি-ফাটা হয়ে যায়, তা হেসে তা কেঁদে কোন ফায়দা ?'

কাপাসী জবাব দেয় না। চুপচাপ বসে থাকে।

এবার হারাণকে নিয়ে পড়ে পাল সাহাব। তার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি মেরে বলে, 'এ উল্লু ?'

তটস্থ হয়ে হারাণ বলে, 'কী ক'ন (বলেন) পাল সাহেব ?'

'আরে নালায়েক, হারামী—আপনা পেয়ারের লেড়কি এ্যায়সা কাঁদছে, আর তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস ?'

'কী করুম ?'

পাল সাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'শোন বুদ্ধু, আভী আমি যাচ্ছি। কাল আবার আসব। কাল এসে যদি দেখি কাপাসী কাঁদছে, তোর শির ছেঁচব।'

পাল সাহাব চলে গেল।

কাপাসীর পাশে গিয়ে বসল হারাণ। বলল, 'কোন দুঃখুতে কান্দো কাপাসী ?'

কাপাসী কিছু বলে না। ধানক্ষেতটার দিকে তাকিয়েই থাকে।

আবেগে গলাটা কাঁপতে থাকে হারাণের, 'কাপাসী, কও—'

দু হাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে

কাপাসী। বলে, 'এতদিন পাগল আছিলাম, ভালই আছিলাম। ক্যান আমি ভাল হইলাম? ক্যান? ভাল হইয়াই তো আমার দুঃখু বাড়ল। পাগল হইয়া যা ভুলছিলাম, ভাল হইয়া তাই তো মনে পড়ল।'

'কী মনে পড়ল?'

'আমার শরীলখান লষ্ট হইয়া গেছে। হা ভগমান।'

কাপাসীর শরীরটা থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে।

কাপাসীর পিঠে আলগোছে একখানা হাত রেখে হারাণ বলে, 'কিছুই লষ্ট হয় নাই কাপাসী। জীবনে কিছুই লষ্ট হয় না। ধৈয্য ধর, মনেরে বুঝ মানাও—'

হারাণের হাতটা পিঠ থেকে নিয়ে দু হাতে আঁকড়ে ধরে কাপাসী। বলে, 'সত্য কও পুরুষ, আমার কিছুই লষ্ট হয় নাই!'

'সত্য কই।'

হারাণের গলা পরম আশ্বাসের মত শোনায়।

পঞ্চান্ন

এটা বছরের ষষ্ঠ ঋতু।

একবছর আগে শীতের এক মধ্য দুপুরে একদল নির্ভূম, মৃতমুখ, নিঃস্ব মানুষ মাটির আশায়, বাঁচার আশায়, জীবনের আশায় বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে এসেছিল।

ঝুপড়ির সামনে বসে বসে পাল সাহাব ভাবছে।

এখন ঝিম দুপুর।

ষষ্ঠ ঋতুর দুপুরে কড়া রোদে পিঠটা পুড়ে যাচ্ছে। তবু হুঁশ নেই। বিভোর হয়ে ভাবছে পাল সাহাব।

উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপে মানুষ এল। সেই মানুষ জঙ্গলের দখল থেকে মাটিকে আদায় করল। মাটি একদিন ফসলের প্রাণের ভারে পুলকময়ী হয়ে উঠল।

এই দ্বীপে মানুষ এল। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সু এল, কু এল। ভাল এল, মন্দ এল। দুঃখ এল, যন্ত্রণা এল। আশা এল, আনন্দ এল।

প্রথম যেদিন মানুষগুলো এই দ্বীপে এসেছিল, সেদিন তাদের সকলের চেহারা ছিল এক, অভিন্ন। সবাই মিলে একটা মানুষের পিণ্ড। অদ্ভুত এক মৃত্যু তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এ সেই মৃত্যু, যা মানুষকে জীবন্মৃত করে রাখে।

আস্তে আস্তে তাদের আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব ফুটে বেরুল।

সাতপুরুষের বাস্তু ছেড়ে আসার পর তারা তিলে তিলে মৃত্যুকে উপলব্ধি করেছে। এই দ্বীপে এসে পায়ের নীচে মাটি পেয়ে তারা মৃত্যুকে পেরিয়ে এল। মৃত্যু থেকে তারা জীবনে উত্তীর্ণ হ'ল।

কত কী-ই না ঘটল এই দ্বীপে।

জীবনের খোয়ানো মূল্যবোধগুলিকে ফিরে পেল ক্ষিরি। কাপাসী ভাল হয়ে গেল। অশুভ ছায়ার মত পানিকর এসেছিল এই দ্বীপে। সে পালিয়ে গেল। হরিপদ বারুই পৃথিবীর সবার চোখ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। তিলি গর্ভিণী হ'ল।

কত কী-ই তো হ'ল।

'পাল সাহেব, পাল সাহেব—'

ডাকতে ডাকতে কে যেন উতরাই বেয়ে উঠে আসছে।

বিভোর ভাবটা কেটে গেল। চমকে ঘুরে বসল পাল সাহাব। দেখল, ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে উদ্ধব বৈরাগী উপরে উঠে এসেছে। উত্তেজনায়, তেজী রোদে অনেকটা পথ ছুটে আসার ধকলে সারা দেহে ঘাম ছুটেছে।

পাল সাহাব বলল, 'কী উস্তাদ, এ্যায়সা দৌড়তে দৌড়তে আসছ যে ?'

'শিগগির চলেন পাল সাহেব, তিলির ব্যথা উঠছে।'

বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে রইল পাল সাহাব, 'কিসের ব্যথা ?'

'বিয়ানের ব্যথা। তিলির ছেলে হইব।'

লাফ মেরে উঠে পড়ল পাল সাহাব। ঝুপড়ির ভিতর ঢুকে মা-তিনকে টানতে টানতে বার করল। বলল, 'শিগগির চল মাগী।'

'কাঁহা ?'

'যুগেনের ঝুপড়িতে। তিলির লেড়কা হবে। এই জাজিরাতে (দ্বীপে) এই পয়লা মানুষ জন্মাচ্ছে। চল্ চল্—জলদি—'

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও হরিপদকে পাওয়া যায় নি। অগত্যা গর্ভিণী তিলি যোগেনের ঘরে গিয়ে উঠেছে।

তিলি নিজে যায় নি। পাল সাহাবই তাকে যোগেনের ঘরে রেখে এসেছে।

হরিপদ তিলির উপর সমস্ত দাবী ছেড়ে এই দ্বীপ থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। একটা পঙ্গু, রুগ্ন, বিকলাঙ্গ মানুষের জন্য তো একটা সুস্থ, স্বাভাবিক, সজীব মানুষ মূল্যহীন হয়ে যায় না।

একজনের জন্য আর একজনের জীবন নষ্ট হয় না। পাল সাহাবের জীবন বোধ এই কথাই বলে।

পাল সাহাবরা এসে দেখল, মেলা বসে গিয়েছে।

রসিক শীল, চন্দ্র জয়ধর, হারাণ, নিত্য ঢালী, কাপাসী, উজানী বুড়ী—কেউ বাকী নেই। ডিগলিপুর সেটেলমেণ্টের সবাই এসে যোগেনের বাড়িতে ভিড় জমিয়েছে।

পাল সাহাবকে দেখে সাড়া পড়ে গেল।

'পাল সাহেব আসছে।'

'সাহেব বাবা আসছে।'

যোগেনের ঘরটা ভিতর থেকে বন্ধ। বন্ধ ঝাঁপের ঠিক বাইরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে রসিক শীল আর যোগেন। যোগেনের মুখটা অদ্ভুত এক আনন্দে চকচক করছে।

পাল সাহাব বলল, 'কি রে হারামী, কী হ'ল, লেড়কা না লেড়কি ?'

যোগেন মুখ নামাল। কিছু বলল না। বিচিত্র এক লজ্জা তাকে ছেয়ে ফেলেছে।

পাশ থেকে রসিক শীল বলল, 'অখনও কিছু হয় নাই সাহেব বাবা, এট্টু খাড়ন (দাঁড়ান)। নাতি হউক, নাতনি হউক—যাই হউক, মুখ দেখে আশীব্বাদ করে যাইবেন।'

'হঁা-হঁা—জরুর।'

মানুষগুলো আগ্রহে, উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে আছে। কখন তিলি বিয়োবে, সেই আশায় আশায় উন্মুখ হয়ে আছে।

নবজাতক আসছে। এ উৎসব তো মানুষের আদিম।

পাল সাহাবের কানে এল, কে যেন বলছে, 'ছেলে হইব।'

আর একটা গলা শোনা গেল, 'না-না মেয়ে হইব।'

অন্য একজন মধ্যস্থ হ'ল, 'কাজিয়া করস ক্যান? মেয়ে হউক, ছেলে হউক, অখনই তো দেখতে পাবি।'

বিকালের দিকে সূর্যটা যখন পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে, ঠিক সেই সময় সবার উৎকণ্ঠা ছাপিয়ে বন্ধ ঘরের ভিতরে কচি গলার আওয়াজ উঠল, 'ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ—'

বাইরে শোর পড়ে গেল, 'বাচ্চা হইছে, বাচ্চা হইছে।'

বাচ্চাটা জোরে জোরে কাঁদছে।

গলায় অপরিসীম জোর নিয়ে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে প্রথম শিশু জন্ম নিল।

খানিকটা পর ঘরের ঝাঁপ খুলে গেল। বুড়ী বাসিনী রক্ত মাখা শিশুটাকে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে বাইরে এল। বলল, 'ছ্যাখ—ছ্যাখ তোরা। কি সোন্দর হইছে!'

সবাইকে ঠেলে গুঁতিয়ে সামনে এগিয়ে এল পাল সাহাব। বলল, 'দেখি দেখি, কী হয়েছে মাঈ? লেড়কা না লেড়কি?'

বুড়ী বাসিনী বলল, 'ছেলে হইছে বাবা।'

'দে দে মাঈ, আমার হাতে দে।'

হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটাকে ধরল পাল সাহাব।

এই দ্বীপে মানুষ এসেছে। সুখে-দুঃখে-প্রেমে আর প্রাণের তাপে তারা উপনিবেশ গড়ে তুলেছে।

অনেক, অনেকদিন আগে পাল সাহাবের জীবন থেকে একটা

কৃষাণ গ্রামের ঠিকানা হারিয়ে গিয়েছিল। সারা জীবন ধরে সেই ঠিকানাটা, সেই কৃষাণ গ্রামটা, সেই পৃথিবীটা খুঁজে বেড়িয়েছে সে।

এতদিনে বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ দ্বীপে সেই হারানো পৃথিবীটা খুঁজে পেয়েছে পাল সাহাব।

পাল সাহাব কে?

পাল সাহাব শুধু একটা ব্যক্তি না, শুধু একটা মানুষ না। সে হ'ল জীবন—জীবনের প্রতীক। এই দ্বীপের আশা-হতাশা, আনন্দ-যন্ত্রণা, জীবন-মৃত্যু—সব কিছুর উপর ব্যাপ্ত হয়ে আছে সে।

তিলির বাচ্চাটা এখন আর কাঁদছে না। চোখ বুঁজে হাত মুঠো করে একান্ত নির্ভয়ে পাল সাহাবের হাতে শুয়ে রয়েছে।

ফুলের মত নরম, উষ্ণ, ছোট্ট একটি মানুষ।

পরম মমতায় তাকে বুকের উপর তুলে নিল পাল সাহাব। একদৃষ্টে এই দ্বীপের প্রথম শিশুটির মুখ দেখতে লাগল। দেখে দেখে আশ তার মেটে না।

অতি সুখে হাসে পাল সাহাব।

পাগলা অতি সুখে কাঁদে।

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এর পক্ষে
শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৪, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে শ্রীতীর্থপদ রাণা কর্তৃক মুদ্রিত।